রাস্তা পার হবে সাবধানে

অভীক দত্ত

রাস্তা পার হবে সাবধানে

১

জীমূতবাহন

না। আমার নাম নিয়ে একদম হাসাহাসি করবেন না। নাম নিয়ে হাসাহাসি করা মোটেও সুস্থ মানুষের লক্ষণ নয়। তবে আপনারা সুস্থ মানুষ এটাই বা কে বলেছে? বাসে, ট্রেনে, মেট্রোতে নিজেদের মধ্যে ক্যালাকেলি করতে ব্যস্ত লোকজন আপনারা।

হে প্রিয় অসুস্থ মানুষেরা, আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করবেন না। মানায় না আপনাদের। হ্যাঁ, হাসাহাসি করতে পারেন আমার বিয়েটা নিয়ে। আপনারা জানেন কি না জানি না, এই বিয়েতে আমার বাবা মায়ের মত ছিল না, আমার বউয়ের বাবা মায়ের মত ছিল না, এমনকি আমাদের নিজেদেরও মত ছিল না। কী করে যে বিয়েটা হয়ে গেল, তা উপরওয়ালাই জানেন। অবশ্য কী করে হয়ে গেল, সেটা এখনই বলে দিলে তো আপনারা পিঠটান দেবেন। রয়ে সয়ে এসব কেচ্ছা শুনতেই তো মঙ্গল, কী বলেন? ভাতের সঙ্গে রোজ একটু কেচ্ছা মিশিয়ে না খেলে পরের দিন সকালে আপনাদের পেট পরিষ্কার হয় না সেটা খুব ভালো করেই জানি। সব এখনই বলব না। শুধু জেনে রাখুন, এখন আমার ফুলশয্যা চলছে। একটা গম্ভীর বাড়ির চিলেকোঠার ঘরে বয়স্ক বয়স্ক কতগুলো পিসি এসে আমাদের ঘরের ভিতর ঢুকিয়ে বলে গেলেন দরজা বন্ধ করে শুতে। সিনেমার মতো কোনও রোমান্টিক ব্যাপার নেই, হাসি মজা নেই, গান নেই,

খাটের তলায় শুয়ে থাকা ঢ্যামনা জামাইবাবু নেই, কিচ্ছু নেই। রোম্যান্টিকতাহীন একটা ঘেমো ফুলশয্যা। বিয়ের ডেটে শয়ে শয়ে বিয়ে হয়েছে, আজকে এতক্ষণে ফুলশয্যায় কন্ডোমের প্যাকেটও নিশ্চয়ই খোলা হয়ে গেছে সবার, আর আমি দরজা বন্ধ করে ফ্যানের রেগুলেটর জোরে দিতে ব্যস্ত।

একবার গলাখাঁকারি দিয়ে বললাম, "ফ্যান জোরে দিলে প্রবলেম নেই তো?"

মেয়েটা, মানে যাকে আজ থেকে আমার বউ বলা হবে, জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল, "না নেই।" ফ্যানটা চারের বেশি গেলেই কুত্তার বাচ্চার মতো ঘ্যাটাং ঘ্যাটাং শব্দ করে। আমি চারে রেখে একটা চেয়ার নিয়ে মেয়েটার সামনে বসে বললাম, "ইয়ে, তুমি মানে চেঞ্জ করবে না?" মেয়ে বা আমার বউ আমার দিকে না তাকিয়েই বলল, "নিচে বাথরুম, এখন নামলে আবার সমস্যা।" আমার মনে হল, তাই তো। হাসিমুখে বললাম, "ঠিকই, এখানেই গামছা-টামছা দিয়ে চেঞ্জ করে নিতে পারো, আজ থেকে তো আমরা বর বউ।" মেয়েটা উত্তর দিল না। শুধু নড়ল একটু। বুঝলাম অফসাইডে গোল হয়ে গেছে। এসব না বলাই ভালো। বললাম, "চোখ বন্ধ করবে হ্যাঁ তিরিশ সেকেন্ডের জন্য, আমি পাতলা গেঞ্জিটা পরে নি।" মেয়েটা বলল, "চেঞ্জ করুন না, আজ থেকে তো আমরা বর বউ।" আমি হাঁ। এ মেয়ে ডেঞ্জার তো! এ কথাটা বলে দিল? এত বড়ো কথাটা? যাক গে, বললই যখন, তখন এত লজ্জা পাবার কিছু নেই। পাঞ্জাবিটা খুলে আমার গেঞ্জিটা গলিয়ে, বারমুডা পরে খাটের ওপাশে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। বউ বলল, "আমি ও বাড়ি যাব কবে?"

আমি বললাম, “যবে খুশি। কেন, মন খারাপ করছে এখনই?”

বউ মাথা নাড়ল।

আমি বললাম, “দিয়ে আসব কালকে।”

বউ বলল, “কাল কী করে হবে? যেদিন যাবার, সেদিনই যাব।”

আমি বললাম, “তাহলে মনখারাপ বললে কেন?”

বউ বলল, “মনখারাপ হলেই যে তার সলিউশন পাওয়া যাবে কে বলল? মেয়েদের মনখারাপ করতে নেই। আমি জানি।” আমি বললাম, “উরিব্বাস। তুমি তো ভালো ডায়লগ মারতে পারো! বাংলা সিরিয়ালের স্ক্রিপ্ট লেখো নাকি?”

বউ বলল, “ঠাট্টা করার মতো কিছু বলেছি কি? নাকি আমাকে মানুষ বলেই মনে করছেন না?”

আমি জিভ কাটলাম, “সেসব না। আচ্ছা শোনো না, এই জবরজং পরে থেকো না। চেঞ্জ করে নাও। আমি ওপাশ ফিরে শুচ্ছি। দেখব না। মাইরি বলছি।” বউ অবিশ্বাসী চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, “ঠিক তো দেখবেন না?”

আমি বললাম, “মা শীতলার দিব্যি। সিরিয়াসলি। যাও।”

বউ উঠল। আমি ওপাশ ফিরে তাকালাম। একটা ছোটো আয়না সেট আছে। চাইলেই দেখা যেত, কিন্তু দেখলাম না। নিজে থেকে কিছু চাইব না। যেদিন দেবে, সেদিন নেব। নইলে মাঝরাতে যদি কান্না জুড়ে দেয়, সামলানো শিবের অসাধ্য হয়ে যাবে।

মিনিট পাঁচেক পরে বউ বলল, “আপনি কি কিছু করতে চান?”

আমি হতভম্ব হয়ে বললাম, “কী মানে?”

বউ বলল, “বিয়ে করলে যা করে?”

আমি বললাম, “না না, তুমি ঘুমাও। ভয় নেই। আমি ভালো লোক।”

বউ খাটের ওপর বসে বলল, “সে সবাই বলে আমি ভালো, হ্যান ত্যান। তারপরই আসল চেহারা বেরোয়।”

আমি বললাম,"তুমি কত লোক দেখেছ?"

বউ বলল, "অনেক। শুয়ে পড়াই তো কাজ আমার। আপনাকে ঠকিয়েছে। আমি এক্কেবারে বেশ্যা মেয়ে। আমার মতো মেয়েকে কেউ বিয়ে করে না। এসব বলেনি আপনাকে?"

আমি হাঁ করে বউয়ের দিকে তাকালাম। বউ বলল, "এইচ আই ভি টেস্ট করতে দিয়েছি। রেজাল্ট এলে তবেই শোবেন। যান, ঘুমিয়ে পড়ুন এখন।"

আমি কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে তড়িঘড়ি পাশ ফিরে শুলাম। এই দিনটাও দেখতে হল আমায়!

২

"মুত। এই মুত।" রাস্তার মধ্যে দিয়ে দৌড়োতে দৌড়োতে এসে ঈশান দাঁড়াল। লোকজন সব বিচ্ছিরি দাঁতক্যালানো মুখে তাকাচ্ছে। আমি ঈশানের দিকে একটা ভস্ম করা দৃষ্টি দিলাম। অন্য দিন হলে ব অক্ষর দিতাম, আজ মুড ছিল না। ঈশান কাঁধে জোরে চাপড় মেরে বলল, "কী রে ভাই? সিল খুললি?"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "মানে?"

ঈশান বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে একটা গোল বানিয়ে ডান হাতের তর্জনীটা ওটায় ঢুকিয়ে বার করতে করতে চোখ নাচিয়ে নাচিয়ে বলল, "হল ভাই, হল? গাব ছাড়িয়েছিস?"

আমি ঈশানের কথা না শুনে জোরে জোরে পা চালাতে লাগলাম। ঈশান দৌড়োতে দৌড়োতে আমার পাশে এসে বলল, "পারিসনি? ও ঠিক আছে। সবাই প্রথম দিনে পারে না। ইনফ্যাক্ট আমাদের দাদাও অস্ট্রেলিয়ায় ফার্স্ট ইনিংসে ধেড়িয়ে চার বছর পরে লর্ডসে সেঞ্চুরি করেছিল। তুইও হয়তো পারবি, চার বছর পর।"

আমি ফুটপাথের দোকানে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট নিলাম। দড়ির আগুন থেকে সেটায় আগুন দিয়ে বললাম, "নিজে তো এই দামড়া বয়সেও একটা জোটাতে পারলি না। অন্যদের কথা শুনে অরগ্যাজম হয় কেন বে তোর? ফোট তো!"

ঈশান আমার কাঁধে হাত দিয়ে বলল, "কী হল ভাই? ব্যাপার সিরিয়াস লাগছে? বউদি গম্ভীর? নাকি ফেসবুক কবি? তুই ছুঁলেই তিরিশ পাতা বিদ্রোহী কবিতা নামিয়ে ফেলবে?"

আমি ফুটপাথের দিকে তাকালাম। কাল রাতে ভালো বৃষ্টি হয়েছে। ভেজা ভেজা ভাব আছে একটা। এদিকের ফুটপাথে দুজন শুত। নিশ্চয়ই বৃষ্টি বলে অন্য কোথাও ঠাঁই নিয়েছে। খুব সম্ভবত পঞ্চাননতলার পেতে রাখা পাইপগুলোতে। একটা আস্ত মানুষ দিব্যি সেঁধিয়ে যেতে পারে। আমারই কতবার ইচ্ছে হয়েছে পাইপে সেঁধিয়ে যাই, ইন ফ্যাক্ট

এখনও হচ্ছে। এমন বিয়ে করলি মদন, হাড়মাস সুদ্ধ খেল...? ধুস! কী সব ভাবছি। এত কিছু ভেবে তো লাভ নেই। যা হবে হবে। বিয়েটা এরকম করে হয়ে যাবে তাই বা কে জানত! আর কে বলে আমরা এখন এগিয়েছি? এখনও লগ্নভ্রষ্টা মেয়ের বিয়ে হয়। দিব্যি গেছিলাম বিয়ে খেতে। ধরে বেঁধে বিয়ে দিয়ে দিল। বাবা মা তো এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না। আর বউয়ের দিকে তাকাব কী, কিছুই তো বলে না। যেন বিয়ে হয়েছে, চেপে যাও বস। বেটির বয়ফ্রেন্ড বিয়ের রাতে পালিয়েছে দেখে কে বলবে! সিগারেটটাও বিড়ালের হিসির মতো লাগছিল। ফেলে জুতো দিয়ে পিষে দিলাম। ঈশান বলল, "যাই বল ভাই, লো বাজেট বিয়েতেও খেয়ে সুখ আছে। তোর বিয়েটা হঠাৎ করে হল বটে, খাসি করতে পারিসনি বটে, কিন্তু মুরগির মাংসটাও জব্বর বানিয়েছিল। আচ্ছা ভাই, মদ পার্টিটা কবে দিবি?"

আমি বললাম, "আমার শ্রাদ্ধের দিন খাস।"

ঈশান মাথা নাড়াতে নাড়াতে বলল, "শ্রাদ্ধের দিন তো মাংস খাওয়া যাবে না, নিরিমিষ চাট আমার পোষায় না, নিয়মভঙ্গের দিন খাব। আমার অ্যাকাউন্টে বেশি করে টাকা পেটিএম করে দিস তো বাপ। গ্লেনফিডিচ খাব। বড়ো লোকের মদ। ওরা নাকি ওটা খেয়ে বিডিএসএম করে। বিডিএসএম জানিস তো কী? চোখ বেঁধে লাগায়। হেবি জিনিস। দেখলেই কেমন লাগে। আরে ফিফটি শেডস অফ গ্রে দেখিসনি? হেবি জিনিস রে ভাই। তুইও ট্রাই নে।"

আমি এবার খিস্তির বন্যা বইয়ে দেবার জন্য রেডি হচ্ছিলাম, এমন সময় অফিসের বাস এসে গেল। খরুস হারামি বসটা সামনেই বসে আছে। আমার দিকে রসসিক্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। যেন আমি কীভাবে করেছি তার সব রিপোর্ট এখনই ওকে দিতে হবে, ও হেড অফিসে মেল করবে।

আমি উঠতেই বলল, "তারপর, বোসো, সব ঠিক আছে তো? ফুলশয্যার পরের দিনই অফিস করছ, ছুটি নিতে পারতে তো!" আমি হে হে করে একদম পেছনের সিটে গিয়ে বসলাম। ঈশান ফেবিকুইক। আমার পাশে এসেই বসল। বিড়বিড় করে বললাম, "সব শালাকে বুলডোজারের তলায় ফেলব। তোকেও।"

ঈশান আমার পেটে চিমটি দিয়ে বলল, "এরকম করিস কেন? সব ঠিক হয়ে যাবে। একটু হাস না ভাই।" আমি দাঁত বের করতে যাব, আমার ফোন বেজে উঠল। দেখি আননোন নাম্বার।

ধরলাম, "হ্যালো।"

"আমার প্যাড আনা হয়নি। ডেট সামনেই।"

অবাক হয়ে বললাম, "কে? কে আপনি? কী প্যাড? রাইটিং প্যাড?"

“আমি আপনার বিয়ে করা বউ। প্যাড মানে এখনও না বুঝলে বিয়ে করলেন কেন?”

আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললাম, “আমি কোথায় বিয়ে করতে চেয়েছিলাম?”

“চাননি, করেছেন তো! সব ভেঙেচুরে পালান তো নি! সাইজ মেসেজ করছি, নিয়ে আসবেন। আরও অনেক কিছু লাগবে। আমার অ্যাকাউন্ট নাম্বার দিচ্ছি। টাকা পাঠান। কিনতে যাব। চিন্তা করবেন না, হিসাব রাখছি, চাকরির অ্যাপ্লাই করা আছে, পেয়ে গেলে সব টাকা দিয়ে দেব। আপনার টাকা আমার লাগবে না।” ফোন কেটে গেল। আমি হাঁ করে ফোনটার দিকে তাকিয়ে ফোনটা পকেটে রাখলাম।

৩

কাজের চাপে পাথর চাপা অবস্থা। মাঝে মাঝে কফি খেয়ে জল থেকে মাথা তুলতে পারছি কোনও রকমে, আবার কিউবিকলে পৌঁছে জলে ডুবে যাচ্ছি। ব্ল্যাক হোল না কার হোলের ছবি তুলছে বিজ্ঞানীরা আর আমরা এদিকে কোডিং করে যাচ্ছি। যাচ্ছি তো যাচ্ছিই। আমাদের দেওয়ালেই বস আবার একটা হাসিমুখো বুড়োর পোস্টার চিপকে দিয়েছে। তাতে আবার লেখা “গেট এ লাইফ ম্যান।” কী যে লাইফ পাচ্ছি আমিই জানি। লাঞ্চের একটু আগে পঞ্চা বেয়ারা এসে আমার দিকে ঝুঁকে কানে কানে এসে বলল, “আপনার সঙ্গে কে দেখা করতে এসেছে।” পঞ্চা এভাবেই কথা বলে। কথা বলার সময় পঞ্চার পান খাওয়া মুখ থেকে পানের পিক আপনার কানে লাগতেও পারে কপাল ভালো থাকলে।

আমি ছিটকে চিড়বিড়িয়ে উঠে বললাম, “এভাবে বলার কী আছে?”

পঞ্চা কোনও উত্তর না দিয়ে এমনভাবে দাঁড়িয়ে রইল যেন কোনও সিক্রেট মিশনে রয়েছে। আমি রেগেমেগে বেরোলাম। অফিসের লবিতে গিয়ে দেখি একজন লম্বা একহারা চেহারার লোক, আমারই বয়সি হবে, উদাস মুখে অফিসের ফ্যান দেখছে। আমি গিয়ে বললাম, “আমায় ডাকছেন?” লোকটা আমার দিকে তাকিয়ে হাত জোড় করে বলল, “নমস্কার, আমি অমলকান্তি।” আমি হাঁ করে বললাম, “ও! তো আপনি কি রোদ্দুর হতে চান?”

অমলকান্তি বলল, “সে তো বিক্রম হয়েই রয়েছে ফাগুন বউতে। আমি আর রোদ্দুর হতে চাই না। আমি আমার প্রেমিকাকে চাই, যাকে আপনি বিয়ে করেছেন।” আমি অমলকান্তির দিকে তাকালাম। কথায় বিনয় ঝরে পড়ছে। ইনিই তাহলে তিনি? মাথা চুলকে বললাম, “খামোখা পালাতে গেলেন কেন? দিব্যি তো বিয়েবাড়িটা খেতে গেছিলাম। মাংস আসার আগেই তুলে নিয়ে বিয়ের পিঁড়িতে বসিয়ে দিল। আপনার জ্বালায় মাংসটাও তো খেতে পারলাম না।”

অমলকান্তি সোফায় ধপ করে বসে পড়ে বলল, “ভয়ে। তিতি অতি দজ্জাল একজন মেয়ে। প্রতিটা ঝগড়া হ্যাশট্যাগ ফেমিনিজম দিয়ে ফেসবুকে দেয়। আমি ভয়ে পালিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম বিয়ের পর এ মেয়ে নির্ঘাত আমায় জেলে ঢোকাবে। রেডি

হচ্ছিলাম, বুঝলেন তো। হঠাৎ করে কে এক আত্মীয় এসে ফোর নাইন্টি এইট এ নিয়ে দীর্ঘ একখান লেকচার দিয়ে বলল, বউকে পায়ের তলায় না, মাথার উপরে রাখতে হবে। বউ মাথায় হাগবে মুতবে সব করবে। দরকার হলে বউকে তুমি হাগিস পরিয়ে দেবে। কিন্তু বউয়ের পাছায় চিমটি কাটলেই বউ বাঙালকে হাইকোর্ট দেখিয়ে দেবে। সেটা শোনার পর থেকে আমার টেবিল টেনিস বল জোড়া আউট হয়ে গেল বুঝলেন? আমি জাস্ট পালিয়ে গেলাম। প্রথমে দেওঘর। সেখানে নিরিমিষ সহ্য করতে না পেরে পাটনা চলে গেলাম। কী জ্বালা বলব মশাই, সেখানে আবার নীতিশ কুমার মদ ব্যান করে দিয়েছে। অগত্যা গুটখা খেতে হল। গুটখা আগে কোনও দিন খাইনি। হোটেলের দেওয়াল নোংরা-ফোংরা করে খুব কষ্ট হল। মনে পড়ল এই মেয়েটাকে নিয়েই তো কতবার পার্কে বসে মশার কামড় খেয়েছি। গালে চুমু খেতে গিয়ে গালে চড় খেয়েছি। তিতিকে আমি ছেড়ে দিলাম কী করে? সটান পাটনা থেকে চলে এলাম জেনারেল কামরায় করে। একটা বিহারি বাচ্চা কোলে বসিয়ে দিয়েছিল, সেটা আবার হিসি করে দিয়েছে গায়ে। দেখুন দেখুন।" অমলকান্তি জামাটা আমার দিকে এগিয়ে দিল। আমি ছিটকে গেলাম, "এই না না। এসব দরকার নেই। আপনি কী করতে চান সেটা বলুন।" অমলকান্তি করুণ মুখে বলল, "এই বিয়েটা আপনি অস্বীকার করুন। ডিভোর্স দিন। আমার প্রেমিকাকে আমাকে বউ হিসেবে পেতে দিন।" আমি বললাম, "সে তো করাই যায়, কিন্তু আমি যে বউভাতে এতগুলো টাকা খরচ করলাম?" অমলকান্তি আমার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে একটা এটিএম কার্ড আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "পিন কোড ওয়ান থ্রি ফাইভ নাইন। ইউজ করুন। যেদিন

ইচ্ছা হবে আমাকে দেবেন। এবার হবে?” আমি দাঁড়িয়ে মাথা চুলকে কিছুক্ষণ পরে বললাম, “আপাতত আমাকে একটা প্যাকেট হুইস্পার এনে দিতে পারবেন?”

৪

শুনতে অবিশ্বাস্য লাগলেও সত্যি আমি এখন অমলকান্তির ফ্ল্যাটে এসেছি। অমলকান্তি কবি। আমার বউ কবি অমলকান্তির প্রেমে পড়েছিল। কিন্তু অমলকান্তি রোদ্দুর হবার আগেই ভোর থাকতে পালিয়ে যাওয়ায় বিয়েটা আমাকে করতে হয়েছে। মেঝেতে বসে ওল্ড মংকের বোতল থেকে পবিত্র সন্ন্যাসী ঢালতে ঢালতে আর চোখের জল ফেলতে ফেলতে অমলকান্তি বলল, “তিতিকে ছাড়া আমি বাঁচব না বিশ্বাস করুন। ওকে ফিরিয়ে দিন আমায়।”

আমি মাথা চুলকে বললাম, “আমার যতদূর মনে হচ্ছে তিতি থাকলে আমিও বাঁচব না। একদিনেই আমার লাইফটা কেমন মিনি পাকিস্তান করে দিয়েছে। ঘুম থেকে মনে হচ্ছে উন্নয়ন দাঁড়িয়ে আছে। কিছু বললেই এমন করছে যেন ওনাকে কাছে পিঠে কেউ জয়শ্রীর আম বলেছে। আপনি নিয়ে যান না। আমি বাধা দেব না। বরং একদিন ভালো মদ খাওয়াব। চাইলে শুকনো ডাঙায় ওড়াতেও পারি।”

দাঁত বের করে বললাম আমি।

অমলকান্তি জোরে জোরে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, “আপনি তিতিকে চেনেন না। এখনই যদি আমি যাই, তাহলে অজন্তা ফুটওয়ারের সব হাওয়াই চটি আমার পিঠে ভাঙবে। উঁহুঁ, ওইভাবে হবে না।”

আমি বললাম, “তাহলে কীভাবে হবে?”

অমলকান্তি বলল, “আপনি খুব বাজে ব্যবহার করুন। মারধরও করতে পারেন। তাহলে জেলে যাবেন। আপনাকে বাজে ভাববে। ও কাঁদতে কাঁদতে আমার কাছে চলে আসবে।”

আমি চোখ ছানাবড়া করে অমলকান্তির দিকে তাকিয়ে বললাম, “আমার কপালে ভোট ফর লেফট লেখা আছে যে সারাবছর ফেসবুকে লেফট ফ্রন্টের ক্যাম্পেন করে বিজেপিকে ভোট দিয়ে আসব?”

অমলকান্তি আড়চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, “তা ঠিক। আপনি বুদ্ধিমান লোক। অত সহজে আপনাকে টুপি পরানো যাবে না।”

আমি ভ্যাবলার মতো খানিকক্ষণ বসে থাকলাম। দেখি আবার ফোন আসছে। অমলকান্তি হুমড়ি খেয়ে পড়ে বলল, “তিতি না?” আমি দেখলাম হ্যাঁ। ফোনটা অমলকান্তির দিকে দিয়ে বললাম, “নিন কথা বলুন।” অমলকান্তি আমার দিকে তাকাল। তারপর তড়াক করে উঠে ঘরের ভিতরে দৌড়োতে দৌড়োতে বলল, “ওরে বাবা পাগল নাকি!”

আমি হাঁ করে অমলকান্তির দৌড়ে যাওয়াটা দেখে ফোন ধরলাম। ওপাশ থেকে বউ বলল, "এখন কটা বাজে?"

আমি ঘড়ি দেখে বললাম, "আটটা।"

"এখন অফিস করেন? এতক্ষণ কোন ড্রেনে পড়ে আছেন? যেটা আনতে বলেছিলাম কিনেছেন?"

আমি ঘাবড়ে গিয়ে বললাম, "হ্যাঁ। কিনেছি তো।"

"আধঘণ্টার মধ্যে আসুন। একটা কাজ দিয়েছি, ধেড়িয়ে লাট করে দিচ্ছেন।"

ফোনটা কেটে গেল। আমি কয়েক সেকেন্ড ফোনের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

এটা বিয়ের পরের দিন বউয়ের কথা! লাইফটা সত্যিই মুত হয়ে গেল তো!

৫ কপালকুণ্ডলা

হ্যাঁ। এই ভ্যাকচ্যাক নামটা আমার। বাবা বঙ্কিমচন্দ্রের ভক্ত ছিলেন, লোকে যেরকম দিদির ভক্ত হয়, মোদির ভক্ত হয়, আমার বাবা তেমনি বঙ্কিমচন্দ্রের ভক্ত ছিলেন।

একমাত্র মেয়ের নাম দিলেন তাঁর প্রিয় চরিত্র কপালকুণ্ডলার নামে। কপালগুণে ডাকনাম হল কপাল। কিছু হলেই "কপাল কপাল" করে ডেকে পাড়া বাড়ি মাথায় করাটা বাবার প্রিয় কাজ। এলাকার সবথেকে বড়ো মিষ্টির দোকান আমার বাবার। যদিও কলকাতা থেকে মাড়োয়ারি মিষ্টি এসে দাঁত বসাতে চেষ্টা করছে, কিন্তু আমাদের দোকানের ছানার জিলিপি আর শিঙাড়া ওইসব ঢপের মেশিনে বানাতে চাপ আছে কাকা! দোকানের নাম বাবা "বিষবৃক্ষ" রাখবে ভেবেছিল, কিন্তু ঠাকুরদার তাড়া খেয়ে অবশেষে সেটা "তালুকদার মিষ্টান্ন ভাণ্ডার"-এই সেটল হয়েছে। কাউকে "পথিক তুমি কি পথ হারাইয়াছ" বলব বলে আজন্মকাল বসে আছি, কিন্তু গুগল ম্যাপের কল্যাণে এরকম পথিক কাউকে পাব না পাব না করে একজনকে পেয়েছি। পাওয়া মানে একেবারে পাওয়া না। এ পাওয়া সে পাওয়াও না। এই তো সেদিনের কথা।

গরমের দিনের দুপুরবেলা। কলেজ থেকে ফিরতে দেখি বাবা ব্যস্তসমস্ত হয়ে আমাকে বলল, "কপাল, ক্যাশ সামলা, কাল রাতের খাসির সাথে আম দুধ খেয়ে আমার গ্যাস হয়ে গেছে বোধহয়। যাচ্ছি আর আসছি। আমি আর পারছি না মা, তুই দেখ, আমি যাই।" বলেই স্কুটি নিয়ে বাবা ধাঁ। আমি আর কী করব, ক্যাশে বসে দুখান রসগোল্লা আর দুটো কালোজাম নিয়ে মনোযোগ দিয়ে খাচ্ছি, এমন সময় এক ক্যাবলাচরণ নবকুমার এসে ঘাম মুছতে মুছতে বলল, "আচ্ছা, হাবলু মিত্রর বাড়িটা কোথায় বলতে পারবেন?" হাবলু মিত্রর বাড়ি কাক চিল তিষ্ঠোতে পারে না আর ভাড়াটে!

এক মাস পর পর নতুন ভাড়াটে আসে। বুঝলাম এ নয়া চিড়িয়া। আমি বলতে যাচ্ছিলাম, “পথিক তুমি কি পথ হারাইয়াছ”, কিন্তু বললাম না।

উলটে বললাম, “আপনি কোত্থেকে আসছেন?” ছেলেটা বলল, “মুর্শিদাবাদে বাড়ি। এখানে ভাড়া পেলাম। বাড়িটা বলবেন? লাগেজ রেখে বেরোতে হবে আবার খেতে।”

আমি দোকানের একটা পুচককেকে ঠিক করে দিলাম। পুচকেটা ঘুরে এসে রিপোর্ট দিল হাবলু মিত্র নতুন চিড়িয়াকে সাদরে আমন্ত্রণ করেছে। মিটিমিটি হাসলাম। কদিন টেকে, দেখার সেটাই। ছেলে সিরিয়াস। ঝাড়ি-টারি দূরের কথা, মুখের দিকে তাকিয়ে পর্যন্ত দ্যাখে না। হনহন করে বেরিয়ে যাবে, আর সন্ধের সময় এসে দোকান থেকে দুখানা শিঙাড়া নিয়ে চলে যাবে। আমি যে কতবার গলা খাঁকড়ানি দি, দেখবেই না। বাগে পেলে কানের টেস্ট করতাম। শিওর কালা আছে। আর সব থেকে অবাক কথা হল আমাদের চমকে দিয়ে এ ছেলে টিকেও গেল। হাবলু মিত্রর বাড়ি টিকে যাওয়া যে সে কম্মো না। তবে কানে শুনতে পায় না বলেই হয়তো টিকে গেল। নইলে হাবলু মিত্রের বউয়ের যা শুচিবাই, বাবা রে! সেদিন সন্ধেবেলা। দোকানে গিয়ে ঘুরঘুর করছি, কারণ তখন বাবুর আসার টাইম হয়ে গেছে। বাবাও নেই। কোথায় জানি গেছে। দেখি ছেলেটা ঠিক এসেছে। একটা টেবিলে বসে ইতিউতি তাকাচ্ছে। ভুঁড়িবাবু যাব যাব করছিল, আমি ওকে সরিয়ে ছেলেটার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললাম, “কী দেব?” ছেলেটা আমাকে দেখে ঘাবড়ে গিয়ে বলল, “মানে আপনি অর্ডার নেবেন?”

আমি বললাম, “হ্যাঁ নেব। কী দেব বলুন।”

ছেলেটা বলল, “দুটো লেডিকিনি।”

আমি ছেলেটার সামনে থেকে গিয়ে একটা প্লেটে দুটো লেডিকিনি নিয়ে ছেলেটার সামনে রাখলাম, কিন্তু সরলাম না। ছেলেটা আমার দিকে বড়ো বড়ো চোখে তাকাল। বোঝা যাচ্ছিল ভালো মতন ঘাবড়েছে। আমি বললাম, “কী হল? খাবেন না?” ঠিক এই সময়, যখন ইম্প্রেশন জমানোর কঠিন টাইম, মঞ্চে আমার বাবার প্রবেশ ঘটল। চিরকাল তো ফলস সময়েই এন্ট্রি নিতে হয়। স্কুটি থেকে নেমেই জোরে জোরে চ্যাঁচ্যাতে শুরু করল, “কপাল, ওরে ও কপাল, শুনেছিস?”

আমি বাবার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে কড়া গলায় বললাম, “কী হয়েছে, কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়েছে?”

বাবা গলা নামিয়ে বলল, “আরে, পাল বাড়ির মেয়ের বিয়ে অন্য বাড়িতে হয়ে গেছে। হেবি ব্যাপার। যা না মা, আমি গেলে খারাপ দেখায়। তুই গিয়ে খবর নিয়ে আয়।” আমি একবার ছেলেটার দিকে, আর একবার বাবার দিকে কড়া চোখে তাকিয়ে দুম দুম করে পাল বাড়ির দিকে রওনা হলাম।

৬

নবকুমারের নাম জানা গেছে। আমার মতো উদ্ভট নাম না। সুস্থ স্বাভাবিক নাম।

অনির্বাণ রায়। দেখেছেন? কত সিম্পল নাম। এই নামে কত কত বাঙালি আছে। এই যুগে কোন বাপ তার মেয়ের নাম কপালকুণ্ডলা রাখে? আর ঠাকুরদাকেও বলিহারি যাই। দোকানের নাম বিষবৃক্ষ রাখতে আটকালেন আর আমার নামটা চেঞ্জ করতে পারলেন না? শুনেছি, বাবা নাকি ঠাকুরদাকে বুঝিয়েছিলেন কপালকুণ্ডলা নাম দিলেই নাকি সংসারে সুখের সুনামি আসবে।

কী সুনামি এসেছে জানি না, তবে স্কুল কলেজে আমার নাম নিয়ে খ্যাপানোর যা সুনামি হয়, তা আর কী বলব! আমি আজকাল হাল ছেড়ে দিয়েছি। কেউ খ্যাপালে কোনও প্রতিক্রিয়া দিই না। তাতে দেখা যায়, যে খ্যাপাতে এল, সে-ই খেপে যায়। মনে মনে ভাবে এ কী রে ভাই? খ্যাপে না কেন?

তবে আমি অনির্বাণ বলে ডাকি না। নবকুমার বলেই ডাকি। কপালকুণ্ডলার চাপের মানুষ তো নবকুমারই হবে, নাকি? সুচিত্রা ভট্টাচার্যের উপন্যাস আছে কাছের মানুষ। আমি যদি কোনও দিন উপন্যাস লিখি, তাহলে সে উপন্যাসের নাম দেব চাপের মানুষ। চাপের মানুষ বড়োই ভোলাভালা টাইপ।

কখনও সে দাড়ি রাখে, কখনও রাখে না। আবার কখনও কখনও এমনভাবে দাড়ি কাটে যে গলার কাছে একটু দাড়ি থেকে যায়। আমি ভাবি বলব, কিন্তু বলি না। ঠাকুমা বলেছে

মেয়েদের একটু ঘ্যামে থাকতে হয়। সমস্যা হল, আমার নবকুমারকে ঘ্যাম দেখিয়ে থাকলে সারাজীবন আমাকে কুমারীই থাকতে হবে। নবকুমারের মতো আলাভোলা ঝাড়িহীন পুরুষ আমি কম দেখেছি।

আমার দিকে তাকাতে যে কী হয় তার কে জানে! এমনভাবে দোকানে আসবে যেন সাড়ে চুয়াত্তরের উত্তমকুমার। কিছুই বোঝে না। পুরো অবাক পৃথিবী মোড।

আসবে, এসে বসবে। খেয়েদেয়েই চলে যাবে। ওরে, তোর জন্য যে একটা মেয়ে আজকে একটু কষ্ট করে ভালো করে স্নান করেছে, কাজল দিয়েছে, আমেরিকা থেকে মেসোর আনা লিপস্টিক দিয়েছে, দেখ রে বাবা নবকুমার!

গোদের ওপর বিষফোঁড়া তো তখন হয়, যখন নবকুমার যেতে না যেতেই পাশের পাড়ার দুষ্টু বুড়োটা দোকানে এসে আমার দিকে জুলজুল করে তাকায়। দুষ্টু বুড়োটা হেব্বি বদ। মেয়ে বা বউ দেখলেই পিঠে হাত দেবে। আমার দিকে তাকালে আমি আগুনে চোখে তাকাই। বুড়ো বসে শিঙাড়া নেয়। একবাটি দুধ নেয়। তারপর দুধে শিঙাড়া চুবিয়ে চুবিয়ে খায়। পাড়ার বদ ছেলেরা দাদুকে দুধে শিঙাড়াও বলে। দাদুর তাতে যায় আসে না। দাদু জিনিস।

দাদুর দুই ছেলেই ভালো চাকরি করে। বিরাট ব্যাপার। দুই ছেলেই বড়ো গাড়ি নিয়ে ঘোরে। কিন্তু দাদুকে দেখলে কে বুঝবে? দাদু আসবে, জুলজুল চোখে তাকাবে। আমার বন্ধু পিউ বলেছে, কিছু কিছু বুড়ো আছে, তাদের শেষ দিন অবধি ইয়ে শুলায়।

আমার দাদুর চোখ ঠিক লাগে না। কেমন বুকের দিকে তাকায়। আমি একদম সহ্য করতে পারি না এরকম ধরনের লোক। আর কিছু লোক আছে বাসে ট্রেনে উঠলেই ঠিক পাছা ঘষবে। যেন ঘষার জিনিসের অভাব আছে পৃথিবীতে। আমি যেই বলি, "দাদা, খুব ঘষতে ইচ্ছা করলে বলবেন, গরম তাওয়া ধরব, সেঁকে নেবেন।" বাস সুদ্ধ লোক হাসে। লোকগুলো দূরে যায় বটে, কিন্তু এদের লাইন শেষ হবার নয়। দাদার বয়সি, বাবার বয়সি, এমনকি দাদুর বয়সি লোকেরাও কিছুদিনের মধ্যেই সবাইকে অবিশ্বাস করতে শিখিয়ে দেবে। সবাইকে সন্দেহের চোখে দেখতে শিখিয়ে দেবে।

আর এইজন্যই এদের মধ্যে আমার নবকুমারকে ভালো লাগে। কোনও ভান নেই, ঝাড়ি নেই। ক্যাবলাকান্ত আসবে। বসে বসে মাথা নিচু করে খাবে। তারপর কোনও দিকে না তাকিয়ে বাড়ির দিকে রওনা দেবে। আমার খুব ইচ্ছা করে নবকুমারের বাড়ির ভিতর উঁকি দিয়ে দেখি। নবকুমার কী করে? রান্না করে খায় সেটা টের পেয়েছি, আমার ওর রান্নার স্বাদ পেতেও ইচ্ছা করে।

ঠিক করেছি খুব বৃষ্টি হলে, নবকুমারের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াব। পোড়ামুখী বৃষ্টিও তেমন, এ বছর নামার নামই করে না। কোনও কোর্টে এর নামে মামলা করা গেলে সবার আগে গিয়ে মামলা করে আসতাম।

যাক গে, যা বলছিলাম, নবকুমারকে আমার পছন্দ। আমি খাতায় রোজ নবকুমারের সঙ্গে কথা বলার ১০১ উপায় লিখি আর কাটি।

যেদিন কথা বলবে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে, সেদিন যে কী হবে ভাবতে এখনই আমার বুক দুরুদুরু করে ওঠে।

কিন্তু একটু যে ঠান্ডা মাথায় শান্তিমতো বসে নবকুমারের কথা ভাবব, তার কি উপায় আছে? ওই বাবা দোকানের বাইরে থেকে "কপাল", "কপাল" করে চেঁচাতে শুরু করে দিয়েছে। নিশ্চয়ই বড়ো কোনও অর্ডার এল! জীবনে কি সুখ আছে কোনও?

যাই, দেখি গে!

৭

আমার বাবাটা না কোনও দিন মানুষ হবে না। এই যে এত চুল আঁচড়ে দি, ছাদে বসে কী সুন্দর করে কলপ করে দি, মাঝে মাঝে ভাত খাইয়েও দি, তাতেও আমার বাবা আমাকে বুঝতে পারে না।

নইলে একটু খোঁজখবর নেবে না, যে, মেয়ের একজনের ওপর চাপ আছে, একটু দেখে খেলো এখন?

রবিবার দিন, দিব্যি ঠ্যাঙের উপর ঠ্যাং তুলে লুচি আলুভাজা খাচ্ছি, মা এসে গম্ভীর মুখে বলল, "আজ কোথাও যাবি না।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "কেন?"

মা হাসিমুখে বলল, "সাঁপুই মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের কথা বলছিলাম না, ওরা তোকে দেখতে আসবে আজ। আরে সেই যে, ওদের ল্যাংচা বিখ্যাত।"

আমি বলতে যাচ্ছিলাম ল্যাংচা তোমার পেছনে গুঁজে রাখো, অনেক কষ্টে উড়ন্ত চপ্পল থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে বললাম, "আমাকে আগে বলোনি কেন?"

মা অবাক হয়ে বলল, "সে কী! পরশু রাতেই তো বাবা বলছিল। তুই খেতে খেতে মোবাইল দেখছিলি আর হুঁ হুঁ করছিলি!"

আমি বললাম, "উফ! আমার কানে হেডফোন ছিল তো! আমি কি অত শুনেছি নাকি?"

মা বলল, "শুনিসনি তো কী হয়েছে? এত ভালো সম্বন্ধ পাবি নাকি কোথাও? সাঁপুইদের মিষ্টি জগৎপুরের বিখ্যাত। কত লোক এসে সাঁপুইদের ল্যাংচা নিয়ে যায়। ওখানকার কোনও নেতা তো কোনও অনুষ্ঠানে সাঁপুইদের ল্যাংচা ছাড়া কিছু মুখেই নেবে না।"

আমি ভালো মানুষের মতো মুখ করে বললাম, "মানে? সাঁপুইদের ল্যাংচায় কী আছে? কত বড়ো? জনি সিন্সের থেকেও বড়ো?"

মা অবাক হয়ে বলল, "জনি কী? সে আবার কী?"

আমি লুচি মুখে দিয়ে বললাম, "ও বুঝবে না তুমি। বুঝে কাজও নেই। আমি আজ থাকতে পারব না।"

মা রেগে গিয়ে বলল, "না থাকার কী আছে? তোর বাবার সম্মান আছে না? আচ্ছা শোন না মা, তোর বাবার প্রেস্টিজের ব্যাপার। আচ্ছা শোন, আজ একটু ভালো করে বস, আমি দুহাজার টাকা দেব তোকে কথা দিলাম।"

আমি খুশি হয়ে বললাম, "দুহাজার? আচ্ছা, দাও তাহলে। এখনই দাও। নইলে কথা রাখতে পারছি না।"

মা গজগজ করে কোমর থেকে একটা গোলাপি পাত্তি বের করে আমার হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, “এরপরে যদি না থেকেছিস না কুন্ডি, তাহলে তোর একদিন কি আমার একদিন হবে এই বলে দিলুম।”

আমি এঁটো হাতে মার কোমর জড়িয়ে ধরে বললাম, “কেন থাকব না মা জননী? দুহাজার ফেলেছ, এটুকু তো কত্তেই পারি। তবে শুধু গেস্ট অ্যাপিয়ারেন্স কিন্তু বলে দিলাম!”

মা দুহাত তুলে নমস্কার করে বলল, “তাই করিস মা। জয় জগত্তারিণী, একটু দেখো মা আমার এই পাগলি মেয়েটাকে।”

***

যথাসময়ে তেনারা এলেন। আমার জ্যাঠা কাকারাও এসেছে। বড়ো মামা এসেছে। বাড়ি ভর্তি লোক, যেন মেলা বসেছে। আমি অত বুঝিনি, দুহাজার নিয়ে ভেবেছিলাম অত ঝাম হবে না। এ যে এত ক্যাচালের যজ্ঞ, ভাবতে পারিনি। মাসি এসে গলায় একটা বড়ো হার পরিয়ে দিল। মা শাড়ি পরিয়ে দিল। আমি বললাম, “এ কী করছ? এসব তো কথা ছিল না বন্ধু!”

মা রাগি মুখে বলল, “দুহাজার নিয়েছিস, যা যা বলছি তাই করবি।”

আমি কিছু বললাম না। দাঁড়াও, করছি ব্যবস্থা।

হাতে একটা শিঙাড়ার ট্রে ধরিয়ে দিল মাসি। আমাদের দোকানের বিখ্যাত শিঙাড়া। সেটা নিয়ে বসার ঘরে ঢুকে দেখি আমাদের বাড়ি, তাদের বাড়ি মিলিয়ে একগাদা লোক।

মা শিখিয়ে দিয়েছিল সবাইকে প্রণাম করতে হবে। আমি প্রণাম না করেই বসে পড়লাম। বাবা ইশারা করল, "ওরে কপাল, প্রণাম কর মা।"

আমি শুনলাম না। ছেলের বাড়ি থেকে এক বয়স্কমতো মহিলা এসেছিল। আমায় দেখে বলল, "তোমার নাম কী মা?"

আমি বললাম, "কপালকুণ্ডলা তালুকদার।"

মহিলা বললেন, "একটু হেঁটে দেখাও মা।"

আমি হাসিমুখে বললাম, "হাঁটলাম তো, দেখেননি? শিঙাড়ার ট্রে তো হেঁটেই নিয়ে এলাম।"

বাবা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কপাল!'

মহিলা অপ্রতিভ হয়ে বললেন, “তা ঠিক। তুমিই তো এনেছ। আচ্ছা, দাঁত দেখি।”

আমি বললাম, “দেখানো যাবে না, গুড়াকু মেজে এসেছি এখন।”

সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। আমার বাবাকে ধরে রাখা যাবে না বুঝছি, হেবি খচে গেছে। মহিলা একটা ছেলের দিকে দেখিয়ে বলল, “তোমাদের কিছু বলার থাকলে নিজেরা কথা বলো।”

ছেলেটাকে দেখলাম। কোথায় চাঁদ আর কোথায় ...। কোথায় আমার নবকুমার আর কোথায় এই বাচ্চু কুমার!

ছেলেটা বলল, “একটা গান করো।”

আমি সঙ্গে সঙ্গে শুরু করলাম, “সাইকেলের দুদিক চাকা মধ্যে ফাঁকা, আয় আয় চড়বি কে কলির সাইকেলে।”

ছেলের বাড়ির লোকজন বুঝদারের মতো মাথা নাড়তে লাগল। আমি হাফ গান গেয়ে বুঝলাম এতেও এদের কিছু হচ্ছে না, আমাকে পছন্দ করেই ছাড়বে।

আমি "আমার হাগু পেয়েছে, এলাম, পরে কথা হবে", বলে ঘর ছেড়ে দৌড় মারলাম।

বাড়ির সবাই হাঁ হাঁ করে উঠল, আমি বাথরুমে ঢুকে বসে রইলাম।

৮ জীমূতবাহন
সব জিনিসের খারাপ ভালো থাকে। কোনও কিছুরই সব খারাপ হতে পারে না।

আমাদের বাড়ির যেমন।

বাড়ি পৌঁছতে রাত সাড়ে নটা বেজে গেল।

রোজ এই সময় আমার বাবা আর মা গম্ভীর মুখে সিঁদুরের দিব্যি বলে কী একটা ঢপের সিরিয়াল দ্যাখে। বাড়ি যখন ঢুকি তখন কেউ দেখতেও পায় না। জুতো খুলে গা হাত পা ধুয়ে নিজের ঘরে গেলেও কেউ টের পায় না আমি এসেছি।

দশটায় "ফুলকো লুচি", সাড়ে দশটায় "বিধবার কলঙ্ক" দেখে এক্কেবারে রাত এগারোটার সময় সবার খেয়াল হবে যে এবার খেতে হবে। তখন গিয়ে সবাই খেতে বসবে।

এদিন বাড়ি ঢুকে দেখি টোটাল বিলা চলছে।

বাবা গম্ভীর মুখে পায়চারি করছে। মা কাঁদো কাঁদো মুখে বসে আছে। আর বউ এইচবিও-তে কী একটা ইংরেজি সিনেমা দেখছে, তাতে যে-কোনো মুহূর্তে নায়ক নায়িক বিপজ্জনক দৃশ্যে অভিনয় করতে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। আমি ঢুকতে মা আমার দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকাল যেভাবে সিনেমায় অভিমানী উকিল জজের দিকে তাকিয়ে বলে, "জজ সাহেব, আইনের চোখ তো অন্ধ, আপনিই এই অবিচারের বিচার করুন।"

আমার হাতে কালো প্যাকেট। আমি একবার বাবার দিকে, আর-একবার মায়ের দিকে তাকালাম। বউ কড়া গলায় বলল, "এনেছ?"

আমি মাথা নেড়ে প্যাকেটটা এগিয়ে দিলাম।

বউ ওদের সামনেই প্যাকেটটা বের করে দেখল। মা বড়ো বড়ো চোখ করে বউয়ের দিকে তাকাল। বাবা ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেল।

বউ ভালো করে দেখে খুশি হয়ে বলল, "একদম ঠিক জিনিস এনেছ। বাহ। ভালো তো।"

আমি একবার মার দিকে তাকিয়েই উপরের ঘরে দৌড় দিলাম। এরকম বিপজ্জনক ফোর ফরটি ভোল্ট বউ হবে, আমি চারদিন আগেও জানতাম না মাইরি। কোথাকার

কোন এক গ্রামের ঘোমটাপরা বলে আমার কতদিনের শখ, ফুলশয্যার সময় মাথায় ঘোমটা দিয়ে দুধ নিয়ে আসবে। তার জায়গায় কী চলে এল। ভাবতেই দেড়তলার ছাদ থেকে আত্মহত্যার ইচ্ছে করছে।

বউ সোজা উপরে চলে এসে আমাকে বলল "তোমার ফিরতে এত দেরী হল কেন?"

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, "অমলকান্তির ফ্ল্যাটে গেছিলাম।"

বউ আমার আগাপাশতলা দেখে বলল, "তুমি কি পুরুষত্বহীনতায় ভোগো, স্বপ্নদোষ আছে, লিঙ্গ ছোটো? তাহলে ডিকে লোধের কাছে যাও।"

আমি গোবেচারার মতো বললাম, "কেন?"

বউ বলল, "যে ছেলে নিজের বিয়ের দিন পালায়, যার বিয়ে করার ধক নেই, সেই দুর্বল চরিত্রের ছেলের বাড়ি কী করতে গেছিলে? ঘর বন্ধ করে দেখতে যে তোমারটাও ওর মতো কি না?"

আমি ঘামতে শুরু করলাম। এ কী ডেঞ্জার চিজ রে ভাই! বলেও ভুল হয়েছে।

বউ ফ্যান চালিয়ে আমার সামনে চেয়ার নিয়ে বসে বলল, "তা কী বলল সে?"

আমি বললাম, “তোমাকে ফেরত চায়।”

বউ আমার পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার বের করে সিগারেট ধরিয়ে বলল, “ফেরত তো তখন চায় যখন জিনিস কারও পার্মানেন্টলি হয়। আমি ওর কোনও দিন পার্মানেন্টলি হইনি। হবার প্রশ্নই নেই। তুমি বিয়ে করতে গেলে কেন আমাকে? পালাওনি কেন?”

আমি বললাম, “আমি বুঝিনি। সবাই কী সব বলল, তুমি নাকি লগ্নজিতা হয়ে যাবে।”

বউ বলল, “লগ্নভ্রষ্টা। যাক গে, উদ্ধার করেছ। এবার ডিভোর্স দিতে হবে। সে ব্যাপারে কী করতে হবে দেখো।”

আমি আশার আলো দেখে বললাম, “রেজিস্ট্রিই হয়নি তো। ডিভোর্সের দরকার কী?”

বউ অনেকটা ধোঁয়া ছেড়ে বলল, “তাই তো! এটা তো ভেবে দেখিনি। তাহলে আবার কী! ডিল ফাইনাল। সকালে বাড়ি ছেড়ে দিয়ে আসবে। ওকে?”

আমি আশায় বাঁচে চাষার মতো মুখ করে বললাম, “একদম। যা বলবে।”

৯ অমৃত

পৃথিবীতে অনেক গন্ধ আছে। গোলাপের গন্ধ, রজনীগন্ধার গন্ধ, মুরগির গুয়ের গন্ধ, পেট্রোলের গন্ধ... কিন্তু আমার সবথেকে প্রিয় গন্ধ হল অমলেটের গন্ধ। কোনও জায়গা থেকে অমলেটের গন্ধ পেলেই আমার মনটা কেমন কেমন করে ওঠে। একটা ডিমের ক্ষমতা তুম ক্যা জানো রমেশবাবু!

অবশ্য রমেশবাবু ডিমের ব্যবসায়ী হলে জানতেই পারেন। সব না জানার দায় ভদ্রলোক নেবেনই বা কেন!

যাক গে, কথাটা কিন্তু আমি ডিম নিয়ে বলব বলে শুরু করিনি।

ইন ফ্যাক্ট, ডিম নিয়ে কিছু বলারই নেই।

ডিম্ভাত, ডিম্ভাজা ভালো, এই পর্যন্তই।

কথাটা অন্য।

কথাটা হল আমি প্রেমে পড়েছি।

এবং মারাত্মক প্রেমে পড়েছি।

মেয়েটির সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। আমার পাশে বসেছিল। আমরা আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় কথা বলেছিলাম। মেয়েটির সঙ্গে শুধু দেখা হবার কথাই ছিল।

মাঝখান দিয়ে চুমু যে কখন চলে আসবে বুঝতে পারিনি।

আমি পাগলের মতো চুমু খেয়েছি তাকে। এবং সে আমাকে। প্রেমে পড়লে মানুষ ভুলে যায় চারপাশে কে আছে। আমারও তাই হয়েছিল। মেয়েটিরও।

চুমু খাওয়াখাওয়ির পর সে বেশ কিছুক্ষণ আমায় জড়িয়ে ধরে বসে রইল। আমি তাকে। বললাম, "ছাড়বে না?"

সে বলল, "ছাড়ব না।"

আমি বললাম, "এত ভালোবাসলে কবে?"

মেয়েটি আরও আঁকড়ে ধরে বলল, "জানি না।"

আমার বিভিন্ন অনুভূতি হচ্ছিল। সবথেকে বেশি ইচ্ছা করছিল লাফ মারতে। প্রেম জিনিসটা এত ভালো জানতাম না তো! এত ভালো একটা জিনিস আমি এতদিন করিনি

কেন? কী ভালো লাগছে! মনে হচ্ছে পাগল হয়ে যাব। মনে হচ্ছে শহিদ মিনারের মাথায় উঠে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে সবাইকে জানান দি, "আমি ভালোবাসি। আমি তাকে পাগলের মতো ভালোবাসি।"

ভালোবাসায় শরীর এলেই সে ভালোবাসা খারাপ হয়ে যায় না। শরীর তো আসে স্বাভাবিক নিয়মে। আমি কাউকে ভালোবাসলে সে কাছে এলে আমি তাকে দূরে সরিয়ে দেব কেন? আর এই অনুভূতি কি ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব?

সে বাসে করে চলে গেলে আমি রাস্তার পাশের দোকানে চুপ করে বসে থাকলাম। আমার চুল এলোমেলো হয়ে গেছে। গালে লিপস্টিকের দাগ। আশেপাশের লোক বেশ কৌতুক সহকারে দেখছে আমাকে। আমি তাদের পাত্তা না দিয়ে মন দিয়ে ডিমভাজার গন্ধ নিতে নিতে তার কথা ভাবতে লাগলাম।

ভালোবাসা এত ভালো কেন?

দোকানি ডিম ফ্যাটাচ্ছে। চামচ দিয়ে কী অবলীলায় সে ডিম ফেটিয়ে যাচ্ছে।

আমার ভেতর থেকেই বেরিয়ে এল, "আমার জন্য একটা অমলেট দিয়ো তো।"

দোকানি অভ্যস্ত হাতে গ্লাসটা কড়াইতে খালি করে আর-একটা ডিম নিল। চামচ দিয়ে সেটা ফাটিয়ে গ্লাসে ঢেলে নুন লংকা দিল। আবার ফ্যাটানো শুরু। আমার পাশের জন মন দিয়ে অমলেট খাচ্ছেন। চামচ দিয়ে টেনে টেনে।

আমার মনে আছে আমাকে ক্লাস ফোরে শনিবার দুপুরবেলা যিনি অঙ্ক করাতে আসতেন, তাঁকে মা চায়ের সঙ্গে অমলেট দিতেন। স্যারের যেদিন মন ভালো থাকত, আমাকে তাঁর অমলেট থেকে কিছুটা দিতেন। যেদিন দিতেন, স্যারকে ভগবান মনে হত। যেদিন দিতেন না, ভারী কষ্ট পেতাম। মন খারাপ হত। সেদিন বিকেলে ভালো ব্যাট করতে পারতাম না।

ডিমের ভূমিকা আমার জীবনের অপরিসীম।

মেয়েটির পারফিউমের গন্ধ আমার হাতে লেগে রয়েছে। মাঝে মাঝেই আমি সে গন্ধ নিচ্ছিলাম। লিপস্টিকের গন্ধটাও যে কী ভালো লাগছিল! অমলেটের গন্ধের সঙ্গে মিলেমিশে সে গন্ধ এক অন্য জগতে নিয়ে যাচ্ছিল।

আমার অমলেট এল।

আমি মুগ্ধ চোখে সেদিকে তাকিয়ে রইলাম। একজন ডিমের পোচের অর্ডার দিল।

দোকানিকে আমার দ্য ভিঞ্চি মনে হচ্ছিল।

কী সুন্দর কুসুমটাকে এক রেখে পোচ বানিয়ে দিল।

এসব প্রতিভা। সবার দ্বারা সম্ভব না। আমার অমলেট চামচ দিয়ে খেতে খেতেই আমি আমার জন্য পোচের অর্ডার দিয়ে দিলাম।

চুমুর সঙ্গে অমলেট না মিশলে সেটা ভালোবাসা হয় নাকি?

ধুস!

১০ অমৃত

দাদার বউ বা বউদিরা সাধারণত দু ধরনের হয়।

১) ভালো

২) খারাপ

এই ভালো খারাপের রিলেটিভ ব্যাপারও আছে। কেউ কেউ আছে, যতদিন ঠাকুরপো চাকরি পায়নি, ঠারেঠোরে কথা শোনাতে ছাড়বে না। আর যখনই সে ঠাকুরপো চাকরি পেয়ে যাবে, তখন সেই নয়নের মণি।

হাতের কাছে শাঁসালো ছেলে, নিজের আত্মীয়মহলে তখন ঘ্যাম বাড়াবার জন্য এই ঠাকুরপোই তখন কত ভালো। এটা সেটা রান্না আসছে। আর শুধু নিজের বউদি কেন, এই সময়টা যে কত মা-মাটি-মানুষের আবির্ভাব হয় সে লিস্টি শেষ হবার নয়।

সমস্যা হল চুমু এবং অমলেট খেয়ে আমি যখন বাড়ি পৌঁছোলাম তখন চুমুর দাগটা মোছা হয়নি।

বউদির পিসতুতো বোন অনন্যা আগে আমাকে বিশেষ পাত্তা-ফাত্তা দিত না। আমি সেভাবে লাইন মারতেও যাইনি, কিন্তু তেনার ধারণা ছিল আমার তার ওপর হেব্বি চাপ আছে। যদ্দিন চাকরি পাইনি পাত্তা না দেওয়াটা বজায় ছিল।

চাকরিটা পাবার পর থেকে অনন্যা প্রায়ই আসে। বউদির সঙ্গে কথা বলে, বউদি আকারে ইঙ্গিতে আমাকে আর অনন্যাকে জড়িয়ে কল্পনা চাওলা বানায়। আমি দাঁত-ফাত কেলিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ি বা পাড়া বেড়াতে বেরিয়ে যাই। বউদিদের বাড়ি থেকে ফর্মাল প্রোপোজালও যে-কোনো সময় আসবে আসবে করছে, সকালেই শুনেছিলাম খাওয়ার টেবিলে বাবাকে বউদি ইনিয়েবিনিয়ে এ ব্যাপারে কিছু বলার চেষ্টা করছিল।

আমি অত কিছু বুঝিনি, হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি ঢুকে অনন্যার সামনে পড়ে গেলাম।

বত্রিশ পাটি বের করে অনন্যাকে বলতে যাব "ভালো আছ?" দেখি অনন্যা কয়েক সেকেন্ড আমার দিকে তাকিয়ে মুখে ওড়না দিয়ে বউদির ঘরে দৌড়ল।

আমি লিপস্টিকের দাগের কথা ভুলে গেছিলাম। অনন্যার দৌড় দেখে বুঝতে পারলাম সেটা দেখেই বিবিসি নিউজ নেটওয়ার্ক সক্রিয় হয়ে পড়েছে।

আমি সেটা আর না মুছেই ঘরে ঢুকে পড়লাম।

খানিকক্ষণ পরেই দরজায় ঠক ঠক। দরজা খুলে দেখি বউদি দাঁড়িয়ে আছে।

আমাকে দেখে বলল, "অমু, কিছু খাবে?"

বুঝতে পারছি বউদি এসব বলে আমার গাল দেখার তালে আছে।

আমি বললাম, "না বউদি, অমলেট খেয়ে এসেছি তো।"

বউদির চোখে পাওয়ার আছে। ভালো করে দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু বোঝাই যাচ্ছে যে লিপস্টিকের দাগ আইডেন্টিফাই করার ইচ্ছা বউদির ভয়াবহ। একটু দূরে অনন্যা কাঁদো কাঁদো মুখে দাঁড়িয়ে আছে। দেখে মনে হচ্ছে রাহুল গান্ধিকে ভোটের রেজাল্ট শোনানো হচ্ছে।

আমি মোবাইলের টর্চটা জ্বেলে গালে আলো ফেলে বউদিকে বললাম, "দ্যাখো বউদি, আজকাল কী সব লিপস্টিক বেরিয়েছে শুনেছি, চুমু খেলেও গালে দাগ পড়ে না। তবু এ শেখেনি। ভালো দেখে একটা লিপস্টিক কিনে দিতে হবে বলো?"

বউদি চমকে গেল। আমাকে চোখ বড়ো বড়ো করে বলল, "কে? কাকে কিনে দিতে হবে লিপস্টিক?"

আমি বললাম, "সে আছে একজন। খুব ভালো মেয়ে। নিয়ে আসব। অনন্যারই বয়সি হবে। ভালোই হল। এ বাড়িতে একজন বন্ধু পাবে অনন্যা।"

বউদি কয়েক সেকেন্ড আমার দিকে তাকিয়ে "অ" বলে ঘরের দিকে রওনা দিল।

কিছুক্ষণ পরে দেখলাম অনন্যাও ব্যাগ-ট্যাগ নিয়ে বেরিয়ে গেল। আমি ফেসওয়াশ দিয়ে মুখ-টুখ মুছে বসার ঘরে গিয়ে দেখি বাবা আমার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে।

আমি বললাম, "কিছু বলবে?"

বাবা বলল, "বউমার কাছে শুনলাম তুই কোথায় কী করে এসেছিস নাকি?"

আমি বললাম, "সেরকম কিছু না।"

বাবা চারপাশ তাকিয়ে আমার দিকে তাকাল, গলা নামিয়ে বলল, "ভালো করেছিস। এই অনন্যা মেয়েটা মোটেও সুবিধের ছিল না। যারা মাংসে দু কেজি চিনি দেয় তারা মোটেও সুবিধার হয় না। বাঁচিয়েছিস। তা মেয়েটা কে রে?"

আমি বললাম, "ফেসবুকে আছে, অ্যাড করে নাও। বেশি প্রশ্ন করবে না। আমার প্রেস্টিজ আছে।"

বাবা মুখ বাঁকিয়ে বলল, "হুহ, আমার বয়ে গেছে অ্যাড করতে। তোর গোরু, তুই সামলা। আমি হলাম এখন শান্তি রক্ষা কমিটির মেম্বারের মতো। বাড়িতে ক্যাচাল দেখলে অর্ডার অর্ডার বলব।"

আমি ফিক ফিক করে হাসতে লাগলাম।

১১ জীমূতবাহন

ঘুম একটা শান্তির জিনিস। কিন্তু বউ ঠিক না থাকলে সে ঘুম শান্তির ছেলে হয়ে যায়।

ভোর চারটেয় আমার বউ আমাকে ঠেলতে শুরু করল।

আমি ঘুমচোখে ধড়মড় করে উঠে বসে বললাম, "কী হল?"

বউ বলল, "বাড়ি নিয়ে চলো। আমার গোছগাছ হয়ে গেছে।"

আমি হাঁ করে একবার ঘড়ির দিকে তাকালাম। আর-একবার বাইরের দিকে তাকিয়ে বললাম, "এখন রাস্তায় বেরোলে কুকুরে তাড়া করবে তো। অন্তত দিনের আলো ফুটুক!"

বউ বলল, "না। তোমার বাইক আছে না?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ।"

বউ বলল, "বাইক বের করো। আমাকে দিয়ে এসো। পরে লোক পাঠিয়ে সব বাক্স প্যাঁটরা নিয়ে যাব।"

আমি মাথা চুলকে বললাম, "আচ্ছা তাহলে বড়ো বাইরে সেরে নি।"

বউ বলল, “যা করবে তাড়াতাড়ি করো। আমার এখানে ঘুম হচ্ছে না।”

আমি উঠে বাথরুম গেলাম। অসময়ে বেগ আসে না। তবু চেষ্টাচরিত্তির করতে লাগলাম। সকালে ক্লিয়ার না হয়ে বেরোলে অস্বস্তি হয়।

অনেকক্ষণ চেষ্টার পরে আউটপুট বেরোবে বেরোবে করছে, এমন সময় বউ দরজা ধাক্কাতে শুরু করল, “হল?”

আমার আবার ভেতরে ঢুকে গেল। অনুষ্ঠান প্রচারে বিঘ্ন ঘটলে আমার ঢুকে যায়।

কিছুক্ষণ আরও বসে থেকে বিফলমনোরথ হয়ে বেরোলাম।

বউ গম্ভীর মুখে বলল, “ভেতরেই কি গোটা দিনটা কাটানোর প্ল্যান ছিল?”

আমি ব্যাজার মুখে তৈরি হয়ে ঘর থেকে বেরোলাম। নিচে নেমে বাবা মাকে জাগালাম। সবাই অবাক হয়ে বসে আছে। মা ঘুম জড়ানো গলায় বলল, “এত ভোরে অষ্টমঙ্গলা করতে যাচ্ছিস নাকি তুই?”

আমি বললাম, “না ওকে বাড়ি দিয়ে আসি। বাড়ি যেতে চাইছে।”

মা আর কোনও কথা না বলে শুয়ে পড়ল। যেন জানত এরকমই কিছু একটা হবে।

আমি বাইক বের করলাম।

বাড়ির সামনে পাড়ার কুকুরগুলো শুয়ে ছিল। ঘেউ ঘেউ শুরু করল। আমি বকাঝকা দিয়ে থামালাম।

গাড়ি স্টার্ট দিতে বউ এসে পেছনে বসল। ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ শ্বশুরবাড়ি পৌঁছোলাম। সেখানেও এক অবস্থা। সবাই ঘুমাচ্ছিল। বাইরের পাঁচিলের গেটে তালা দেওয়া। বউ বলল, "যাও, পাঁচিল চড়ে ভেতরে গিয়ে কলিং বেল বাজাও।"

আমি কয়েক সেকেন্ড ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। তারপর মনে হল এই জিনিসের থেকে যত তাড়াতাড়ি বাঁচা যায়, ততই ভালো। পাঁচিল টপকে কলিং বেল বাজালাম। শ্বশুরমশাই দরজা খুলে আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে বললেন, "কী হল?"

বউ বাইরে থেকে চ্যাঁচ্যাল, "দরজা খোলো এত কথা না বলে।"

হতভম্ব মুখে শ্বশুরমশাই দরজা খুললেন।

বউ শ্বশুরমশাইকে বলল, "খুব ভেবেছিলে না? মেয়ে পার করে দিয়েছি? নাও চলে এসেছি। এবার কী করবে করো।"

শ্বশুরমশাই একবার মেয়ের দিকে আর একবার আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "মানে?"

বউ বলল, "মানে পরিষ্কার। আমি চলে এলাম। রাতে ঘুমাইনি। এবার যাই, ঘরে গিয়ে ঘুমাই। ডিস্টার্ব করবে না দুটোর আগে।"

বলে গটগট করতে করতে বউ ঘরে চলে গেল।

শ্বশুরমশাই আমার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বললেন, "তুমি কিছু বলবে না?"

আমি বললাম, "আমি কী বলব? মানে আমার তো কিছু বলার নেই। আপনারা যে নাটকীয় পরিস্থিতিতে বিয়েটা দিলেন, তাতে এরকম হওয়াটা তো আশ্চর্যের কিছু নয়। হতেই পারে।"

শ্বশুরমশাই বললেন, "ওর মা ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমাচ্ছে। উঠে এসব দেখলে তো অক্কা পাবে। অষ্টমঙ্গলা হল না, এখনই মেয়ে বাড়ি ফিরে এল!"

আমি হাতের আংটি খুললাম, গলার চেন খুলে ওঁর সামনের টেবিলে রেখে বললাম, "এগুলো থাক। আর দরকার পড়বে না বোধহয়। আইনি ব্যাপার কিছু থাকলে আমরা আলোচনা করে পরে সেটল করে নেব। আপনার মেয়ে যদি না থাকতে চায়, তাহলে তো কিছু করার নেই।"

শ্বশুরমশাই ধরা গলায় বললেন, "আমি এই মেয়েকে নিয়ে কী করব? নিজেই বিয়ে ঠিক করল। সে বিয়ে ভেঙে গেল। ছেলে এলই না। তোমাকে কোনও মতে রাজি করিয়ে বিয়েতে বসালাম। তুই তখন বল বিয়ে করবি না! ছি ছি ছি, আত্মীয়স্বজন, পাড়াপড়শির কাছে মুখ দেখাব কেমন করে!"

আমি কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে চুপচাপ সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাইকে এসে বসলাম।

সকাল সকাল এত চাপ আর নিতে পারা যাচ্ছে না।

কোথাও গিয়ে ভালো চা খেতে হবে।

১২ অমৃত

প্রেম ভালো জিনিস।

চুমু খাবার পরে প্রেম ভালোতর জিনিস।

গরমের মধ্যেও মনে হয় চাদ্দিকে কেমন একটা ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছে, পাখি-টাখি গাইছে। খিঁচ ধরে থাকা লোকজনের মুখও মিষ্টি মনে হয়।

এই যে আমি খাবার টেবিলে বসে আছি দাদা আর বাবার সঙ্গে, আর বউদি ভাতের হাঁড়ি, মাছের বাটি সব দুম দুম করে টেবিলে দিচ্ছে, তবু সব কত মধুর লাগছে।

বাবা পরমহংসের মতো উদাসীন চোখে বসে আছে। দাদা ভয়ে ভয়ে বউদিকে দেখছে। অনন্যা খাবে বলে বউদি মাংস রেঁধেছিল, সে মাংসের বাটি কেমন অবহেলায়, করুণ ভাবে টেবিলের ওপর বসে আমাকে দেখছে।

এক ফাঁকে বউদি রান্নাঘরে যেতেই দাদা ফিসফিস করে বলল, "তোর কোনও দিন বুদ্ধি হবে না। অনন্যাকে কাটানো যেত, তা বলে লিপস্টিক মাখার কী দরকার ছিল?"

আমি দাদাকে বললাম, "আমি মাখিনি। চুমু খেয়েছে, আমি কী করব?"

দাদা হাঁ করে আমার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বলল, "মাইরি? সিরিয়াসলি? তুই প্রেম করছিস?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ।"

বাবা রান্নাঘরের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে দাদাকে বলল, "সবাই তোর মতো মুখ গুঁজে পড়াশুনা করবে ভাবিস কী করে? তুই তোর মার মতো হয়েছিস। চিরকালের আনরোমান্টিক। অমুর মধ্যে আমি আমার ছায়া পাই।"

বাবা কথাটা এমনভাবে বলল যেভাবে ব্র্যাডম্যান বলেছিলেন সচিন অনেকটা আমার মতো খেলে।

দাদা পানসে মুখে বলল, "তোমাদের কী? তোমাদের তো আর বউ সামলাতে হবে না! আমাকে সামলাতে হবে। রাতে কী কপালে নাচছে কে জানে!"

বাবা বলল, "হেসে ফেলবি না। তাহলেই হবে। হেসে ফেললেই কেলো। তোর মার সামনে একবার কী একটা সিরিয়াস কেস খেয়ে হেসে ফেলেছিলাম। বারোটা বাজিয়ে দিয়েছিল আমার। মনে রাখবি একটাই টিপস, চুপচাপ ঝাড় খেয়ে যাবি। হেসে ফেলবি না।"

দাদা গজগজ করে যেতে লাগল।

বউদি গম্ভীর মুখে এসে ভাত বাড়তে শুরু করল।

বাবা বলল, "বউমা তুমিও বসে যাও। আবার পরে খাবে কেন?"

বউদি বলল, "আমার খিদে নেই বাবা।"

বাবা বলল, "খিদে না থাকা মোটেও ভালো জিনিস না মা। গ্যাস হয়নি তো? কারবোভেজ খেতে পারো।"

বাবা কদিন হল কোমর বেঁধে হোমিওপ্যাথি চর্চা করছে। বই কিনে এনেছে মোটা একটা। সেটা সারাদিন মুখস্থ করে যাচ্ছে।

বউদি কিছু একটা বলতে গিয়েও চুপ করে গেল।

দাদা ভালো মানুষের মতো বলল, "বাবা যখন বলছে তখন বসে গেলেই পারো।"

বউদি শব্দ করে চেয়ার টেনে বসে পড়ে বলল, "কোথাকার না কোথাকার মেয়ে! কী করে কে জানে! ঘরে নিয়ে এসে তুলবে।"

দাদা পা দিয়ে আমার পা ঠেলে ইশারা করে বলল, "কী রে অমু, কোথাকার মেয়ে? কী করে?"

আমি বললাম, “অঙ্কের টিচার। খুব ভালো মেয়ে।”

বাবা গম্ভীর গলায় বলল, “অঙ্ক? ওরে বাবা! অমু, তোর ডিফারেন্সিয়ালটা তো এখনও কাঁচা আছে, শিখে নিস ভালো করে।”

বউদি আমার দিকে কটমট করে তাকাল। আমি ভাতে নজর দিলাম।

দাদা বলল, “অঙ্কের টিচার তো ভালো। ভালো মানে খুবই ভালো। বাড়ির হিসেব-টিসেব মেলাবে! কী বলো বাবা?”

বউদি জোরে জোরে ভাত মাখছে। কোনও কথা বলল না। দাদা অনন্যার মাংসের বাটি থেকে খানিকটা মাংস আমার পাতে আর খানিকটা নিজের পাতে নিয়ে বলল, “মাংসের কালারটা হেবি হয়েছে তো! তোমার রান্নার হাত দিন দিন স্বর্গীয় লেভেলে চলে যাচ্ছে। চিনিও দাওনি দেখছি। অনন্যা এ মাংস খেলে তো দু লিটার জল খেয়ে নিত, ওর কাছে এ তো মাংস না, লংকার দোকান!”

বউদি দাদার দিকে কড়া চোখে তাকিয়ে বলল, “রাস্তায় রাস্তায় দেখা না করে মেয়েটার বাড়ির সঙ্গে কথা বললে ভালো হয়। মা নেই, আমাকেই তো সব করতে হবে এখন।”

দাদা বলল, “আমাদের অফিসের শম্ভুদার ভাই আইটি ইঞ্জিনিয়ার। অনন্যার জন্য দেখব নাকি?”

বাবা আর আমি একসঙ্গে বিষম খেলাম।

কী করে হল কে জানে!

১৩ জীমূতবাহন

একটা ভিডিও দেখেছিলাম কোন একটা মলের। মানুষ গিজগিজ করছে। মানুষের চাপ সহ্য করতে না পেরে লোক সুদ্ধ সে মল ভেঙে পড়েছিল।

এ শহরের সেই অবস্থা হবে নির্ঘাত যে-কোনো দিন।

মানুষের চাপ আসতে আসতে ভয়াবহ অবস্থা হয়ে গেছে।

আমার অবশ্য বউ বাপের বাড়ি চলে গেছে। এসব দার্শনিক কথা না ভাবলেও চলবে। কিন্তু ভোর সাড়ে ছটাতেই চায়ের দোকানে গিজগিজে লোক দেখে এ কথা ছাড়া আর কী মনে আসবে?

বেঞ্চিগুলোতে বয়স্ক লোকেরা বসে আছেন। মর্নিং ওয়াকে গেছিলেন, এখন ফেরার পথে চা খেয়ে বাড়ি ফিরবেন। রাজনীতির কচকচিই চলছে। আমি সাইড দেখে বসতে এক কাপ দুধ চা এল। সঙ্গে একটা বিস্কুট। বিস্কুটটা নিশ্চয়ই ফ্রি না, টাকা নিয়ে ছাড়বে। তা নিক।

আমার কী? আইনি ব্যাপার নিয়ে ভাবতে হবে আমায় এবার। কী বাঁচা বেঁচে গেছি সেটাই ভাবছি। এ মেয়ে গলায় জুড়লে অবস্থা খারাপ হয়ে যেত। এরকম পচা ঘচা বাংলা সিরিয়ালের মতো বিয়ে হবে সেটাও তো কোনও দিন ভাবিনি।

পাশের দুটো বুড়ো বিরাট আলোচনা শুরু করেছে। হনোলুলু থেকে নিউ জার্সি, ট্রাম্প থেকে তারিণী ঘোষ, কাউকে বাদ দিচ্ছে না। চায়ের মধ্যে তর্ক করার যে তীব্র জীবনীশক্তি থাকে, তা মনে হয় আর কোনও কিছুতে থাকে না। বাংলা মদেও না।

চা-টা ভালো। বিস্কুটটা চায়ে চুবিয়ে খেতে ভালো লাগছে। বিস্কুটের মধ্যে বাদাম আছে। এরকম বিস্কুট খেতে বড্ড ভালো। এগুলো লোকাল বেকারির বিস্কুট। বড়োলোকের “বিস্কিট” না।

বিস্কুটটা খেয়ে আর-একটা চাইতে হল। চাও আর-এক কাপ খেতে হবে। সকালে উঠিয়ে দিয়েছে। এখন মাথা কাজ করছে না। আমার এই এক সমস্যা। ভোরে উঠলে মাথা কাজ করে না। এই লোকগুলো ভোরে উঠে হেঁটে এসেছে।

হাঁটলে হার্ট ভালো থাকে। সুগার প্রেশারের সমস্যা কমে যায়।

এত বেঁচে থাকার চাহিদা হবে কেন মানুষের? কী হবে বেঁচে থেকে? তাও এই বুড়োদের? সারাজীবন তো কেটেছে। চাকরি করেছে, ছেলেপুলে মানুষ করেছে। এখন মরে গেলেই তো হয়। বাঁচার কী তীব্র ইচ্ছা!

আমার তো বিয়ের পর থেকেই মরে যেতে হচ্ছে করছে।

লজ্জার ব্যাপার হবে। অফিসে সবাই জেনেও গেছে। এখন আবার বলব কাকা কেঁচে গণ্ডূষ হয়েছে? থুথুক্কি, সব ভুলে যাও? কী করে বলব? বললেও তো চাপ হয়ে যাবে!

অবশ্য মা বেঁচে গেল। পছন্দের সিরিয়ালে হাত পড়লে নিরীহ মহিলারাও ঝাঁসি কি রানি হয়ে যায়, এরকম কেস আমি স্বচক্ষে দেখেছি। বাবা রিমোট হাতে বিশ্বকাপ দেখব বলে মিনমিন করায় আমার আপাত নিরীহ মা এমন দৃষ্টি দিয়েছিল একবার, যে, ত্রেতা যুগ হলে বাবার ভস্ম পেতাম খালি। বাকি শরীরটা স্রেফ হাওয়ায় ভেসে যেত।

কিছু বললে মা একটাই কথা বলে, “সারাদিন এত কাজ করি, সন্ধেটা টিভি দেখব তাতেও তোদের আপত্তি? কদিন আর বাঁচব?”

এই কদিন আর বাঁচবর মতো সেন্টুপূর্ণ কথা পৃথিবীতে আর আছে? তাও যদি নিজের মা বলে। এই কথা শুনলে চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়ে। নিজের বেঁচে থাকার প্রতি অনীহা জন্মায়। নিজের প্রতি তীব্র ঘেন্না জন্মায়। ছিহ, মাকে এত কষ্ট দিতে পারলাম আমি?

দুটো বিস্কুট, দুটো চা শেষ করে বাইকে চড়লাম। অফিস যেতে হবে। পেটের ভাত জোটাতে হবে। বসে থেকে রাজনীতির প্যাঁচাল শোনার বিলাসিতা আমাকে দেখালে চলবে না।

খানিকটা যেতেই ফোনটা ঘোঁৎ ঘোঁৎ শুরু করল। ভাইব্রেশনে থাকলে আমার ফোন ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে। আপনাদের ফোন কী করে তা আপনারাই ভালো বলতে পারবেন।

ফোন বের করে দেখলাম বউ ফোন করছে।

ধরা কি ঠিক হবে?

একটু ভেবে দেখলাম না ধরলে আবার প্রচুর টেনশন কাজ করবে। কী বলতে চেয়েছিল, কেন বলতে চেয়েছিল ইত্যাদি ইত্যাদি। তার থেকে ধরে নেওয়াই ভালো।

ধরলাম। বললাম, "হ্যালো।"

"নেট ব্যাংকিং আইডি পাসওয়ার্ডটা পাঠান তো। আমার অ্যাকাউন্টে কিছু টাকা লাগবে। ওটিপি গেলে সেটাও দেবেন।"

আমি হাঁ করে খাবি খেয়ে বললাম, "এটা তো কাউকে দেওয়া যায় না।"

"আমি বউ তো! আমাকে দেওয়া যাবে।"

"আপনাকে বাড়ি দিয়ে এসেছি। এখন কী করে বউ হবেন?"

"আপনি দেবেন, না ফোর নাইন্টি এইট ঠুকব?"

আমার হাত থেকে ফোন পড়ে গেল।

খেয়েছে! এ কার পাল্লায় পড়লাম রে বাবা!

১৪ আত্রেয়ী

"তুই যে লোককে সবথেকে বেশি অপছন্দ করিস, তোর ছেলে যদি তার মতো স্বভাব চরিত্র পায়, তখন কেমন লাগে বল তো?"

রুটি তরকারি খেতে খেতে কথাগুলো বলল আদৃতা। আমি হাঁ করে আদৃতার দিকে তাকিয়ে বললাম, "আমার ছেলে কোত্থেকে পেলি?"

আদৃতা রুটি চিবোতে চিবোতে বলল, "আরে তোর ছেলে মানে তো কথার কথা বলেছি। আমার ছেলের কথা বলছি। সবটা আমার শাশুড়ির মতো পেয়েছে জানিস! এমনকি, উনি যেরকম থমকে থমকে হাঁটেন, আমার ছেলেও সেরকম এক্কেবারে! জিন পেলি পেলি, আমার মার মতো পেতে পারতি না! ওর মার মতোই পেতে হল? শাশুড়ি না থাকলেও আমার ছেলেকে দেখলে মনে হবে যেন উনিই সামনে দিয়ে ঘুরঘুর করছেন! মরণ আর কাকে বলে!"

আমি চাউ খাচ্ছিলাম। হাসির চোটে সব বেরিয়ে যাচ্ছিল। অনেক কষ্টে জিভ-টিভ কামড়ে নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, "এইটুকু ছেলে, এখনই এত সব কিছু কল্পনা করে নিচ্ছিস কেন? তুই পারিসও বটে। পাগল কোথাকার একটা!"

আদৃতা হাত-টাত নেড়ে বলল, "তুই জানিস না বলে বলছিস। সংসার তো করতে হয় না। দিব্যি গায়ে হাওয়া লাগিয়ে কাটিয়ে দিচ্ছিস। দুদিন পর যখন বিয়ে হবে তখন বুঝবি কত ধানে কত চাল!"

আমি ঠোঁট কামড়ালাম। আগে এসব লজ্জা-টজ্জা পেতাম না। আজকাল পাচ্ছি। সে আসার পর থেকে পাচ্ছি। কোত্থেকে যে কী হয়ে গেল বুঝতে পারি না। কটা দিন যেন

স্বপ্নের মতো কেটে যাচ্ছে। জীবনটা এত ভালো হবে? সত্যি? ভাবতেই কেমন যেন লাগে।

আদৃতা বলল, "পেরেন্টস টিচার মিটিং আছে এই শনিবার, জানিস তো? হেডু আজ স্কুলে আসতেই বলে দিয়েছে।"

আমি বললাম, "হ্যাঁ। আমাকেও বলেছেন। হোক না, অসুবিধা কী?"

আদৃতা বলল, "অসুবিধার কিছু নেই। তবে আমাদের সময় তো এসব ছিল না রে। স্কুলে দিদিরা কী পেটান পেটাত। আমরা কি মানুষ হইনি? আজকাল কারও কান ধরলেও শহরসুদ্ধ লোক চলে আসে। টিভিতে ব্রেকিং নিউজ হয়ে যায়। ভয় লাগে। ক্লাস করাই, না বর্ডারে পাহারা দি বুঝতে পারি না। ক্লাস এইটের সঞ্চিতার কথা শুনেছিস তো?"

আমি বললাম, "না, আমি দুদিন আসিনি তো। কী হয়েছে?"

আদৃতা চারদিকে তাকিয়ে বলল, "একটা ছেলের সঙ্গে সিনেমা গেছিল স্কুল পালিয়ে। পড়বি তো পড় বাবার সামনে। মেয়েকে নিয়ে স্কুলে চলে এসেছিল। কী হম্বিতম্বি! তারপর হেডু বোঝাল, দেড় হাজার মেয়ের মধ্যে কোন মেয়ে স্কুল পালিয়ে সিনেমা দেখতে গেছে সেটা দেখা আমাদের কাজ না। তাতেও মানে না।"

আমার চোখ মোবাইলের দিকে চলে যাচ্ছিল। মেসেজ করছে না সে অনেকক্ষণ। মিটিংয়ে ঢুকেছে। নতুন চাকরি বলে কথা। বেশি বিরক্ত করাও ঠিক না। কিন্তু আমার এরকম হয় কেন? সারাক্ষণ মোবাইল দেখে চলেছি! চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে আমার একদিন। আমি জানি। আমার দ্বারা সব একসঙ্গে হবে না।

বীণাদি এই গরমেও উল বুনছেন। দূরে বসেছেন। বীণাদিকে সবাই সমীহ করে চলে। বাড়তি কথা বলেন না। তবে মাঝে মাঝে এমন সব কথা বলে বসেন যে হাসতে হাসতে পেট ব্যথা হয়ে যায়। ভদ্রমহিলার রসবোধ প্রচুর। তবে ভীষণ উইটি। মোটা দাগের কোনও রসিকতা করেন না।

আমার অবশ্য ভালো লাগে বীণাদির শাড়ির কালেকশন। এত ভালো ভালো শাড়ি পরেন যে দু চোখ ভরে দেখতে হয়। সামনের অক্টোবরে রিটায়ার করবেন। তবু কোনও কামাই নেই। ছাত্রীদের প্রাণভরে ভালোবাসেন। এরকম একজন শিক্ষিকা অনেক তপস্যা করলে পাওয়া যায়।

আদৃতার খাওয়া হয়ে গেছিল। বেসিনে গেল। টিচারস রুম ফাঁকা। বাকিরা ক্লাসে চলে গেছেন।

বীণাদি হঠাৎ উল বোনা থামিয়ে চশমার ফাঁক দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, “এই মেয়ে, প্রেম করছিস?”

আমার কান মাথা লাল হয়ে গেল।

কী ভীষণ লজ্জা পেলাম!

১৫ আত্রেয়ী

শহরে অফিস টাইমে চারদিকে এত হাত সব সময় উদ্যত হয়ে থাকে যে ভয় লাগে। মানুষ এরকম কেন হবে? বাবার বয়সি, কাকুর বয়সি, জেঠুর বয়সি, দাদুর বয়সি লোকেরা পিষে দিচ্ছে বাসে, মেট্রোতে সর্বত্র। স্কুল থেকে বেরিয়ে আমি বেশ কিছুক্ষণ দম আটকে দাঁড়িয়ে থাকি।

ট্যাক্সি নিই কোনও কোনও দিন। তাতে অনেক টাকা চলে যায়। ওভাবে হবে না বুঝে পাবলিক ট্রান্সপোর্টেই উঠব ঠিক করেছি শেষমেশ। বাসে উঠেই লেডিস সিটের দিকে চলে যাই। খানিকটা আক্রমণাত্মকও হয়েছি।

আগে কেউ গা ঘেঁষে দাঁড়াতে চাইলে ভয়ে সিঁটিয়ে থাকতাম। আজকাল চেঁচিয়ে উঠি। কোনও কোনও সময় বিপরীত দিক থেকেও তীব্র প্রতিক্রিয়া আসে, “অফিস টাইমে অত ভদ্রতা রাখলে ট্যাক্সিতে যেয়ো মামণি” টাইপ কমেন্ট আসে। এই প্রতিক্রিয়াগুলো একা কেউ করে না। অনেকে মিলেই করে। যেন এর অন্যথা হতেই পারে না। লোকটার কোনও খারাপ অভিপ্রায় থাকতেই পারে না।

অবশ্য অপ্রত্যাশিতভাবে অনেকের সমর্থনও পেয়ে যাই। সব পুরুষ খারাপ নয়। বুঝতে পারি সময় এগোলে। এও বুঝি খুব সুন্দর মুখের পুরুষের ভেতরটা কুৎসিত হতে পারে, উলটোটাও হতে পারে। পুরুষের চোখের থেকে বড়ো সত্যি আর কিছু হয় না। ক্রমাগত বুকের দিকে তাকিয়ে কথা বলা একজন অতীব ভদ্রলোক যেমন আমাদের স্কুলের সেক্রেটারি। মাঝে মাঝে মনে হয় চড় মারি। অথচ তাঁর কথা শুনলে কে বলবে তিনি এরকম। চোখটাই আসল।

সাত পাঁচ ভেবে স্কুল থেকে বেরিয়ে চোখ বন্ধ করেই দাঁড়িয়ে ছিলাম, বাস স্ট্যান্ডের দিকে রওনা দেব মনস্থির করে চোখ খুলে দেখি সামনে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন বাইক নিয়ে। আমি ফ্যালফ্যাল করে তার দিকে তাকিয়ে বললাম, "অফিস?"

অমৃত বলল, "তোমার কথা খুব মনে পড়ছিল। পেট খারাপ বলে পালিয়ে এলাম।"

আমি হাঁ করে ওর দিকে তাকিয়ে থেকে বললাম, "ধরা পড়ে যাও যদি?"

অমৃত হাসল, "ধরা পড়ব কেন? সবাই কেজো লোক। কাজ করুক। আমি বরং একটু প্রেম করি। প্রেমের দ্বিতীয় দিন অত হিসেবি হলে হয়?"

আমার কেমন লজ্জা লাগছিল। স্কুলের সব ম্যাডামরা বেরিয়ে যাননি এখনও। দেখলে বিচ্ছিরি ব্যাপার হবে। ওকে বললাম, “তুমি রাস্তা ধরে খানিকটা এগিয়ে দাঁড়াও। আমি আসছি।”

অমৃত বলল, “ধুস। পিছনে বসো। এখনই হুশ করে বেরিয়ে যাই।”

খানিকটা অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমি ওর বাইকের পিছনে উঠলাম। শুরুতেই এত স্পিড দিল যে জাপটে ধরতে হল।

বললাম, “কী করছ? আস্তে চালাও।”

অমৃত বলল, “তোমার স্কুলের সবাই দেখবে, না? দাঁড়াও, এলাকাটা পেরোই।”

বেশ জোরে চালিয়ে অনেকটা রাস্তা পেরোল। বড়ো রাস্তায় গাড়ির গতি কমল। আমি ওকে জড়িয়ে ধরে আছি। প্রথমে ভয় লাগছিল। এখন অনেকখানি ভালোলাগা সেটাকে গ্রাস করতে শুরু করেছে। খানিকটা গিয়ে বাইক দাঁড় করিয়ে অমৃত বলল, “আমার এখন ‘এই পথ যদি না শেষ হয়’ গাইতে ইচ্ছা করছে।”

আমি বললাম, “গাও না। কে বারণ করেছে?”

অমৃত বলল, "আমার না খুব আনন্দ হচ্ছে। খুব। তোমায় বলে বোঝাতে পারব না।"

আমার হাসি পেল। ছেলেটা কেমন বাচ্চাদের মতো করে! অথচ প্রথম প্রথম কী ডাঁটই না দেখাত, বাবাহ! আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, "হয়েছে হয়েছে। আমি বাড়ি যাই।"

অমৃত অপ্রস্তুত মুখ করে বলল, "চলে যাবে? এখনই? ধুস। তাহলে কী করে হবে?"

আমি বললাম, "তাহলে কী করবে? তুমিই বলো।"

অমৃত বলল, "ঘুরি। উদ্দেশ্যহীনভাবেই ঘুরি। জড়িয়ে ধরে বসে থাকো না। আর শোনো, মেট্রোদাদু দেখলে বাইকের স্পিড বাড়িয়ে দেব।"

আমি হেসে ফেললাম। বললাম, "এ কথাগুলো ভেবে বলো, না বানিয়ে নাও?"

অমৃত বলল, "বানিয়ে ফেলি সঙ্গে সঙ্গে। আমি খুব ট্যালেন্টেড তো।" বলেই হেসে ফেলল। তারপর বলল, "তোমায় বাড়িতে নিয়ে যেতে বলছে সবাই। যাবে আমাদের বাড়ি?"

আমি ওর দিকে তাকালাম।

খুশিতে চোখ দুটো চিকচিক করছে।

আমার হঠাৎ খুব কষ্ট হল।

ভালো লাগছে না কেন কিছু?

১৬ জীমূতবাহন

ঈশান আমার দিকে বড়ো বড়ো চোখ করে এমনভাবে তাকিয়ে আছে যেন অ্যালিয়েন দেখছে। আমি বললাম, "কী হল?"

ঈশান বলল, "ভাই মুত, তোর বউ চলে গেল? বিয়ের পরের দিন?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ। চলে গেল। কী করব? আমার কী করার আছে?"

ঈশান মুখের হাঁ বন্ধ না করেই বলল, "এবার কী হবে?"

আমার ইচ্ছে করছিল মল্লিকের লেডিকেনিটা ঈশানের মুখে ঢুকিয়ে দি। প্রবল ইচ্ছা দমন করে বললাম, "তোর এত চাপ হচ্ছে কেন? আমার বিয়ে আমি বুঝব।"

ঈশান গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বলল, “তুই বুঝছিস না। এরকম কোথাও হয় না। লোকে কী বলবে?”

আমি কম্পিউটার স্ক্রিনে মনোযোগ দিয়ে বললাম, “লোকে যা ইচ্ছা বলুক। আমার তাতে কিছু করার নেই।”

ঈশান বলল, “এইজন্য বিয়ে করতে নেই। বিয়ে জিনিসটাই গোলমেলে হয়ে গেছে।”

আমি বললাম, “আমি তো শখ করে বিয়ে করিনি। সবাই বলল মেয়ে লগ্নভ্রষ্টা হতে চলেছে। আমিও ব্রাইডাল মেকআপ দেখে বার খেয়ে বিয়ে করে ফেললাম। দেখতে তো ভালোই লাগছিল। ভেতরে যে বিছুটিপাতা আছে আমি কী করে বুঝব? আমি অপরাজিত দেখা পাবলিক। কিন্তু যুগটা যে বিভূতিভূষণের নেই, কিউর যুগ হয়ে গেছে, সেটা তো বুঝিনি।”

ঈশান ভ্যাবাচ্যাকা মুখে বলল, “কিউ?”

আমি বললাম, “গান্ডু।”

ঈশান বুদ্ধিমানের মতো মাথা নাচাল, “ওহ। বুঝেছি। কী আর করা। স্যাড লাইফ। আচ্ছা তুই আবার বিয়ে করতে পারবি তো?”

আমি দু হাত জোড় করে প্রণাম করার ভঙ্গি করে বললাম, "আর বিয়ে? নমস্কার। আর দরকার নেই। এখনই আমার নেট ব্যাংকিং পাসওয়ার্ড চেয়ে নিয়েছে।"

ঈশান বলল, "সে কী! কেন?"

আমি বললাম, "টাকা চাই।"

ঈশান বলল, "যাহ শালা। এ কেমন মেয়ে?"

আমি বললাম, "বললাম তো! পুরো বিছুটিপাতা।"

কথা শেষ হল না, আমার ফোন বাজতে শুরু করল। দেখলাম বউ। ঈশানকে বললাম, "এই দেখ, শয়তানের নাম নিলাম না, শয়তান হাজির।"

ঈশান বলল, "ধর ধর, কী বলে দেখ।"

আমি ফোন তুললাম, "হ্যালো।"

ওপাশ থেকে বউয়ের রাগি গলা ভেসে এল, "এই, তুমি ডরম্যান্ট অ্যাকাউন্টের ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড দিয়েছ কেন?"

আমি বললাম, "মানে?"

বউ বলল, "তোমার অ্যাকাউন্টে পঁচাশি টাকা পড়ে আছে। ক্যা করেঙ্গে হাম ইতনে ধনরাশি সে? যে অ্যাকাউন্টে টাকা আছে, সে অ্যাকাউন্টের ইউজার নেম, পাসওয়ার্ড দাও।"

আমি বললাম, "আমার এই একটাই অ্যাকাউন্ট। আমার টাকা নেই তো! এরকমই টাকা থাকে। নেহাতই গরিব আদমি আমি।"

বউ বলল, "তোমার সাহস তো কম না! পঁচাশি টাকা অ্যাকাউন্টে নিয়ে তুমি আমাকে বিয়ে করতে গিয়েছিলে?"

আমি বললাম, "আমি কোথায় তোমাকে বিয়ে করতে গেছিলাম! আমি তো খাসি খেতে গেছিলাম। অমলকান্তি রোদ্দুর না হয়ে রোদ্দুর রায় হয়ে গেল বলেই তো আমাকে বিয়ে করতে হল।"

বউ বলল, "তোমার সঙ্গে বিয়ে করা আমার ভুল হয়ে গেছে।"

আমি বললাম, "হ্যাঁ, আর আমি তো ঐতিহাসিক ঠিক করেছি তোমাকে বিয়ে করে। এত ভালো সিদ্ধান্ত আর কিছু হতেই পারে না।"

বউ বলল, "শাট আপ। তুমি জানো আমার জন্য কত ছেলে পাগল?"

আমি বললাম, "স্বাভাবিক। তোমার এক কিলোমিটার রেডিয়াসে কোনও সুস্থ মানুষ থাকাই সম্ভব না।"

বউ রেগে গেল, "এই তুমি এরকম টিজ করে করে কথা বলছ কেন? খুব সাহস দেখছি তোমার!"

আমি বললাম, "আমার সাহসের কিছু নেই। বিয়ে করেছ, বাড়ি চলে গেছ। আমার কী? আমার তো কিছু করার নেই।"

বউ বলল, "আমি সিদ্ধান্ত চেঞ্জ করেছি। বিয়ে করেছি যখন সংসার করব। হানিমুনে যাব। আজ রাতেই নিয়ে যাবে আমাকে।"

আমি খাবি খেলাম, "মানে? হানিমুনে যাবে আবার কী? তুমি তো বাড়ি চলে গেছ!"

বউ বলল, "বললাম তো ডিসিশন চেঞ্জ করেছি। দার্জিলিং যাব। টিকিট কাটো। রাতে যাব।"

আমি বললাম, "ওভাবে হয় নাকি? ছুটি নেই, টাকা নেই। কোত্থেকে পাব সব?"

বউ বলল, "আমি কী জানি? জোগাড় করো। আমি হানিমুনে যাব আজ। আমার বাড়িতে ভাল্লাগছে না। মা সারাক্ষণ ইনিয়েবিনিয়ে কেঁদে কানের মা-মাটি-মানুষ করে দিচ্ছে। এখানে থাকলে আমি পাগল হয়ে যাব। দার্জিলিং নিয়ে চলো। রেডি হয়ে থাকব। নিয়ে যাবে। রাখলাম।"

বউ ফোনটা কেটে দিল।

ঈশান পাশে আগ্রহ নিয়ে শুনছিল। ফোন রাখতেই ঝাঁপিয়ে পড়ল, "কী রে, কী হল?"

আমি ভ্যাবাচ্যাকা গলায় বললাম, "পাগল করে দে মা, লুটেপুটে খাই। হাজার তিরিশেক টাকা ধার দে ভাই। আমি শ্যাষ!"

১৭ অমৃত

আমাকে যদি প্রেম নিয়ে এসে লিখতে দেওয়া হয়, আমি এখন চৌরাস্তায় একটা চেয়ারের ওপর দাঁড়িয়ে প্রেম নিয়ে এসে লিখতে পারব।

প্রেম নিয়ে একটা টলিউডি গান আছে "প্রেম কী বুঝিনি আগে তো খুঁজিনি, আজ কী হল রে আমার।"

বিষয়টা টালিগঞ্জের গান বলেই একবারে উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়। সিরিয়াসলিই প্রেম যে কী আগেভাগে বোঝা সম্ভব নয়। যখন আসে, তখন এক্কেবারে মাইক টাইসনের মতো বুকে মুখে পিঠে ঘুসি মেরে নিজের অস্তিত্ব বোঝাতে শুরু করে দেয়।

আত্রেয়ীর কথাই ধরি। যখন আসেনি, আসেনি। কিন্তু যখন এল, তখন সারাক্ষণ মনে হতে শুরু করল কেন ও আমার সামনে বসে নেই? কেন আমাকে সারাক্ষণ রিপ্লাই করবে না? কেনই বা অন্য লোকের সঙ্গে কথা বলবে?

প্রেম নিয়ে একটা পাই চার্ট বানাতে গেলে দেখা যাবে প্রেমের তিনভাগ ভালোবাসা, একভাগ অধিকারবোধ। টিনএজ প্রেমে অধিকারবোধ বেশি থাকে। আমি টিনএজ নই। চাকরি পেয়েছি, বাড়ি থেকে বিয়ের কথা হচ্ছে আর এই সময় আত্রেয়ীর সঙ্গে আলাপ হয়েছে। তবু আমার টিনএজ পাবলিকের মতো ভীষণ প্রেম পায়। প্রেম পেলে কথা ছিল, আমার চুমুও পায়।

একটা কথা আছে, এ শহরে রাস্তাঘাটে হিসিতে কেস নেই, কিসিতে কেস আছে। তবু আমরা চুমু খেয়েছি। বৃষ্টি পড়ছিল, চুমু খাওয়ার পর লক্ষ করেছি ট্রাফিক পুলিশ

আমাদের দিকে বড়ো বড়ো চোখ করে তাকিয়ে আছে। আত্রেয়ী ঘাবড়ে গিয়ে বলল, "দেখেছ, এবার যদি জেলে নিয়ে যায়?"

আমি ওর হাত শক্ত করে ধরে বলেছি, "কেউ কোথাও যাবে না।"

পুলিশ আমাদের দিকে তাকিয়েছে। তারপর রাস্তা পরিচালনার কাজে ব্যস্ত হয়ে গেছে। সম্ভবত নিজেও প্রেম করেই বিয়ে করেছিল। প্রেম করে বিয়ে করা লোকজন কি বাকিদের প্রতি খানিকটা সফট হয়? কে জানে! হলে তো ভালোই। তাহলে একটা লিস্ট করা যেতে পারে শহরের কোন কোন ট্রাফিক পুলিশ প্রেম করে বিয়ে করেছিল। সেক্ষেত্রে তাদের সামনে চুমু খাওয়া যেতে পারে। অবশ্য শহরে তো শুধু পুলিশ থাকে না, মরাল পুলিশও থাকে। পৃথিবীর সব ফ্রাস্ট্রেশন বুকে নিয়ে যারা জন্মগ্রহণ করে। কেন চুমু খেলে, কী কারণে চুমু খেলে, এদের এত প্রশ্ন জীবনে!

অবশ্য আত্রেয়ী আমাকে অনুযোগের সুরে বলেছে, "তুমি ভারী ইয়ে। যেখানে সেখানে গাড়ি দাঁড় করিয়ে চুমু খাও কেন?"

আমি মাথা চুলকে বলেছি, "আচ্ছা, তাহলে কয়েকটা পয়েন্ট ঠিক করো। সেখানে সেখানেই খাব। ব্যাপারটা তাহলে আর যেখানে সেখানে হবে না।"

আত্রেয়ী হেসে ফেলেছে। আমার পিঠে ঘুসি মেরে বলেছে, "বদমাইশ।"

আত্রেয়ী যখন এই শব্দটা বলে, মনে হয় গোটা পৃথিবীটা ওর সামনে নামিয়ে রাখি। একটা শব্দ একজনের মুখে শুনতে এত ভালো লাগে?

মাথায় সারাক্ষণ একটা কথাই পাক খায় আজকাল। বিয়েটা কবে হবে?

আত্রেয়ী বলল অবশ্য বাড়িতে বলবে। সমস্যা তো এটাই। দুজন মানুষ ভালোবাসবে, তারপর পরিবার চলে এসে সব কিছু জটিল করে দেবে। অবশ্য আমার মনে হয় না আমাদের দুই পরিবার থেকেই কোনওরকম সমস্যা হতে পারে। দু পক্ষই যথেষ্ট লিবারাল। তবু ভয় লাগে।

ভালোবাসার মানুষকে হারানোর ভয়ের থেকে বড়ো ভয় বোধহয় আর কিছু হয় না। আত্রেয়ী আমার ঘাড়ে আলতো করে আদর করে, আমি চুপ করে বসে থাকি। আদর করার পরে আত্রেয়ী বলে ঠিক এমন করে ও ওর কুকুরকেও আদর করে। বলেই ফিক ফিক করে হেসে ফেলে।

শুনে আমি বুঝতে পারি আমার হেবি রেগে যাওয়া দরকার, কিন্তু আমি রাগতে পারি না। আত্রেয়ীর কানে কামড়ে দিয়ে বলি, দ্যাখো তো, এভাবেই তোমার কুকুরও কামড়ায় নাকি? দুজনে মিলে খুনসুটি শুরু হয়।

আত্রেয়ীর বাড়ির সামনে যখন ওকে নিয়ে নামালাম, দেখলাম একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। আত্রেয়ী আগে দেখেনি। যখন দেখল তখন দেরি হয়ে গেছে। আমার কোমর খামচে ধরে বলল, "জেঠুমণি। তুমি বাইকটা দাঁড় না করিয়ে সোজা বেরিয়ে যাও।"

আমার মাথা কাজ করছিল না। আমি উলটোটা করলাম। সোজা আত্রেয়ীর জেঠুমণির সামনে বাইকটা দাঁড় করিয়ে দিলাম।

ভদ্রলোক একবার আমার দিকে, আর-একবার আত্রেয়ীর দিকে বিস্মিত চোখে তাকালেন।

আমি আর-একটু ছড়ালাম, ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বত্রিশ পাটি বের করে বললাম, "জেঠুমণি ভালো আছ?"

আপনি-টাপনি না, সরাসরি তুমি।

আমি কেস খাব না তো কে খাবে?

১৮ জীমূতবাহন

কথায় আছে কপালে থাকলে কী যে হতে পারে ভগাদাও জানেন না।

আমার হয়েছে সেই অবস্থা। দার্জিলিং মেইলে বউসুদ্ধ এসি টু টিয়ারের টিকিট ম্যানেজ হয়ে গেল। আমাকে অবশ্য কিছুই করতে হয়নি। সবই তিনি করেছেন।

আমাকে অফিস থেকে স্টেশনে যেতে বলেছিল। গিয়ে দেখি পায়চারি করছে। আমাকে দেখে কড়া গলায় বলল, "টাকা জোগাড় হয়েছে?"

আমি ব্যাজার গলায় বললাম, "ধার করেছি।"

বউ খুশি খুশি গলায় বলল, "বেশ তো। ধারে ঘোরার মজাই আলাদা।"

আমি বললাম, "ট্রেনের টিকিট কী হবে? মেঝেতে বসে যাবে?"

বউ বলল, "আমার টিটি মামা আছে কি মুখ দেখতে? চলো দেখি।"

তারপর আমার হাত ধরে টেনে টেনে নিয়ে গেল এক কালো কোটওয়ালা ভদ্রলোকের কাছে। দেখেই চিনেছি, এ চিজ ছিল বিয়েতে। আমাকে বিয়ের পিঁড়িতে বসাতে এর অবদানও কম না।

এরপর পুরোটাই মোহন সিরিজের গল্প, "কী হইতে কী হইয়া গেল কেহ বলিতে পারে না।"

প্রথমেই এসিতে তুলে দিল আমাদের। তারপর ঠিক দেখা গেল সাইড আপার লোয়ারে দুজন অ্যাবসেন্ট। বোলপুর স্টেশনে পেরোনোর পর অবাক চোখে দেখলাম ম্যানেজ হয়ে গেল।

আমার সালোয়ারধারী বউ চোখ নাচাতে নাচাতে বলল, "দেখলে তোমার বউয়ের ক্ষমতা?"

আমি খাবি খেয়ে বললাম, "সে তো বিয়ের দিন থেকেই দেখছি, এ আর নতুন কী?"

বউ বাইরের দিকে তাকিয়ে বলল, "তা ঠিক। বাড়িতে বলেছ তো?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ। বলেছি।"

বউ বলল, "আমিও বলেছি।"

আমি বললাম, "অমলকান্তি যাবে নাকি দার্জিলিং?"

বউ আমার দিকে কড়া চোখে তাকিয়ে বলল, "ওই শুয়োরটা কেন যাবে? মানে কেন? কী কারণে?"

আমি বললাম, "না মানে ওর সঙ্গে তো তোমার বিয়ে হবার কথা ছিল। তাই ভাবলাম।"

বউ বলল, "বিয়ে হয়েছে?"

আমি বললাম, "না তা হয়নি।"

বউ কয়েক সেকেন্ড আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমাকে দেয় কে? সিরিয়াসলি, কে দেয় তোমায়?"

আমি বললাম, "ইয়ে মানে কেউ দেয় না বলেই তো তোমার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে।"

বউ বলল, "তাও ঠিক। যাক গে, এ যাত্রায় বেঁচে গেলে। ডিভোর্স করার ইচ্ছে নেই আমার। ইচ্ছে করছেও না।"

আমি দীর্ঘশ্বাস চেপে বললাম, "কেন? মানে আমি কি খুব ইম্প্রেসিভ কিছু কাজ করেছি?"

বউ মাথা দুদিকে নাড়িয়ে বলল, "না। আমার মুড নেই। দাঁড়াও, একটু ফুঁকে আসি বাইরে থেকে।"

আমি আঁতকে উঠে বললাম, "ফুঁকবে মানে? ট্রেনে স্মোকিং ব্যান না?"

বউ বলল, "না না, মাঝের প্যাসেজটায় ফুঁকব। কেন, তোমার একা থাকতে ভয় লাগবে?"

আমি হাসব না কাঁদব বুঝতে না পেরে বললাম, "না ঠিক আছে, যাও।"

বউ ফুঁকতে গেল।

আমি কয়েক মিনিট আলুসেদ্ধর মতো বসে থেকে দরজা ঠেলে মাঝের প্যাসেজে গিয়ে দেখলাম বউ মন দিয়ে সিগারেট ফুঁকছে। আমাকে দেখে বলল, "কী ব্যাপার? কাউন্টার নেবে?"

আমি ভয়ে ভয়ে মাথা নাড়ালাম, "না লাগবে না।"

বউ বলল, "মদ খেতে ইচ্ছা করছে।"

আমি ঘাবড়ে গিয়ে বললাম, "থাক। দার্জিলিং গিয়ে খেয়ো নাহয়।"

বউ বলল, "হ্যাঁ, তাই করতে হবে। তুমি স্মোক করো তো, নাও না কাউন্টার।"

আমি বললাম, "আচ্ছা দাও।"

বউ সিগারেটটা এগিয়ে দিয়ে বলল, "বহুদিন পাহাড় দেখি না। ঝাঁটের লাইফ হয়ে গেছে। বালছাল কবিদের সাথে এইজন্য প্রেম করতে নেই। শুধু বাতেলা। এইসব অমলকান্তি-ফান্তি কোত্থেকে যে জোটালাম কে জানে! তুমি কোনও দিন কবিতা লিখেছ?"

আমি বললাম, "আমার মেলে না। মানে ছন্দ। আর বুঝিও না ঠিক ওসব।"

বউ আমার হাত থেকে সিগারেট নিয়ে মন দিয়ে টান দিতে দিতে বলল, "মেয়েরা কবিতা হেবি খায়। জনি সিঙ্গের ইয়ের থেকেও বেশি খায় দুই লাইনের কবিতা। আমিও খেয়েছিলাম। মাল যে ডরপোক বেরোবে বুঝিনি।"

আমি ভালো মানুষের মতো মুখ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

ট্রেন ছুটে চলেছে দ্রুত গতিতে।

আমি আরও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, "তুমি কি আমার সঙ্গে সংসার করতে চাও? না মজা করে ঘুরতে এলে এই অবধিই?"

বউ আমার দিকে চোখ ছোটো ছোটো করে তাকিয়ে বলল, “তুমি কি চাও? তোমার আমাকে পছন্দ?”

আমি বললাম, “আমি অত ভেবে দেখিনি। সব কিছু এত ঝড়ের গতিতে হয়ে গেল, তুমি বাড়িও চলে গেলে, আবার এখানেও নিয়ে চলে এলে, আমি ঠিক করে কিছু বুঝতেই পারছি না, আমার সঙ্গে কী হচ্ছে বা হতে চলেছে।”

বউ ফিক ফিক করে হাসতে হাসতে বলল, “ষোলো বছর বয়স ছিল। এক মেধাবী দাদা প্রেগন্যান্ট করে দিয়েছিল। অনেক কষ্টে সে যাত্রা বেঁচেছিলাম। এই ফ্যাক্টটা জানলে তুমি আমাকে বিয়ে করতে?”

আমি ওর দিকে তাকালাম। হাসি হাসি মুখটা কখন যেন সিরিয়াস হয়ে গেছে।

ট্রেনের স্পিড বাড়ছে।

আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

১৯ আত্রেয়ী

মানে এ ছেলেটা এরকম কেন? কেন? আর আমার কপালেই এরকম জুটবে কেন?

বাইকটা দাঁড় করালি করালি, তাও জেঠুমণির সামনেই? আর আমার জেঠুকেই জিজ্ঞেস করে বসলি, “জেঠুমণি ভালো আছ?”

আমার মনে হচ্ছিল হৃৎপিণ্ড বেরিয়ে যাবে এত জোরে হার্টবিটের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম।

জেঠুমণিও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছিল। একবার ওর দিকে, আর-একবার আমার দিকে তাকিয়ে বলল, “হ্যাঁ ভালো আছি, কিন্তু তুমি কে বাবা?”

অমৃত আমার দিকে তাকিয়ে বলল, “নামো তো।”

আমি খানিকটা ঘোরের মাথাতেই বাইক থেকে নামলাম।

অমৃত নিজে নামল, হেলমেট খুলল, তারপর বাইক স্ট্যান্ড করে জেঠুমণিকে ঢিপ করে প্রণাম করে বলল, “আমার নাম অমৃত। আমি আত্রেয়ীকে বিয়ে করব।”

জেঠুমণি কাশতে শুরু করল।

আমি রেগেমেগে ওর হাত ধরে বললাম, “তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি?”

অমৃত এবার বুঝল কেস করেছে। একবার আমার দিকে আর একবার জেঠুর দিকে তাকিয়ে বলল, "খুব ভুল করে ফেললাম মনে হচ্ছে?"

জেঠুমণি কাশতে কাশতে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "ওকে ঘরের ভেতর নিয়ে জল-টল দে। মনে হয় বেশি উত্তেজনায় কী বলতে হবে বুঝতে পারেনি।"

অমৃত মাথা চুলকে বলল, "তাই হবে। আমি ঠিক নরমাল নই, বুঝলেন?"

আমি দাঁতে দাঁত চিপে রাগি গলায় বললাম, "বাইকটা বাড়ির ভেতরে ঢুকিয়ে এসো। অনেক করেছ।"

অমৃত বাইক স্ট্যান্ড থেকে নামাতে গিয়ে পড়তে পড়তে বাঁচল। আমিই ধরলাম। তারপর দুজনে মিলে বাইকটা বাড়ির ভেতর নিয়ে এলাম।

বাবা বাইরে শব্দ শুনে বাইরে এসেছিল। জেঠুমণি বাবাকে দেখে বলল, "বাপ্পা দেখ রে তোর জামাই এসেছে।"

বাবা হতভম্ব গলায় বলল, "মানে?"

আমার মনে হচ্ছিল শাবল দিয়ে গর্ত করে মাটির ভিতর ঢুকে যাই। অমৃতকে দেখিয়ে বাবাকে বললাম, "ওর নাম অমৃত।"

বাবা কয়েক সেকেন্ড অমৃতর দিকে তাকিয়ে বলল, "ওহ। আচ্ছা। বেশ তো।"

বাবাও বাক্যহারা হয়ে গেছে। আমি অমৃতর দিকে কড়া চোখে তাকিয়ে বললাম, "আমার বাবা! প্রণাম করো।"

অমৃত বাবার পায়ে ডাইভ দিল। বাবা চমকে উঠে "থাক বাবা, থাক থাক", বলে সরে গেল।

অমৃতকে বললাম, "ঘরের ভিতর চলো।"

অমৃত ঘোরের মধ্যেই কোনও দিকে না তাকিয়ে বসার ঘরে গিয়ে সোফায় বসে পড়ল।

জেঠুমণি জোরে হেসে উঠল। বাবা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "কী রে? কী ব্যাপার?"

জেঠুমণি বলল, "বুঝলি না? আমাদের মেয়ে তার মতো একটা পাগল জোগাড় করেছে। ভারী মজার ছেলে। চ আলাপ করি।"

আমি কী করব বুঝতে না পেরে রান্নাঘরে দৌড়োলাম। সেখান থেকেই দেখলাম অমৃতর সামনে বাবা আর জেঠুমণি বসেছে।

আমি জিভ কাটলাম। এ কী সমস্যায় পড়লাম রে বাবা! এরকম করে কিছু হয় নাকি? এ কেমন পাগল ছেলে!

ডিম দেখতে পাচ্ছিলাম। কড়াইতে তেল গরম করে ডিম ছাড়লাম। অমলেটটা হতেই প্লেটে নিয়ে শিগগিরি বসার ঘরে দৌড়লাম। ওকে একা ছাড়া যাবে না। আবার ছড়িয়ে লাট করে যদি!

অমৃত অবশ্য ডিমের প্লেট দেখেই আমার দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ গলায় বলল, "বাহ, তুমি তো আমার পালস পড়তে পারো দেখছি। তুমি কী করে বুঝলে আমার এখন অমলেট খেতে ইচ্ছা করছিল?"

বাবা মুগ্ধ গলায় অমৃতর দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমার অমলেট ভালো লাগে বুঝি?"

অমৃত চামচ দিয়ে অমলেট কাটতে কাটতে বলল, "আমার বেসিকালি সব কিছু ভালো লাগে। কিন্তু সন্ধে হলে অমলেটের যে মারকাটারি একটা ব্যাপার আছে, সেটাকে অস্বীকার করার কোনও জায়গা নেই।"

জেঠুমণি হাসতে হাসতে বলল, "কীরকম?"

অমৃত বলল, "দেখুন পৃথিবীতে মাছ, মাংস অনেক কিছুই আছে খাবার মতো। কিন্তু ওই যে তাওয়ায় ডিমটা দেওয়া হয়, তারপর যে জিনিসটা প্লেটে আসে, আর তার সঙ্গে চারদিক জুড়ানো যে গন্ধ, এর তুল্য বোধহয় আর কিছু হতে পারে না। অ্যাটলিস্ট আমার কাছে। হ্যাঁ, এক-একজন মানুষ এক-এক রকম। আপনার হয়তো ফিশফ্রাই ভালো লাগে। লাগতেই পারে। গণতান্ত্রিক দেশ, সবার পছন্দ সমান হবে, এমন মাথার দিব্যি কে দিয়েছে?"

বাবা বলল, "তোমাদের আলাপ কোথায়?"

অমৃত মন দিয়ে ডিম খাচ্ছিল। এতক্ষণ পরে বোধহয় বুঝতে পারল ও আমার বাবার সামনে বসে আছে। অমলেট সহ প্লেটটা সামনের টেবিলে রেখে আমার দিকে অসহায় চোখে তাকাল।

আমার কেন জানি না, ঠিক এই সময়টাই ছেলেটাকে ভীষণ জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা করছিল।

একজন মানুষ এতটা পাগল, এত ভালো হয় কী করে?

২০ কপালকুণ্ডলা

মাঝে মাঝে আমি ভুলে যাই আমার মা বাবার দ্বিতীয় পক্ষের বউ। সদুদা মনে করিয়ে দেয়।

সদুদা বাবার থেকেও বড়ো। আমাদের দোকানের কর্মচারী থেকে এখন প্রায় সবটাই সামলায়।

আমাদের দোকানের ডিডি গেঞ্জি বলা যেতে পারে। চোখ বন্ধ করে ভরসা করা যায়।

আমার যখন ছেলেপক্ষ তাড়িয়ে বাড়িতে মার ঝাঁটাপেটা খাবার উপক্রম হয়, তখন আমি সদুদার ঘরে গিয়ে লুকাই। আমাদের দোকানের পিছনেই সদুদার ছোট্ট একখানা ঘর। একখানা ছোটো টেবিলফ্যান চালিয়ে গেঞ্জিটা মিশমিশে কালো ভুঁড়ির উপর তুলে দিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমায়। এরকম গায়ের রংওয়ালা লোকেদেরই আবলুশ কাঠ গায়ের রং বলে বোধ হয়।

সদুজেঠু বলা উচিত, কিন্তু কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে, ছোটোবেলা থেকে দাদা চলতে চলতে এখনও সেটাই বলি। আবার সদুজ্যাঠাও বলি কখনও কখনও। পাগল তো আমি। ডাকের ঠিক ঠিকানা নেই কোনও।

সাঁপুইদের তাড়িয়ে যথারীতি আমি সদুদার ঘরে সেঁধিয়েছি।

সদুদা এক ধামা মুড়ি নিয়ে বসেছিল। মাখা সন্দেশ দিয়ে মুড়ি মেখে খায়। হেবি লাগে। আমিও খাই। তবে এখন ভালো লাগছিল না। চুপ করে গিয়ে বসলাম।

সদুদা মুড়ি খেতে খেতে বলল, "তোর বাপ তোর বিয়ে দিয়েই ছাড়বে কপাল। পালিয়ে যেতে পারবি না।"

আমি রেগে ছিলাম। ঘোঁৎ করে একটা শব্দ করে বললাম, "জানি তো। মেয়েরা তো বাবা মার বোঝা। যত তাড়াতাড়ি ঘাড় থেকে নামানো যায় তত মঙ্গল। কই, আমার মতো দোকান বাবাও কি চালাতে পারে? একবারও কেন ভাববে না, মেয়ে যদি বিয়ে করতে না চায় তবে থাক?"

সদুদা ফিক ফিক করে হাসতে হাসতে বলল, "যদি মেয়ের বাবারা সেটা ভাবত, তবে পৃথিবীটাই অন্যরকম হয়ে যেত। মেয়েজন্ম তো পাপ। তাও তো ভালো রে, এ দেশেরই কোনও কোনও রাজ্য আছে, যেখানে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করে দেখে নেয় পেটে মেয়ে আছে, তারপর গর্ভাবস্থাতেই সে মেয়েকে মেরে ফেলা হয়। তোর বাপের মোটা মাথায় আর কী ঢুকবে? মেয়ের বিয়ে ছাড়া আর কিছু ভাবতেই পারবে না। যে দেশে মেয়ে জন্মালে বাবারা মেয়ের বিয়ের জন্য টাকা জমাতে শুরু করে, যেখানে মেয়ের বিয়ে মানেই একগাদা জিনিস দিতে হয়, সে দেশে মেয়েকে বিদায় করাটা অস্বাভাবিক কেন হবে?"

আমার কান্না পাচ্ছিল। কাঁদলাম বেশ খানিকক্ষণ হুহু করে। একমাত্র সদুদার কাছেই আমি প্রাণ খুলে কাঁদতে পারি। সদুদা কান্না থামাল না। আমাকে চুপ করে কেঁদে যেতে দিল। কান্নার বেগ কমলে সদুদা বলল, "মানুষ একটা মেয়ের বাইরেটা দ্যাখে। তার সাজগোজ দ্যাখে, চোখ দ্যাখে ট্যারা নাকি, দাঁত দ্যাখে ফোকলা নাকি, পা দ্যাখে খোঁড়া নাকি। যেমন করে গোরু কেনে লোকে হাট থেকে, সেভাবে দ্যাখে। অথচ মেয়েটার কী ইচ্ছা, কটা মানুষ দ্যাখে?"

আমি ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললাম, "তুমি থামো। খালি বড়ো বড়ো কথা। নিজে বিয়ে না করে ভুঁড়িওয়ালা ময়রা সেজে জীবন কাটিয়ে দিলে আর আমাকে বাতেলা মারছ। বিয়ে করতে পারতে না? তোমার যদি মেয়ে হত, কত সুখে থাকত বলো তো?"

সদুদা হাসল, "আমিও আসলে তোর বাবার মতোই। বাতেলায় অন্ধকার করে দেবে, আর আসল জায়গায় গিয়ে দেখা যাবে আমিও ওদের মতোই করছি। আমার ইচ্ছায় হত না, আমার বউয়ের ইচ্ছায় হত হয়তো। তোর বাবা কি তোকে কম ভালোবাসে? মা কি কম ভালোবাসে? তা তো না। কিন্তু তোকে বিয়ে দেওয়ার জন্য ওরা এত উতলা কেন? কারণ এটাই সিস্টেম। সিস্টেম ভাঙার কথা সবাই ভাবতে পারে না। তবে যারা ভাঙে তারাই টিকে যায়, বাকিরা গতানুগতিক হয়ে থেকে যায়। তুই বল না, নেতাজির আমলে কত লোক তো থাকত, একজনের নামও কেউ জানে? তুই তোর প্রপিতামহের নাম জানিস? কিন্তু সুভাষচন্দ্র বোসের নাম সবাই জানে। কেন জানে? কারণ লোকটা ওই নিস্তরঙ্গ

সুখী, মেরুদণ্ডহীন বাঙালি জীবনটাকে ভাঙতে পেরেছিল। মানুষকে বিশ্বাস করাতে পেরেছিল যে, দ্যাখো, চেষ্টা করলে পারব না হয়তো, কিন্তু পারতেও তো পারি। তুই সৌরভ গাঙ্গুলির কথা ভাব না। লোকটার তো সব ঠিক ছিল না। লাফিয়ে ওঠা বল খেলতে পারত না, হুক পুল তো ছেড়েই দিলাম। টিম থেকে বাদ দিয়ে দিল। চ্যাপেল জানে, এ ছোঁড়া ঘাসের পিচে পায়খানা করে দেবে। ভেবেছিল যাবে সাউথ আফ্রিকান পিচে, বুকে-টুকে বল খেয়ে পালিয়ে আসবে। কিন্তু আদতে কী হল? সেই ছেলেটাই অবলীলায় ঘুরে দাঁড়াল। গড়পড়তা বাঙালি চিন্তাধারা নিয়ে চললে পারত? অনেক তো পেয়েছিল জীবনে, অত বড়ো বাড়ি, অতগুলো বাড়ি, দেশের ক্যাপ্টেনও ছিল, কী দরকার ছিল খেলার? রিটায়ারমেন্ট নিয়ে নিলেই তো পারত। নাহ, নেয়নি। এখানেই লোকটা সবার থেকে আলাদা। সবাই পারে না। কেউ কেউ পারে। যারা পারে, তারা থাকে। তোর বাবা পারবে না, থাকবেও না।”

আমি মুগ্ধ হয়ে সদুদার কথা শুনছিলাম। কত সুন্দর করে কথা বলে লোকটা, কত জ্ঞান, অথচ মিষ্টির দোকানেই কাটিয়ে দিল গোটা জীবন। মানুষের জীবন বড়ো জটিল। কে যে কোথায় কেন আছে, কেউ বলতে পারে না।

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বললাম, “ও সদুদা, বাবার আগের বউয়ের কথা বলো না গো। কেমন ছিল দেখতে?”

সদুদা উত্তর না দিয়ে মন দিয়ে মুড়ি খেতে লাগল। এই কথা জিজ্ঞেস করলেই সদুদা চুপ মেরে যায়। কখনও মুড হলে একটু বলে। বেশিরভাগটাই বলে না।

আমি উঠলাম না আর। চুপ করে বসে রইলাম। কোথাও যেতে ইচ্ছা করছিল না।

২১ জীমূতবাহন

কথায় আছে, "অভাগা যেদিকে চায়, সাগর শুকায়ে যায়।"

আমার হয়েছে সেই অবস্থা। এমন জ্যাম লাগল সেবক থেকে, আর দার্জিলিং যাওয়া হল না। তিস্তা বাজারের থেকে যে রাস্তা কালিম্পং-এর দিকে বেঁকে গেছে, সে রাস্তায় খানিকটা গিয়ে নাম না জানা জায়গায় একটা নির্জন হোম স্টে-তে যখন পৌঁছোলাম তখন রাত সাড়ে আটটা।

বউয়ের চাপ ছিল না। খানিকক্ষণ পর পর ঘুমিয়েছে। আমার গাড়িতে ঘুম এসেছিল বটে, কিন্তু এত খিদে পেয়েছিল যে ঘুম ভেঙে গেছিল। গোটা রাস্তা গাড়ি শামুকের গতিতে এগিয়েছে। হোম স্টে-তে পৌঁছে চেঞ্জ না করেই বিছানায় শুয়ে পড়লাম।

বউ একটা জানলা খুলে দিল। শীত নেই তেমন। জানলার কাছে গিয়ে সিগারেট ধরিয়ে কয়েকটা টান দিয়ে বলল, "তুমি জীবনে কটা প্রেম করেছ?"

আমার মাথা ধরে গেছিল। তবু বউয়ের প্রশ্নটা কানে এল। একটা হালকা হাওয়া আসছে বাইরে থেকে। বললাম, "হাফখানা। তাও একটা বিয়েবাড়িতে। ক্লাস ইলেভেনে। মেয়েটা বিয়েবাড়ির পরে আর ফোনও ধরল না।"

বউ খ্যাক খ্যাক করে কয়েক মিনিট হেসে বলল, "তা বোঝাই যায়। তোমার দ্বারা প্রেম হবে না।"

আমি বললাম, "ইয়ে মানে সিগারেটটা না খেলে হয়? আমার কেমন মাথা ধরছে।"

বউ বলল, "তুমিও ধরাও একটা। নাকি কাউন্টার নেবে?"

আমি বললাম, "আমার ইচ্ছে করছে না।"

বউ বলল, "গুড। আচ্ছা, তুমি আমাকে বিয়ে করেছ। তোমার সম্মান রক্ষার্থে এই সিগারেটটা আমি ফেলে দিলাম।"

আমাকে অবাক করে বউ সিগারেটটা জানলা দিয়ে ফেলে দিল।

আমি খানিকক্ষণ সেদিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকলাম। বাপরে। কত সম্মান। বলতে ইচ্ছা করছিল, আমাকে এত সম্মান দিলেন মা, আমি কি এত সম্মানের যোগ্য? বললাম না। যা জিনিস, এখানে কোনও সিন ক্রিয়েট করে দিলে কেলো হয়ে যাবে।

বউ আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "খুশি?"

আমি মাথা নাড়লাম, "হ্যাঁ, খুশি।"

বউ খাটের ওপর বসে মাথার চুল খুলে দিল। কত চুল রে বাপ! আমার চুলে শ্যাম্পু করতে দু টাকার সানসিল্কে হয়ে যায়। এর যা চুল দেখছি, তাতে শিওর গোটা বোতল লাগে। ধুস, কী সব মাথায় আসছে।

বউ আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "অমলকান্তি হলে এখন কবিতা আউড়াত। শুনে শুনে কান পচে গেছে। চুল নিয়ে লোকের কী এত কবিত্ব আসে কে জানে! হিন্দির চুল নিয়ে তো আসতে পারে।"

আমি হেসে ফেললাম। বউ বলল, "তোমার প্রেম হয়নি তাহলে সেভাবে?"

দরজায় কেউ নক করল। বউ দরজা খুলল। গরম কফি দিয়ে গেল দু কাপ। বউ আমার দিকে আমার কাপটা এগিয়ে দিয়ে বলল, "এ নাও। ভালো লাগবে।"

আমি ভাবছিলাম আমার কী ভাগ্যি। অবশ্য যেরকম ওয়েদার, যখন তখন যা তা হতেই পারে। আমার বউয়ের যা রূপ দেখেছি, ঠিক কিছুই বিশ্বাস হয় না। উঠে বসে কফিতে চুমুক দিলাম। বেশ ভালো লাগল। বউ আবার জিজ্ঞেস করল, "তোমার প্রেম হয়নি তাহলে সেভাবে?"

আমি মাথা নাড়লাম, "না। হয়নি। তোমার?"

বউ বলল, "আমারও হয়েছে। ফিজিকাল রিলেশনও।"

আমি চমকালাম না। এ মেয়ের থেকে কিছুই অপ্রত্যাশিত না। বললাম, "অমলকান্তির সঙ্গে?"

বউ মুখ কুঁচকে বলল, "ধুস! ওই দু লাইনের ফেসবুক কবির দু ইঞ্চিও আছে নাকি সন্দেহ আছে আমার। ও তো আমার বডিগার্ড ছিল।"

আমি খাবি খেয়ে বললাম, "মানে? ওকে তুমি ভালোবাসতে না? ওর সঙ্গে বিয়ে করতে গেছিলে যে?"

বউ চুপ করে কফি খেতে লাগল। কিছুক্ষণ পর বলল, "অ্যাকচুয়ালি ওর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা পুরোটাই লোক দেখানো। ওকে আমার দরকার ছিল কিছু মানুষের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য। আমি যাকে ভালোবাসি সে একজন বিবাহিত মানুষ। কয়েক মাস হল বিয়ে হয়েছে।"

আমি চমকালাম।

বউ হেসে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "ওর কিন্তু বিয়েতে বিন্দুমাত্র মত ছিল না। বাড়ি থেকে জোর করে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা দুজন দুজনকে পাগলের মতো ভালোবাসি।"

কফিটা কেমন বিস্বাদ লাগছিল। তবু জিজ্ঞেস করলাম, "তাহলে তুমি এখানে এলে কেন?"

বউ বলল, "ওকে জ্বালাতে। প্রেমে একটু জ্বালানো পোড়ানোরও দরকার আছে, তাই না?"

আমি ক্যাবলার মতো মাথা নাড়লাম।

বউ বলল, "প্রথম যখন প্রোপোজ করেছিল, আমি শুরুতেই না করে দিয়েছিলাম ওকে। ও কিন্তু হাল ছাড়েনি। ক্রমাগত আমায় বিভিন্নভাবে বুঝিয়ে গেছে আমার ওপর ওর সফট কর্নার আছে। বাইরে চাকরি করে ও। বিয়ের কার্ড দিতে কলকাতা এসে বলল দেখা করবে। আমার বাড়িতেই এল। কেউ ছিল না সেদিন। কার্ড দেওয়া হল, কিন্তু তার থেকেও বেশি যেটা হল, আমি আবিষ্কার করে বসলাম আমি ওকে ভালোবাসি। দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরে খুব আদর করলাম। ও আমাকে কথা দিয়েছিল বিয়েটা করবে না। কিন্তু বাড়িতে জানানো মাত্র এত সমস্যা বেড়ে গেল যে বিয়েটা ওকে করতেই হল। যদিও আমাদের মধ্যে যোগাযোগটা ঠিকই আছে এখনও। আমরা মিটও করি।"

আমি অবাক গলায় বললাম, "আর ওর বউ?"

বউ হেসে বলল, "বিন্দুবিসর্গ জানে না। ও বলেইনি ওকে কিছু।"

আমি বললাম, "কিন্তু সেটা কি ঠিক হয়?"

বউ বলল, "এভরিথিং ইজ ফেয়ার ইন লাভ অ্যান্ড ওয়ার। চলো ডিনার করে আসি।"

বউ উঠল।

আমার আর উঠতে ইচ্ছা করছিল না।

খিদেটা কোথায় যেন ঢুকে গেল।

২২

মাংসের গন্ধ ভালোই বেরিয়েছিল। চিকেন রুটি করেছিল। বউ অনেকটা খেল। খিদে পেয়েছিল। আমি একটা রুটির বেশি খেতে পারলাম না। অস্বস্তি লাগছিল।

ঘরে এসে বউ বলল, "তোমার আমার স্টোরিটা শুনতে ইচ্ছে করছে?"

আমি বললাম, "তোমার ঘুম পায়নি?"

বউ বলল, "গাড়িতে ঘুমালাম তো। তুমি ঘুমালে ঘুমাও। আমি একটু টেক্সট করব ওকে।"

বউ ব্যাগ থেকে ফোন বের করে মেসেজ করতে শুরু করল।

আমি কেমন ক্যাবলার মতো কয়েক সেকেন্ড সেদিকে তাকিয়ে বললাম, "ভদ্রলোকের বউ? পাশে নেই?"

বউ হাসল, "বউ সাথে থাকে না তো। উইকএন্ডে দেখা হয় শুধু। বাকি পাঁচ দিন আমার সঙ্গে টেক্সট চলে। ও কটা দিন আমিই বউ আর কি।"

আমি বললাম, "ওহ। ঠিক আছে।"

বউ বলল, "তোমার আনএথিকাল লাগছে না ব্যাপারটা? স্বাভাবিক। শোনো, তোমাকে বেশি কিছু করতে হবে না। কয়েক দিন আমার সঙ্গে থেকো। তারপর ডিভোর্স দিয়ে দিয়ো। আমি তো বাড়ি চলেই গেছিলাম। পরক্ষণে মনে পড়ল আমি যদি তোমার সঙ্গে স্বাভাবিক দাম্পত্যে না থাকি তবে ওর বউয়ের সন্দেহ হতে পারে।"

আমি চুপ করে বসে থেকে বললাম, "অমলকান্তি পালিয়ে গেছিল কেন? ও কি কিছু বুঝেছিল?"

বউ জোরে হেসে উঠে বলল, "নাহ। অত বুদ্ধি ওর নেই। আমার একটা ভলান্টিয়ার দরকার ছিল। অমলকান্তি ছিল না, তুমি এলে। একই হল।"

আমি বললাম, "ভলান্টিয়ার? মানে মুরগি?"

বউ বলল, "তুমি রেগে যেয়ো না। কটা দিন কষ্ট করো। তারপর ডিভোর্স হয়ে যাবে।"

আমি বললাম, “ডিভোর্স করে তুমি কী করবে? ওই ভদ্রলোক তো বিবাহিত।”

বউ কাঁধ ঝাঁকাল, “ও এইসব বিয়ে-টিয়ে নামের ইন্সটিটিউশন মানে না। বউকে ছেড়ে আমার কাছে চলে আসবে যে-কোনো দিন।”

আমার সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছিল। বউ টেক্সট করতে করতে ফোন করল এবার। ফোনটা নিয়ে ঘরের বাইরে চলে গেল।

আমি খাটে চুপ করে বসে রইলাম। নিজেকে চার অক্ষরের বোকা মনে হল। অদ্ভুত একটা রাগ হচ্ছিল।

সমস্যা হল, এক-একটা মানুষের এক-একটা জিনিস থাকে না। আমার যেমন বেশ কিছু অনুভূতি ভোঁতা। যেভাবে বিয়ে হল তা মনে হয় এই দু হাজার উনিশ সালে এসে কারও হওয়া সম্ভব না। বিয়ে আদৌ করব কি না সেটাও কোনও দিন ঠিক ছিল না। বাড়ি থেকে তাড়া দিচ্ছিল বটে, কিন্তু আমি ঠিক কাটিয়ে যাচ্ছিলাম। বিয়ের নামে আমার বরাবর একটা ভীতি কাজ করত। যেভাবে বিয়েটা হয়েছিল সেটাও একটা ঘোরের মধ্যে।

বিভূতিভূষণের আমলে এসব বিয়ে হত বটে। কিন্তু ঘোর কলকাতা শহরে এভাবে জোর করে বিয়ে দেওয়ার কারণটা একটু একটু করে খোলসা হচ্ছিল। হিসেবমতো আমার রেগে যাওয়া উচিত। চেঁচামেচিও করা উচিত। আমার কিছুই আসছিল না। আমি কেমন

একটা জড়ভরতের মতো কয়েক মিনিট বসে রইলাম। দলা পাকিয়ে একটা কান্না যে আসছিল না তা অস্বীকার করব না, তবে সেটা গিলে ফেলছিলাম। এভাবে একটা মানুষের সঙ্গে কী করে পরপর অঘটন ঘটতে পারে? জোর করে বিয়ে, হানিমুনের নাম করে বন্ধুর কাছে হাত পেতে টাকা নিয়ে আসা, আর তারপরে এরকম একটা গল্প শোনা, আমার নিজেরই সব কিছু কেমন অবিশ্বাস্য লাগছিল। জ্ঞানত কারও কোনও ক্ষতি করিনি, পাড়ার কারও জন্য হাসপাতালে রাত জাগতে হলে সবার আগে আমিই দৌড়োই। যখন যা দরকার আমি চলে যাই সবার আগে। সেই আমার সঙ্গে এরকম একটা বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপার হতে পারল? ডিভোর্স হয়েই বা কী হবে? এ ক্ষত তো চিরকালীন হয়ে থাকবে। রাগ হচ্ছিল। একটু একটু করে।

খাটে শুয়ে পড়লাম। বালিশে মাথা দিয়ে চাদর টেনে নিলাম। ঘুম আসছিল না তবে চোখ বুজে রইলাম। কিছুক্ষণ পরে বউ এসে পাশে শুল ফোনে কথা বলতে বলতেই। ন্যাকা ন্যাকা গলায় কথা বলছিল, “তুমি কিন্তু নিজের খেয়াল রাখবে। এরপরে এসো, আমার কোলে মাথা রেখে শুয়ো, আবার আমি তোমার চুলে বিলি কেটে দেব।”

আমি কয়েক সেকেন্ড চুপ করে বসে থেকে উঠে বসলাম। বউয়ের হাত থেকে ফোনটা নিয়ে দেওয়ালে ছুড়ে মারলাম।

বউ আমার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে উঠে বসে বলল, “এটা কী করলে তুমি?”

আমি নিজেও বুঝতে পারিনি এটা আমি করতে পারি। একটু ভেবে নিয়ে বললাম, "আমি করিনি। ঘুমের ঘোরে আমার এরকম একটা রোগ আছে। তুমি কিছু মনে কোরো না। আমার ফোন দিয়ে ফোন করো। আমি তোমাকে ফোন কিনে দেব একটা।"

বউ চুপ করে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "আইন-টাইন জানা আছে? বধূনির্যাতন হলে কী হতে পারে জানো? চাকরি তো যাবেই, জেলের ঘানি টেনে জীবন কেটে যাবে।"

আমি বললাম, "পাহাড়ে অনেকের বউ খাদে পড়ে মরে যায় জানো তো? পা স্লিপ করে যায়। বেশি চাপের কিছু না। একটু ঠ্যালা দিলেও হয়। কিংবা ধরো তোমার গলাটা টিপে দিলাম। তারপর খাদে ফেলে দিলাম। কে বুঝবে?"

বউ আতঙ্কিত হয়ে আমার দিকে তাকাল। বলল, "তোমাকে নিরীহ ভেবেছিলাম।"

আমি শুয়ে পড়ে চোখ বন্ধ করে বললাম, "ঘুমিয়ে পড়ো। কাল সকালে দার্জিলিং যাবে। আর ওই কে আছে না, তার সঙ্গে আর-একবার কথা বললে তাকে ধাপার মাঠে পুঁতে দিয়ে আসব। আমাকে চেনো না তুমি।"

বউ অবিশ্বাসী চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

২৩

ছোটোবেলায় পড়েছিলাম জীব আর জড়। প্রকৃতিটা প্রাণী বাদে যেসব গাছপালা আর জড় পদার্থ নিয়ে তৈরী, তাদের কি আমাদের দুঃখ, কষ্ট, আনন্দ, সুখ ইত্যাদিতে কিচ্ছু যায় আসে? মনে তো হয় না। সকাল থেকে ক্রমাগত বৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে।

দার্জিলিং যাবার সিদ্ধান্ত ক্যান্সেল করতে হয়েছে এই বৃষ্টিতে বেরোতে পারা যাবে না বলে। একটা কম্বল মুড়ি দিয়ে নিশ্চিন্তে কেমন গুটিশুটি মেরে বউ ঘুমাচ্ছে। আমি জানলা খুলে খাদ দেখছি আর মাঝে মাঝে বউয়ের দিকে তাকাচ্ছি। এই মেয়েটা আমাকে ভালোবাসে না। সব কিছুই হঠাৎ করে হয়ে গেছে। তবু এই বাইরের বৃষ্টি আর এই কুঁকড়ে থাকা শোয়াটা সব কেমন অবিশ্বাস করতে বলছে!

ওর ফোনটা এখনও মেঝেতে পড়ে আছে। নিজে আর তুলতে যায়নি। আমার ওপর তেমন রাগারাগিও আর করেনি। যেন ঠিক আছে, এরকম তো হতেই পারে। কিছুক্ষণ পরে কম্বল টেনে নিয়ে ঘুমিয়েও পড়ল। আমি চুপ করে কিছুক্ষণ বসে থেকে শুয়ে পড়েছিলাম। মাঝরাতে দেখি আমার গায়ের ওপর পা তুলে দিয়েছে। গলার ওপর হাত। হাতটা কোনও মতে সরালাম। পা-টাও। বৃষ্টি নেমেছিল মাঝরাতেও। ও নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে থাকল। একবারও উঠল না। আর আমার ঘুম এল না। পায়চারি করলাম। হোম স্টের বাইরের রাস্তায় খানিকক্ষণ হাঁটাহাঁটি করলাম। পাহাড়ের নিস্তব্ধতা চিরে ঝিঁঝির ডাক আসছিল। শীতও লাগছিল। এখানে রাতের দিকে শীত পড়ে। উদ্দেশ্যহীনভাবে অন্ধকারেই অনেকটা হেঁটে আবার ঘরে এসে বসলাম। কান, মাথা, নাক ঠান্ডা হয়ে গেছে।

ছেলেদের কাঁদতে নেই নাকি। আমার ভীষণ কান্না পেল। নিজের বর/বউয়ের আর-একটা সম্পর্ক জানার পরে মানুষ কি এভাবেই কাঁদে? আদৌ কাঁদে? আমার তো সব কিছুই দুম করে হয়ে গিয়েছিল, তাহলে আমার কেন কান্না পাবে? একটা সম্পর্ক, যাকে সবাই জোর করে নাম দিয়ে দিতে চেয়েছে, সে সম্পর্কে আমি কেনই বা দুম করে অধিকারবোধ দেখাতে যাব? কান্নাই বা আসবে কেন? এগুলো কেন হবে? মাথায় হাত দিয়ে অনেকক্ষণ বসে সোফাতেই ঢুলে পড়েছিলাম। ঘুম ভাঙল সেই বৃষ্টির শব্দেই। ও তখনও ঘুমাচ্ছে।

হোম স্টের মালকিন নিজে এসে চা দিয়ে গেলেন। দরজা খোলার শব্দে ও উঠে পড়ল। খাটে বসে বেশ কয়েক সেকেন্ড আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "গুড মর্নিং।"

আমার মনে হল ও কি কালকের রাতের কথা ভুলে গেছে? সেটা আর জিজ্ঞেস না করেই বললাম, "গুড মর্নিং। চা দিয়ে গেছে। চিনি খাও তো?"

ও আঁতকে উঠে বলল, "একবারেই না। চিনি খেলে খুব ফ্যাট হয় জানো না?"

আমি বললাম, "হতে পারে।"

ও বাইরের দিকে তাকিয়ে বলল, "ঈশ, কী রোম্যান্টিক ওয়েদার।"

আমি কিছু বললাম না। চুপ করে বসে চা খেতে লাগলাম।

চায়ের কাপ হাতে নেবার পর ওর ফোনের দিকে চোখ পড়ল। বলল, "এই, তুমি আমার ফোনটা ভেঙে দিয়েছ না?"

আমি ওর দিকে তাকালাম। কেমন বাচ্চাদের মতো প্রশ্নটা করল। আমি বললাম, "ভুলে গেছ?"

ও খাটে বসে পড়ে বলল, "ভুলব কেন? ভোলার কিছু নেই। ফোন ছুড়ে ফেলতে পারো, মন থেকে কি কাউকে ছুড়ে ফেলতে পারবে?"

আমি বললাম, "একেবারেই না। সম্ভবও না সেটা। তোমায় আমি ফোন কিনে দেব। কাল আমার কাজটা উচিত হয়নি একেবারেই।"

ও বলল, "একদম। ভালোই হল, নতুন ফোন পাব। কাল আমার ভয় পাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু পাইনি। স্বাভাবিক। তোমরা জায়গায় যে-কোনো ছেলে থাকলেও তাই করত। ইন ফ্যাক্ট তুমি যে বললে না খাদে ঠেলে ফেলে দেবে, সেটাও করতে পারত। তুমি তো কিছুই করলে না।"

আমি বললাম, "আমার কিছুই করার ক্ষমতা নেই। আমি নিজের কাজের জন্য যথেষ্ট দুঃখিতও বটে। তুমি আমার ফোন থেকে তোমার প্রয়োজনীয় ফোনগুলো সেরে নিতে পারো।"

ও হাত নেড়ে বলল, "দরকার নেই। বেড়াতে এসেছি, বেড়াই। পরে দেখা যাবে। অ্যাকচুয়ালি তোমাকেও দোষ দেওয়া যায় না। দুম করে কাউকে এভাবে বিয়ে করে মুরগি করা হলে তার রাগ হতেই পারে। আমি কিছু মনে করিনি। তুমি চাপ নিয়ো না।"

আমি বললাম, "নিচ্ছি না চাপ। তুমি ডিভোর্সের জন্য যা যা করার দরকার করে নিয়ো কলকাতা গিয়ে। আমি ভাবছি আর পাহাড়ে না গিয়ে বৃষ্টি কমলে এখান থেকেই কলকাতা ফিরে যাই। অকারণ ঘোরার তো কোনও মানে দেখতে পাচ্ছি না।"

ও বলল, "না না। আমি এখন কলকাতা যাচ্ছি না। ঈশ, জঘন্য। আর শোনো, তোমার চিন্তা করতে হবে না। ডিভোর্স হয়ে যাবে। মিউচুয়ালি করা কোনও ব্যাপারই না। আর আমরা তো রেজিস্ট্রিই করিনি এখনও। অত জটিল কিছু হবে না। খামোখা তোমার কটা দিন নষ্ট করলাম, এটা ঠিক। চিন্তা কোরো না, আমার একটা ফিক্সড ডিপোজিট আছে, তোমায় সব ক্ষতিপূরণ দিয়ে দেব। তুমি আমায় পাহাড় ঘোরাও বুঝলে? চাপ নিয়ো না। টাকা দিয়ে দেব। আমি ধার রাখব না।"

কেমন হাত পা নেড়ে নেড়ে ও কথাগুলো বলল। সব নিশ্চিন্ত যেন। কোথাও কোনও চিন্তা নেই, সব কত সহজ সরল। কেউ কেউ নিজের পৃথিবীটাকে এরকম বানিয়ে নিতে পারে। তাকে সামনে পিছনে কিছু ভাবতে হয় না। অন্যের জীবনে কী প্রভাব পড়ছে ভাবতে হয় না। সে সব কিছুই ভেবে নেয় তার মনমতো চলবে।

আমার চা খাওয়া হয়ে গেছিল। কাপটা সামনের টেবিলে নামিয়ে রেখে বললাম, “বেশ। কোথায় কোথায় যাবে বলো। ঘুরব।”

ও লাফ দিয়ে বলল, “ইয়েস।”

আমি অবাক হয়ে গেলাম। এই মেয়েটা আদৌ সুস্থ তো?

২৪ আত্রেয়ী

পেরেন্টস টিচার মিটিং-এর মতো ভয়াবহ ব্যাপার আমার জীবনে আর কিছু নেই। এক-একজন বাচ্চার বাবা এমনভাবে তাকিয়ে থাকে যেন গিলে খাবে। অথচ ব্যাপারটাকে বাইপাস করার জায়গা নেই। করতেই হবে। অত্যন্ত ক্লান্তিকরভাবে প্রথম পর্বটা শেষ হল। এই সময়টা মেসেজও দেখা যায় না। নিজের ডেস্কে এসে বসে সবার আগে মোবাইল দেখলাম। অমৃতর মেসেজ জমে আছে। একটা কবিতা লিখেছে কাঁচা হাতে। হাসি পেলেও হাসলাম না। বাণীদি কেমন অন্তর্ভেদী দৃষ্টি নিয়ে তাকান, ভীষণ লজ্জা

লাগে। রিপ্লাইতে লাভ সাইন দিলাম বেশ কয়েকটা। অমৃত অনলাইনই ছিল। লিখল, “আমার এই পচা কবিতাও ভালো লাগল?”

আমি লিখলাম, “হ্যাঁ, হোক না পচা, তবুও তো আমার।”

অমৃত হাসির ইমোজি পাঠাল। লিখলাম, “খেয়েছ?”

অমৃত লিখল, “জাস্ট। তোমার পিটিএম কেমন যাচ্ছে?”

লিখলাম, “জঘন্য। তোমাকে নিয়ে এসে বসাতে পারলে ভালো হত, বুঝলে?”

অমৃত লিখল, “আমার তো তাই ইচ্ছা। সারাদিন তোমার কাছে এসেই বসে থাকি।”

আমার হাসি পেলেও হাসলাম না।

আদৃতা পাশে এসে বসে মোবাইলে ঝুঁকে পড়ল। আমি মোবাইলটা সরিয়ে নিয়ে বললাম, “কী হল? এসব কী?”

আদৃতা বলল, “তোর ইয়ে কী লিখেছে দেখাবি না ভাই? দেখা না, কী হয়েছে। আরে শেষে তো সেই বর যাবে দূরে আর শাশুড়ির সাথেই লড়ে মরতে হবে।”

আমি বললাম, "আমার শাশুড়ি নেই। শ্বশুর আছে।"

আদৃতা বলল, "তাও ভালো। বেঁচে গেছিস। আর কে কে আছে?"

আমি বললাম, "বলব না। সব বললে হয় নাকি?"

আদৃতা জোরে আমার গাল টিপে দিয়ে বলল, "ওলে বাবা লে, আমার সোনা মেয়ে রে। সবই তো দুদিন পরে জানতে পারব। এখন বলতে কী হয়?"

আমি হাসলাম, "গুরুদেবের বারণ আছে তো। কাউকে বলা যাবে না।"

আদৃতা চোখ টিপে বলল, "গুরুদেব? তা কে সে গুরুদেব? বাবা রামরহিম?"

আমি জোরে হেসে উঠলাম। বাণীদি তাকালেন, কিছু বললেন না।

আদৃতা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "লুকো লুকো ভাই। এই সময়টাই জীবনের সেরা সময়, বুঝলি? তারপর সব কিছু সামলাতে হবে। লাইফ পুরো হ্যাজ হয়ে যাবে। মেয়েদের জীবন তিনটে জিনিসে চলে বুঝলি?"

আমি কৌতূহলী হয়ে বললাম, “কী তিনটে জিনিস?”

আদৃতা ডার্টি পিকচারের বিদ্যা বালানের মতো মুখ করে বলল, “স্যাক্রিফাইস, স্যাক্রিফাইস, স্যাক্রিফাইস।”

আমি আবার হাসলাম।

আদৃতা বলল, “হাসছিস না? হেসে নে। কিন্তু এই স্যাক্রিফাইসের মতো জিনিস হয় না। বিয়ের আগে লেগ পিস পছন্দ করিস? বিয়ের পরে বর খাবে সেটা। তুই তো ব্রেস্ট খাবি। শক্ত শক্ত পিস। দাঁতে ছিবড়ে লাগে। কিন্তু তোকেই সেটা খেতে হবে। মাছের পেটি পছন্দ করতিস? ছেলে খাবে তো, কাঁটা পিস খেতে পারবে না সে। তোকে ল্যাজা খেতে হবে, যেটা তুই সবথেকে বেশি অপছন্দ করিস। বরের শরীর খারাপ হতেই পারে, কিন্তু তোর? নৈব নৈব চ। ওই নিয়েই কাজ করতে হবে। কাজের মেয়ে না এলে তো আরও ভালো। ঘর মোছ, বাসন মাজ, সব তোকেই করতে হবে। এর অন্যথা হবে না। সর্বোপরি আছে শাশুড়ি মাতার জ্ঞান। বউমা, রাতে এটা খায় না, বউমা, ভাদ্র মাসে ওটা খেতে নেই, বউমা, শরীর খারাপ হলে ঠাকুরঘরে যায় না... মেরে ফেল কেউ আমায়।”

আমি বললাম, “এত রাগ?”

আদৃতা বলল, “রাগই রাগ। মেয়েদের বিয়ে মানেই তো সব শেষ। বুঝবি বুঝবি। এখন অনেক কিছু মনে হবে। কত কত প্রতিশ্রুতি দেবে সে। রাজরানি করে রাখব, সব কাজ করে দেব, তোমাকে কোনও কিছুতে হাত দিতে দেব না... শেষমেশ...”

আদৃতার গলা জোরে হয়ে গেছিল। বাণীদি শুনতে পেয়েছিলেন। বললেন, “এইটুকু বয়সেই তোর এই অবস্থা আদৃতা। আমার বয়সে এলে কী করবি তুই?”

আদৃতা বলল, “সত্যিই জানি না দিদি। মরে যাব আমি শিওর। তুমি একশো বছর বাঁচো। কিন্তু আমার তোমার মতো এতদিন বাঁচার কোনও দরকার নেই।”

অনিন্দিতা টিচার্স রুমে ঢুকল। ওকেও বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল। আমাদের দেখে হাসল। আদৃতা বলল, “এই দ্যাখো, আর-এক নতুন বিয়ে ভদ্রমহিলা। তা দিদিভাই, কেমন লাগছে বরকে?”

অনিন্দিতা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে চুল ঠিক করতে করতে বলল, “অনিরুদ্ধ? ঠিকই আছে। সপ্তাহান্তে কলকাতা আসে। বাকি সময়টা চাতক পাখির মতো বসে থাকা।”

আদৃতা বলল, “ভুবনেশ্বরে চলে যা না। কী হবে চাকরি করে?”

অনিন্দিতা হেসে বলল, “চাকরিটা দরকার। নিজের পায়ে দাঁড়ানোটা সব মেয়ের দরকার। বুঝিস না সেটা?”

আদৃতা বলল, “তা আর বুঝি না? এটাই তো অক্সিজেন এখন।”

ওদের কথা শুনছিলাম। হঠাৎ দেখি অমৃত মেসেজ করেছে, “আজকেও দেখা করব কিন্তু। এসো।”

২৫ অমৃত
হিমুর একটা নদী ছিল।

ময়ূরাক্ষী।

আমারও আছে।

আত্রেয়ী।

আমার সর্বক্ষণ সঙ্গে থাকার নদী।

সৈয়দ মুজতবা আলী লিখেছিলেন প্রেমে না পড়লে বোঝা যায় না আপনি বুদ্ধিমান না বোকা। প্রেমে পড়লে মানুষ উলটো হয়ে যায়। চালাকরা বোকা হয়ে যায়, আর বোকারা চালাক।

প্রেমে পড়ার পর আবিষ্কার করলাম আমি আসলে হেবি চালাক ছিলাম। হ্যাঁ, মানে সিরিয়াসলি, এখন বোকা হয়ে গেছি।

নইলে আত্রেয়ীদের বাড়িতে গিয়ে ওরকম কম্মোটা করি? অনেকটা সময় অবধি আমি বুঝতেই পারছিলাম না যে আমি ওদের বাড়ি আছি। হঠাৎ করে খেয়াল পড়ল। আর তারপরেই আমি ট্রিপ করে গেলাম।

দুই ভদ্রলোকের একজন যে আত্রেয়ীর বাবা, আর একজন যে জেঠু, সেটা বোঝার পর আমি কিঞ্চিৎ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছিলাম। অমন প্রিয় অমলেটও তখন অচেনা লাগছিল। সেটাও প্লেট থেকে যেন আমার দিকে তাকিয়ে গাইছিল, "সেই তুমি কেন এত অচেনা হলে"।

সে সময়টা আত্রেয়ী পরিত্রাতা হয়ে না এলে আমার যাবতীয় কারিকুরি ওখানেই শেষ হয়ে যেত। "এই তুমি বেরোবে না, তোমার না অফিসের কাজগুলো বাড়িতে গিয়ে করতে হবে", বলে আত্রেয়ী এমন তাড়া দিল, আমি হুড়মুড় করে অমলেটটা খেয়েই দৌড় দিলাম। দুই ভদ্রলোক আমার যাওয়ার পথের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলেন।

পরে আত্রেয়ী বলেছে ওর বাবা আর জেঠু দুজনে মিলে ওকে ব্যাপক নাকি লেগপুল করেছে।

আমার বাবাও কম করছে না অবশ্য। ঘোষণা করেই দিয়েছে আমি নাকি বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ বউপাগলা ছেলে হব। বউ উঠতে বললে উঠব আর বসতে বললে বসব। সেটা শুনে দাদা বলেছে তার মানে এ গুণটা অমু তোমার থেকেই পাবে বাবা।

বাবা সেটা শুনে কিঞ্চিৎ খচেছে, তবে তারপরে নিজেকে ডিফেন্ড করতে বলেছে বউকে ভালোবাসা পুণ্যের কাজ। অমু যদি বউকে ভালোবাসে তাহলে তো সেটা ভালোই হবে।

দাদা খুক খুক করে হেসেছে।

বউদি প্রথম প্রথম খুব রাগ দেখিয়েছিল। এখন আত্রেয়ীর ছবি দেখেছে। আত্রেয়ীর সঙ্গে একদিন ফোনে কথাও বলেছে।

বাবা আত্রেয়ীর বাবার সঙ্গে ফোনে কথাও বলে ফেলেছে। ঠিক হয়েছে এ হপ্তার শেষে ওদের বাড়ি যাব সবাই মিলে।

সবাই মিলে বাড়ি ভর্তি আচ্ছে দিনের পরিবেশ।

আমার অবশ্য সমস্যা কমেনি।

বরং বেড়েছে। যে আমি কোনও দিন অফিস পালানোর কথা স্বপ্নেও ভাবতাম না, সে আমিই সেকেন্ড হাফ হলেই আত্রেয়ীকে দেখার জন্য পাগল পাগল হয়ে যাচ্ছি। ইনোভেটিভ সব আইডিয়া বের করতে হচ্ছে অফিস থেকে বের হবার জন্য। একদিন আমার পাইলসের ব্যথা বেড়েছে বললাম।

আর-একদিন বললাম, মেজো দাদু অসুস্থ।

নিজের দাদুই নেই তায় আবার মেজো দাদু! কতজনকে যে ভালোবাসার স্বার্থে পৃথিবীতে ইমপোর্ট করতে হচ্ছে তার হিসেব নেই।

সব কিছুর শেষে যখন আত্রেয়ীকে স্কুল থেকে বেরোতে দেখি, আমার দিকে তাকিয়ে ফিক করে ওর ভুবনজয়ী হাসিটা হাসতে দেখি, তখন মনে হয়, এ মেয়েটার জন্য হাসতে হাসতে জীবন দিয়ে দেওয়া যায়।

বাইকের পেছনে বসে যখন মেয়েটা আমার কোমরে হাত দেয়, খুনসুটি করে চিবুকটা কাঁধে ছোঁয়ায়, তখন একটা অদ্ভুত অনুভূতি হয়। এই পৃথিবীতে, এত মানুষের মধ্যে এই মেয়েটা আমার। আর আমি ওর। এর থেকে ভালো অনুভূতি বোধহয় আর কিছু হয় না।

অফিস থেকে বেরিয়ে বাইকটা স্ট্যান্ড করে কিছুক্ষণ দাঁড়ানোর পর ওদের স্কুল ছুটি হল। আমাকে দেখে চারদিকে তাকিয়ে রাস্তা পার হয়ে এসে আমার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "তুমি রোজ রোজ এভাবে অফিস পালাচ্ছ, চাকরিটা না থাকলে কী হবে?"

আমি বললাম, "তোমার চাকরি আছে তো, ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাং তুলে খাব।"

আত্রেয়ী আমার পেটে একটা ঘুসি মেরে বলল, "ছাতা খাওয়াব। বউয়ের টাকায় খাবে, লজ্জা লাগবে না?"

আমি বললাম, "অন্যের বউয়ের টাকায় তো খাব না। নিজের বউয়ের টাকায় খাব।"

আত্রেয়ী কয়েক সেকেন্ড আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "খুব ইয়ে হয়েছে না? আর বাবার সামনে তো কাপড়েচোপড়ে করে ফেলেছিলে, হুহ।"

আমি বললাম, "চলো, এখনই চলো। তোমাদের বাড়ি যাই। এবার দেখো কত স্মার্টলি কথা বলব।"

আত্রেয়ী বলল, "থাক। হয়েছে। ওই দ্যাখো, বাণীদি কেমন দেখতে দেখতে যাচ্ছেন। কত সিনিয়র উনি। তুমি এবার থেকে দূরে দাঁড়াবে বাইক নিয়ে। লজ্জা লাগে না বুঝি আমার?"

আমি বললাম, "এত লজ্জা রাখো কোথায় তুমি? ব্যাংকে?"

আত্রেয়ী হেসে ফেলল। বলল, "চলো। খিদে পেয়েছে।"

আমি বললাম, "আমারও। বিরিয়ানি খিদে পেয়েছে। খাবে বিরিয়ানি?"

আত্রেয়ী বলল, "বিয়ের পিঁড়িতে দুজনে ভুঁড়ি নিয়ে বসলে ভালো লাগবে দেখতে?"

আমি বললাম, "লাগবে। আমাদের বিরিয়ানি। আমরা বুঝব। চলো।"

আত্রেয়ীকে হেলমেট দিলাম। ওর জন্য নতুন হেলমেট কিনেছি। আত্রেয়ী পিছনে উঠে আমাকে ধরে বসলে বাইক স্টার্ট দিলাম।

আত্রেয়ী টুক করে ওর চিবুকটা আমার কাঁধে রেখেই হেসে ফেলল।

আমি বললাম, "অ্যাক্সিডেন্ট হবে কিন্তু। বাইক চলার সময় চুপ করে বসবে। এটা তো আর সিনেমা না যে গান গাইতে গাইতে পিছনে ফিরে চুমু খাব। অত ক্ষমতা নেই আমার।"

আত্রেয়ী বলল, “আমার কিন্তু খুব আদর পাচ্ছে।”

আমি বললাম, “তাই? আমার তো সকাল থেকে। তাইলে বিরিয়ানি আগে না চুমু?”

আত্রেয়ী আমার কাঁধে আলতো চাপ দিয়ে বলল, “তুমি যেটা চাইবে।”

আকাশ মেঘলাই ছিল। বৃষ্টি নামল যেন আমাদের কথা শুনেই।

খানিকটা গিয়ে বাইকটা রাস্তার বাঁদিকে দাঁড় করালাম।

চুমৌষধি হইতে বড়ো ঔষধি নাই।

কোনও এক মহাপুরুষ বলেছেন।

কে বলেছেন জিজ্ঞেস করিয়া লজ্জা দিবেন না।

২৬ জীমূতবাহন

ক্লাস টুয়েলভ অবধি বয়েজ স্কুল। কলেজ কো-এড হলেও ছেলেদের সঙ্গে থাকতাম, মেয়েদের থেকে বরাবর দূরে।

সেই ছেলে যখন একটা পাহাড়ি গ্রামে বসে বৃষ্টির মধ্যে একটা সুন্দরী মেয়ে, যে কিনা আমার বউ বলে সবাই জানে, তাকে মনোযোগী হয়ে কাজল পরতে দ্যাখে, তার কী হতে পারে?

আমি তাকাতে চাই না, যতবারই মনে পড়ে, এ মেয়ে আমার নয়, অন্য কেউ আছে এই মেয়ের জন্য, তবু না চাইতেও চোখ পড়ে যায় আয়নায়। কেমন শিল্পীর মতো চোখের পাশ দিয়ে কাজল পরছে! একটু টেনে দিল কাজলটা। তাতে আমার একটা হার্টবিট মিস হল। বৃষ্টির জল হোম স্টের সামনের রাস্তা দিয়ে বয়ে চলেছে নদীর মতো, রান্নাঘর থেকে একটা মন কেমন করা মাংসের গন্ধ ভেসে আসছে, আর আমি ক্যাবলার মতো একটা মেয়ের কাজল পরা দেখছি।

যাতে ওদিকে চোখ না যায়, তার চেষ্টা করলাম। মোবাইল বের করে খুটখুট শুরু করলাম। লাভ হল না। আড়চোখটা বিশ্বাসঘাতকতা শুরু করল। ঠিক চোখ চলে যায়।

কাজল পরা হলে নিপুণ হাতে এবার লিপস্টিক দিতে শুরু করল। লাল রঙের লিপস্টিক, লাল, কিন্তু লাল নয়। কী অদ্ভুত রং! বউ ঠোঁটদুটো এক করে মন দিয়ে লিপস্টিক দিল।

আমি এবার খানিকটা অধৈর্য হয়েই জিজ্ঞেস করলাম, “এত সাজছ কেন? এই বৃষ্টিতে আজ তো আর কোথাও যাওয়া হবে না!”

বউ এবার নেলপালিশ ধরেছে। ঠান্ডা মেঝেতেই পা পেতে বসে পড়েছে। আমায় বলল, “সাজার জন্য কোনও এক্সকিউজ লাগে নাকি? আমি তো এমনি এমনি সাজি! তুমি নেলপালিশ পরবে নাকি? এসো।”

আমি বললাম, “ধুস! তোমার কি মাথা খারাপ?”

বউ বলল, “অনিরুদ্ধকে পরিয়ে দিয়েছিলাম তো আমি। মজা করে। আবার রিমুভার দিয়ে রংটা মুছেও দিয়েছিলাম। এসো না, ভালো লাগবে দেখো।”

আমার যেটুকু ইচ্ছা হয়েছিল, অনিরুদ্ধর নামটা শুনে সব ইচ্ছা মেঘ হয়ে জানলা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

আমি খাটে পাশ ফিরে শুয়ে বললাম, “ওসবে আমার কোনও রুচি নেই। তুমি যা ইচ্ছা করো।”

বউ বলল, “অনিরুদ্ধর নাম শুনে ফাটল? কী কী করেছি শুনলে তো আরও ফাটবে তোমার।”

আমি বললাম, "আমি শুনে কী করব তুমি কী কী করেছিলে? দুদিন পরে আমাকে ডিভোর্স দেবে, তুমি তোমার মতো যার সঙ্গে খুশি থাকবে, আমি আমার মতো যার সঙ্গে খুশি থাকব। এর বাইরে আমার কিছু জানার প্রয়োজন নেই।"

বউ বলল, "বললে বুঝি ফোনটার মতো আমাকেও দেওয়ালে ছুড়ে মারবে? হেবি রাগ তোমার কিন্তু। আচ্ছা, এত রাগ কী করে হয়? কোনও স্পেশাল প্র্যাকটিস করতে হয়? আমার জানো তো, সেভাবে রাগ হয় না। কেউ কিছু বললে আমি শুনতে ভালোবাসি। অনিরুদ্ধ যেদিন বিয়ে করল, সেদিন একটু রাগ হয়েছিল বটে কিন্তু আমি ওকে বুঝতে দিইনি। আসলে তো ও আমাকেই ভালোবাসে, কেন খামোখা রাগ করব বলো?"

আমি বললাম, "তুমি আবার আমাকে ফালতু কথাগুলো বলে যাচ্ছ। তোমাকে আমি বলেছি এসব বাজে উটকো প্যাচাল আমার শোনার কোনও ইচ্ছা নেই। তুমি তোমার মতো করে একটা জীবন ভেবে নিয়েছ, তাতে আমার কোনও জায়গা নেই সেটা তুমিও জানো, আমিও জানি। আমাকে কেন তুমি এসব শোনাতে যাচ্ছ? তোমার পাঁঠা, তুমি যেদিক দিয়ে খুশি কাটবে।"

বউ বলল, "তা তো কাটবই। আমি স্বাধীনচেতা মেয়ে। আমার যেটা ইচ্ছা আমি সেটা করব।"

আমি বললাম, "সেটা কোরো। তবে কী জানো তো, অনেকে স্বাধীনচেতা হতে গিয়ে ভালো মন্দের তফাতটা ভুলে যায়। কোনটা ঠিক, কোনটা বেঠিক, সেটার পার্থক্য করতেও ভুলে যায়। সমস্যা শুরু হবার আগে তারা বুঝতেও পারে না, আসলে সে এতদিন ধরে একটা সমস্যাকেই ডেকে আনছিল।"

বউ নেলপালিশটা মেঝেতে রেখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি প্রচুর জানো, না? খুব জ্ঞানী মনে করো নিজেকে?"

আমি চুপ করলাম। জানলা দিয়ে বৃষ্টির ছাঁট আসছে। তবু জানলাটা বন্ধ করতে ইচ্ছা করল না।

বউ বলল, "দুটো মানুষের মধ্যে সম্পর্ককে ওভাবে বোঝানো যায় না। অনিরুদ্ধ আর আমার ওয়েভলেন্থ ম্যাচ করে। আমাদের চিন্তা ভাবনা সব মিলে যায়। আমরা কথা বলতে পছন্দ করি। তুমি এগুলো বুঝবে না। কটা প্রেম করেছ তুমি? কিছুই তো করোনি। কী করে বুঝবে? সব সময় ভেবে নাও ওয়ান ইজ টু ওয়ান প্রেমই হয়। ভুল ভাবো। প্রেম হতেই পারে দুজনের মধ্যে। তাতে তৃতীয় ব্যক্তি এলেও কোনও ক্ষতি নেই।"

আমি উঠে বসলাম। বললাম, "ঠিক আছে। বেশ করেছ যা করেছ। তুমি আমাকে একটা কথা বলো শুধু, অনিরুদ্ধর বউ পুরো ব্যাপারটা জানে তোমাদের?"

বউ একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে চুপ করে বলল, “না।”

আমি বললাম, “তাহলে?”

বউ বলল, “এভরিথিং ইজ ফেয়ার ইন লাভ...”

বউ কথা শেষ করতে পারল না, আমি বললাম, “নিজেকে ওর বউয়ের জায়গায় বসিয়ে দ্যাখো তো! কেমন লাগছে?”

বউ একটু চুপ করে বলল, “ঠিক লাগছে। আমার বর আমার প্রতি সব কর্তব্য করে তো!”

আমি বললাম, “তবু লুকিয়ে অন্য মেয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। কেন তোমাকে বলে না?”

বউ রেগে গেল, “বেশ করেছে বলে না। তোমার কী তাতে?”

আমি হেসে বললাম, “আমার কিছু না। আমাকে মুক্তি দিয়ো তাড়াতাড়ি। তারপর যা ইচ্ছে করো আমার কিছু যায় আসে না।”

বউ বলল, "দেব তো! শহরে ফিরেই দেব। আমার যেন খেয়েদেয়ে কাজ নেই ওনার সঙ্গে সংসার করতে হবে!"

আমি বললাম, "খেয়েদেয়ে কাজ আমারও নেই। নইলে কি আর তোমার মতো একটা মেয়ে জোটে?"

বউ বসা অবস্থা থেকে লাফিয়ে উঠে বলল, "কী, কী বললে? আমার মতো? কেন, আমি কী করেছি?"

আমি বললাম, "কী করেছ আয়নার সামনে মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে নিজেকেই জিজ্ঞেস করো। আমি কেন তোমাকে সিদ্ধান্ত বলতে যাব? নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করো, নিজেই নিজেকে উত্তর দাও। সহজ ব্যাপার তো!"

বউয়ের মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

আমার আবার ওর চোখে চোখ পড়ে গেল। কাজলটা কেমন টেনে পরেছে!

চোখ সরাতে পারলাম না। হৃৎস্পন্দন বেড়ে চলল।

এই হৃদযন্ত্রটার কি কোনও কাজ নেই? যেখানে বেশি পারফরমেন্সের দরকার নেই, সেখানেও আমাকে জ্বালাতন করতেই হবে?

২৭ অমৃত

মানুষ এমন একটা প্রাণী যার জীবন সরলরেখায় চলে না। অবশ্য বেশিরভাগ প্রাণীরই তাই। যে ইঁদুরটা সকালে গর্ত থেকে বেরোয়, রাতে সে নিজেও জানে না গর্তে ফিরবে কি না।

জীবন জিনিসটাই আসলে অনিশ্চিত।

আমার যেমন।

যে আত্রেয়ীর সঙ্গে সব কিছু এত মসৃণ চলছিল, যাকে কিনা আমি এত ভালোবাসছিলাম, তার সঙ্গে হঠাৎ করে পশুর মতো আচরণ করতে গেলাম কেন? তাও এমন একটা সামান্য বিষয় নিয়ে, যার কোনও মাথামুন্ডু নেই।

ঘটনাটা শুরুও হয়েছিল হঠাৎ করেই। প্রবল ভালোবাসাবাসির পর আত্রেয়ীকে ওদের বাড়ির গলিতে নামিয়ে দিয়ে আমি যখন বাড়ি ফিরলাম তখন রাত আটটা।

বাবা বাইরের ঘরে টিভি দেখছে। বউদি রান্না বসিয়েছে। দাদা ব্যায়াম করছে।

বাথরুম থেকে ফ্রেশ হয়ে ফিরে আমি মোবাইলে ফোন করতে গেলাম আত্রেয়ীকে। ফোন রিং হয়ে কেটে গেল।

কী মনে হতে আমি ওর ফেসবুক প্রোফাইল খুললাম মোবাইল থেকে। দেখলাম সকালে একটা প্রোফাইল পিকচার দিয়েছিল। তাতে একটা ছেলে ভীষণ ফ্লার্ট করেছে। অবাক করার মতো ব্যাপার, আত্রেয়ী সে কথার উত্তরও দিয়েছে। কী মনে হতে ছেলেটার প্রোফাইল খুললাম। মাঝে মাঝেই ডুয়াল মিনিং স্ট্যাটাস আছে। আর তার প্রত্যেকটাতেই আত্রেয়ী কমেন্ট করেছে। ছেলেটা সে কমেন্টের রিপ্লাই করেছে ফ্লার্ট করে। ওকে মিন করেই যে কথাগুলো লেখা সেগুলো বুঝতে পেরেও আত্রেয়ী প্রতিটা কথার উত্তর দিয়ে গেছে।

মাথায় কোত্থেকে একটা অসহ্য রাগ এসে চেপে বসল।

বউদি চা এনে দিয়ে বসে বলল, “কই গো, তাহলে যাবে তো ওদের বাড়িতে?”

আমি অন্যমনস্ক হয়ে বলল, “হুঁ।”

বউদি বলল, “কী হুঁ? যাবে না?”

আমি বললাম, "যাব।"

বউদি কয়েক সেকেন্ড আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "কী হয়েছে ঠাকুরপো? মেজাজ খারাপ?"

আমি এড়ানোর চেষ্টা করলাম, "না, এই অফিসে একটু চাপ যাচ্ছে আর কি! আমি একটু পরে কথা বলি বউদি?"

বউদি চুপ করে আরও কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমার এই মুখটা অফিসের কাজের ব্যাপারে কিছু না। যাই হোক, আমাকে বলতে চাইলে বলতে পারতে। আমি এলাম।"

বউদি উঠে বেরোল।

আমি গুম হয়ে বসে রইলাম। তারপর মোবাইলটা বের করে প্রতিটা কমেন্টের স্ক্রিনশট নিয়ে আত্রেয়ীকে হোয়াটসঅ্যাপ করলাম।

ফোন করলাম আবার।

ফোন রিং হয়ে গেল।

বিরক্ত হয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি শুরু করলাম।

মিনিট কুড়ি পরে আত্রেয়ী ফোন করল আমায়। আমি তৈরি হয়েই ছিলাম, ধরলাম, “হ্যালো।”

“হ্যাঁ বলো। স্নান করছিলাম। কী হয়েছে?”

আমি বললাম, “হোয়াটসঅ্যাপ চেক করো। তারপর ফোন করো।”

আত্রেয়ী হেসে বলল, “আরে বলো না।”

আমি থমথমে গলায় বললাম, “না, আগে চেক করো। তারপর ফোন করো।”

ফোনটা কেটে দিলাম।

কয়েক মিনিট পরে আত্রেয়ী আমাকে ফোন করে বলল, “দেখলাম।”

আমি বললাম, “কে ছেলেটা?”

আত্রেয়ী বলল, "বন্ধু।"

আমি বললাম, "কেমন বন্ধু?"

আত্রেয়ী বলল, "এমনি, স্পেশাল কিছু না। ফেসবুকেই এক বান্ধবীর মাধ্যমে আলাপ। ওর কথাগুলোই এরকম।"

আমি বললাম, "এরকম মানে? শুয়োরটার এত সাহস হয় কী করে এভাবে কথা বলার?"

আত্রেয়ী একটু থমকে বলল, "আচ্ছা, আমি বলে দেব এরকমভাবে কথা না বলতে।"

আমি বললাম, "তুমিই বা রাস্তার মেয়ের মতো ওর কথার উত্তর দিচ্ছিলে কেন ওভাবে? কে হয় তোমার ও?"

আত্রেয়ী এবার রাগল, "এসব কী বলছ তুমি? রাস্তার মেয়ে মানে?"

আমার সুর চড়ল, "রাস্তার মেয়ে ছাড়া কী? ওই জানোয়ারটার এত সাহস হবে কীভাবে তোমাকে এভাবে কথা বলবে? আমার সামনে থাকলে তো ওকে আমি খুন করে পুঁতে দিতাম জাস্ট।"

আত্রেয়ী হেসে ফেলল, "আচ্ছা তাই দিয়ো।"

আমার রাগ কমল না, বরং বাড়ল, "শোনো।"

আত্রেয়ী বলল, "বলো।"

আমি বললাম, "ওকে ব্লক করো। এখনই।"

আত্রেয়ী অবাক গলায় বলল, "মানে?"

আমি বললাম, "যা বলছি তাই করো। এখনই শুয়োরটাকে ব্লক করো।"

আত্রেয়ী কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বলল, "না করলে?"

আমি বললাম, "না করলে সম্পর্কটা এখানেই শেষ করো।"

আত্রেয়ী আবার চুপ করে থেকে বলল, "একটা বাইরের ছেলের জন্য এত বড়ো সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলে?"

আমি রাগি গলায় বললাম, "নিলাম। তুমি ওকে ব্লক করবে না করবে না?"

আত্রেয়ী বলল, "তুমি আমাকে বিশ্বাস করো না?"

আমি বললাম, "বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন আসছে না তো এখানে। যে তোমার সঙ্গে এভাবে ওপেন ফ্লার্ট করে, সে তোমার ফ্রেন্ড লিস্টে থাকবে না, ব্যস।"

আত্রেয়ী বলল, "তুমি বুঝতে পারছ তুমি এবার অকারণ জোর খাটাচ্ছ?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ বুঝতে পারছি। দশ মিনিট সময় দিলাম। হয় ছেলেটা থাকবে, নয় আমি থাকব।"

ফোনটা কেটে দিলাম। আমার হার্টবিট বেড়ে যাচ্ছিল।

কয়েক মিনিট পরে ফেসবুক খুলে দেখলাম আত্রেয়ী অ্যাকাউন্ট ডিঅ্যাক্টিভেট করে দিয়েছে।

২৮ জীমূতবাহন

আমার এক বন্ধু ছিল পিন্টু। পিন্টু চিরকাল চেষ্টা করে গেল একটা ভালো মেয়ে তোলার। পিন্টু আমার থেকে দু বছরের বড়ো।

আমি যখন নাইনে পড়ি, পিন্টু দেখি একটা লেডিস সাইকেল কিনল।

আমি অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে বলেছিলাম, "ছেলে হয়ে লেডিস সাইকেল কিনলি কেন?"

পিন্টু ভারী চালিয়াতের মতো বলেছিল, "যে মেয়েটা আমাকে পছন্দ করবে, তাকে আমি এই সাইকেলটা চালাতে দেব।"

ক্লাস টুয়েলভ নাগাদ পিন্টু আমাদের সবাইকে চমকে দিয়ে দারুণ সুন্দরী একজন প্রেমিকা জোগাড় করল। সত্যিই সে মেয়েটা সাইকেলটা চালাত।

পিন্টু জীবন লাগিয়ে দিয়েছিল প্রেমের পিছনে। এইচ এস কোনও মতে টপকে পাস কোর্সে বিএ করল।

পিন্টু যখন সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে, মেয়েটা তখন এইচ এস। মেয়েটার বাপ সম্বন্ধ নিয়ে এল।

পিন্টুকে কিছু না জানিয়েই মেয়েটা বিয়েতে রাজি হয়ে গেল।

পিন্টু আমাদের কাছে এসে খুব কাঁদল। তারপর ওর মা ওর বউয়ের জন্য যা যা গয়না রেখেছিল, আলমারির চাবি জোগাড় করে সব গয়না একটা প্যাকেটে জড়ো করে মেয়েটাকে বিয়েতে দিয়ে একটা লরির তলায় বডি দিয়ে দিল।

পিন্টুর মা এখনও কাঁদেন, কেন গয়নাগুলো লকারে না রেখে আলমারিতে রেখেছিলেন। আমরা বুঝি না, দুঃখটা ছেলের জন্য বেশি, না গয়নার জন্য।

তবে মরাল অফ দ্য স্টোরি হল, এই ঘটনার পর আমাদের পাড়ার ছেলেদের মধ্যে প্রেমের প্রতি একটা ভাটা এসে গেল। সবথেকে বেশি বোধহয় আমার উপরেই এসেছিল। এই কারণটার জন্যই কোথাও গেলে মেয়ে-টেয়ে দেখতাম না বেশি। গুটিয়ে যেতাম।

এভাবে বিয়ে হয়ে হানিমুনে এসে বউয়ের মুখে এসব কথা আমার প্রেম জিনিসটা থেকেই অনেকটা ভক্তি তুলে দিয়েছিল।

রাতে সুন্দর রান্না হয়েছিল। পেট ভরে খাওয়া হয়ে গেছিল। বাইরে বৃষ্টি কমেনি। বৃষ্টির শব্দে একটা চমৎকার ঘুম হয়। এসব ঘুমকে ক্ল্যাসিকাল মিউজিকের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। যেন কোনও ওস্তাদের আলাপ।

বউ হোম স্টের মহিলার ঘরে গিয়ে বকবক করছিল। আমি ওর জন্য অপেক্ষা করলাম না। কম্বলে সেঁধিয়ে চোখ বন্ধ করতেই ঘুম চলে এল। আকাশ পাতাল কাঁপানো ঘুম। পাহাড়ে যে এত ভালো ঘুম আসে জানতাম না। মনে হয় নাকও ডাকতে শুরু করেছিলাম।

ঘুমটা ভাঙল মাঝরাত নাগাদ। মনে হচ্ছিল কোনও আর্তনাদ শুনছি। ঘুম ভাঙলেও চোখ খুললাম না। তবে বুঝলাম বউ কাতরাচ্ছে, বলছে, “পাবলোদা, শোন না, আমায় ছেড়ে যাস না প্লিজ। শোন না পাবলোদা, আমায় সবাই খারাপ মেয়ে বলবে। তুই পারবি আমায় ছেড়ে থাকতে? আমায় বাঁচা পাবলোদা, শোন না, প্লিজ যাস না, এই পাবলোদা।” চোখ খুললাম। আলো জ্বাললাম।

বউ ছটফট করছে। আমি ডাকলাম, “এই, এই।”

শুনল না।

নিরুপায় হয়ে ওর হাত ধরে নাড়া দিলাম। বউ ধড়মড় করে উঠে বসল।

আমি ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, “কী হল?”

বউ অবাক গলায় বলল, “কী হল? কী হয়েছে?”

আমি বললাম, "পাবলোদা কে? সেই দাদা?"

বউয়ের ঠোঁট দিয়ে কেমন লালা টাইপের পড়ছিল। ও হাতের চেটো দিয়ে সে লালাটা মুছে বলল, "হ্যাঁ। সেই দাদা। মাঝে মাঝে এই দুঃস্বপ্ন দেখি। সব ফিরে আসে।"

আমি বললাম, "ঘুমাও। একবার ঘুম ভেঙে গেছে তো। আর সেসব আসবে না।"

বউ ক্লান্ত ভঙ্গিতে শুল।

আমি বললাম, "আলো জ্বালানো থাকবে?"

বউ বলল, "থাকুক।"

আমি বললাম, "এসব দুঃস্বপ্ন দ্যাখো যে, কোনও মনোবিদকে দেখিয়েছ কোনও দিন?"

বউ বলল, "না।"

কেমন কুঁকড়ে শুল। আমি বললাম, "কী হল?"

বউ বলল, “ঠান্ডা লাগছে।”

আমি বিয়ের প্রথম রাতের দোর্দণ্ডপ্রতাপ মেয়েটার সঙ্গে এই মেয়েটাকে মেলাতে পারছিলাম না। বললাম, “আর-একটা কম্বল দেব?”

বউ বলল, “দাও।”

আমি আর-একটা কম্বল ওর গায়ে জড়িয়ে দিলাম। বউ বলল, “তুমি ঘুমাও। আমার মনে হয় আর ঘুম আসবে না।”

আমি বললাম, “ঠিক আছে। জেগে আছি আমি। তুমি শোও।”

ওইরকম কুঁকড়ে শুয়ে বড়ো বড়ো চোখ করে দেওয়ালের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে ধীরে ধীরে চোখ বন্ধ করল। কিছুক্ষণ পরে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুমের ঘোরে মাঝে মাঝেই শিউরে উঠছিল।

আমি চুপ করে বসে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

সারারাত।

২৯ অমৃত

ঝড় আসার আগে কিছুই বোঝা যায় না কখন ঝড় আসে, কীভাবে আসে। কিন্তু যখন আসে, তখন সব কিছু ওলটপালট করে দিয়ে চলে যায়।

কারও সঙ্গে অনেকটা মেলামেশা, প্রচুর ভালোবাসার পরেও সে মানুষটাকে চেনা অত সহজ না।

আত্রেয়ীর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা যে হঠাৎ করে এরকম একটা জায়গায় চলে আসতে পারে, আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। অথচ সবই তো ঠিক ছিল। ওদের বাড়ি গেলাম, ক্যাবলামি করে চলে এলাম। আমার বাড়ির লোকজনও জেনে গেল, তারপরে হঠাৎ করে এভাবে আমাকে সব জায়গা থেকে ও ব্লক করে দেবে? কী এমন ভুল কথা বলেছিলাম আমি?

আমার রাগটা ঝড়ের মতো আসে, ঝড়ের মতো যায়। যখন ছিল, আমি আত্রেয়ীকে একবারও ফোন করার চেষ্টা করিনি। নিজে বসে বসে গোঁ গোঁ করেছি।

একটু রাতের দিকে যখন রাগ কমল, আত্রেয়ীকে ফোন করলাম। ফোন সুইচড অফ। আমি ওকে একটা মেইল করে লিখলাম, "একটা ফালতু ছেলের জন্য তুমি আমার উপর রাগ করছ?"

মেইল করে পায়চারি করছি। রাত আড়াইটা বাজে প্রায়।

কোনও উত্তর না আসায় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভাঙতে দেখলাম আত্রেয়ী মেইলের রিপ্লাই করেছে।

"তোমাকে আমি পর ভাবিনি। পর ভাবিনি বলেই হয়তো আমি তোমাকে এভাবে গ্রহণ করেছিলাম, যেভাবে আর কাউকেও কোনও দিন গ্রহণ করার কথা স্বপ্নেও ভাবিনি। সোশ্যাল মিডিয়া আর মানুষের জীবনে তো আকাশ পাতাল পার্থক্য থাকে অমৃত। আমার উপর কোনও ছেলের দুর্বলতা থাকতেই পারে, কথা হল, আমার কি আছে? আর মজা করতে পারব না? এরপর কি নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্যও তোমার অনুমতি নিতে হবে বলো তো? মেয়ে মাত্রই ক্রীতদাসী ভাবলে কেন তুমি আমাকে? কেন ভেবে নিলে সার্কাসের বাঘের মতো বেত দেখানো মাত্রই তুমি যেভাবে বলবে সেভাবে আমাকে হাঁটাচলা করতে হবে? কেন আমাকে একটা আলাদা মানুষ ভাবতে পারবে না? আমার একটা পৃথক সত্তা থাকতে পারবে না? কাউকে ভালোবাসলে তাকে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করতে নেই? পজেসিভনেস আর সন্দেহের মধ্যে মনে হয় কিছু হলেও তফাত থাকে। সেটা বোঝার মতো বুদ্ধি আশা করি তোমার আছে। তুমি ভেবে দেখো, আমি কিন্তু এরকমই। এগোতে চাইলে ভেবে এগিয়ো। আমাকে নিয়ন্ত্রণ করার কথা যদি ভেবে থাকো, তাহলে এখানেই থেমে যেয়ো। তোমার আদরগুলো আমার মনে থাকবে। কিন্তু আমার নিজের স্বাধীনতা যদি কোথাও গিয়ে আটকায়, তাহলে সে সব কিছুকেই স্মৃতিতে রূপান্তরিত করতে আমি

দ্বিতীয়বারও ভাবব না। আমার বাবা আমাকে একজন ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেলফ ডিপেন্ডেন্ট মেয়ে ভাবার শিক্ষা দিয়ে গেছেন। আমি সেভাবেই চলব। ভালো থেকো। আত্রেয়ী।”

মেইলটা বেশ কয়েকবার পড়লাম। কী করব, বুঝতে পারলাম না।

ফেসবুকের পোস্টটার স্ক্রিনশট নিয়ে রেখেছিলাম। ছেলেটার কমেন্টে আত্রেয়ীর উত্তরগুলো দেখছিলাম। একে স্বাধীনতা বলতে হবে? বেশ কিছুক্ষণ সেগুলোর দিকে তাকিয়ে ফোনটা অফ করে ঘুমিয়ে পড়লাম।

বউদি ঘুম ভাঙাল সকাল নটা নাগাদ। দরজা ধাক্কাচ্ছিল।

ঘুমচোখে উঠে দরজা খুললাম। বউদি বলল, “এই তুমি অফিস যাবে না?”

আমি বললাম, “হ্যাঁ। যাচ্ছি, রেডি হচ্ছি।”

বউদি বলল, “কী ব্যাপার? তোমার মুখ চোখ বসে আছে কেন? কী হয়েছে?”

আমি গামছা নিয়ে বাথরুমে যেতে যেতে বললাম, “কিছু হয়নি। চিন্তা কোরো না।”

স্নান সেরে জামাকাপড় পরে খাবার টেবিলে গিয়ে দেখলাম বাবা বসে আছে।

আমাকে দেখে বলল, "কী রে, ওদের বাড়িতে কী পরে যাবি কিছু ঠিক করলি?"

আমি গম্ভীর গলায় বললাম, "একটু প্ল্যান চেঞ্জ হয়েছে বাবা। এই মুহূর্তে দেখা করাটা পিছোবে কদিন।"

বাবা অবাক গলায় বলল, "মানে?"

আমি বললাম, "মানে কিছু না। ওরা থাকবে না। কে একজন মারা যাবে, দিল্লি যাবে বলছিল।"

মিথ্যা করেই বললাম কথাটা।

বাবা বলল, "কী আশ্চর্য! আগে বলবি তো! দে ফোনটা দে, ওর বাবাকে ফোন করি।"

আমি বললাম, "ধুস, ওরা এখন খুব ব্যস্ত। তুমি এসব নিয়ে চিন্তা কোরো না।"

বাবা আমার চোখের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বলল, "কী হয়েছে? ঝামেলা?"

আমি ভাতে ডাল মেখে ব্যস্ত হয়ে খাওয়া শুরু করে বললাম, "কী যে বলো!"

বাবা চুপ করে বসে থেকে বলল, “ঠিক আছে। তবে আমি তোকে যতদূর চিনি, তুই তুমুল ঝগড়া চালাচ্ছিস এখন। ভুল বললাম?”

আমি বাবার দিকে তাকিয়ে বললাম, “না। তুমি সবই ঠিক বলো। আমাকে খেতে দাও প্লিজ।”

বাবা আর কিছু বলল না। চুপ করে খেতে লাগল।

৩০ জীমূতবাহন

হোম স্টে ছেড়ে আমরা রওনা দিলাম যখন তখন সকাল সাড়ে দশটা বাজে। ড্রাইভার জিজ্ঞেস করেছিল কোন দিকে যাব।

বউ বলে দিল রাবংলার দিকে কোনও হোম স্টেতে নিয়ে যেতে।

ড্রাইভার আর কোনও প্রশ্ন করল না। গাড়ি স্টার্ট দিল।

আগের দিন যে এত বৃষ্টি হয়েছে এখন কিছুই বোঝা সম্ভব না। একদম ঝকঝকে আকাশ। হালকা মেঘ থাকলেও তার থেকে বৃষ্টি হবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

অবশ্য পাহাড়ের আবহাওয়া বোঝা সম্ভব নয় কারও পক্ষে। আবার কখন মেঘ জড়ো হয়ে বৃষ্টি নামবে কেউ জানে না।

বউ জানলার বাইরে মুখ করে বসে ছিল। বলল, "আমার কোনও জায়গা ছেড়ে আসতে মায়া লাগে। এই যে এই হোম স্টেতে ছিলাম, দু রাত। তাতেও মন খারাপ হয়ে গেল।"

আমি বললাম, "ভালো তো। মায়া থাকা ভালো। আমায় মায়া না করে ডিভোর্সটা দিয়ে দিয়ো, তাহলেই হবে।"

বউ বলল, "দেব। চিন্তা করছ কেন? তোমার কপালে আমার মতো বউ জোটা ডিজাস্টার। ভাবাই যায় না। তোমার জন্য কেমন মেয়ে চাই বলো তো?"

আমি বললাম, "কী রকম?"

বউ বলল, "একদম চার ফুট দশ ইঞ্চি হাইট। টুকটুকে ফরসা। মাথা ভর্তি ঘোমটা থাকবে। চোখ সব সময় পায়ের দিকে থাকবে। সম্মান ছাড়া কথাই বলবে না। বাংলা সিরিয়ালের আদর্শ গৃহবধূ টাইপ আর কি।"

আমি বললাম, "আমার বিয়ে করার কোনও ইচ্ছা নেই আর।"

বউ বলল, "তাই নাকি? ওরম মনে হয়। ডিভোর্স পেলেই তুমি ড্যাং ড্যাং করে বিয়ে করতে ছুটবে।"

আমি বললাম, "কেন? এ কথা তোমার মনে হল কেন?"

বউ বলল, "কারণ সব মানুষই বিয়ে করতে চায়। একটা সম্পর্কে জড়াতে চায়। একা থাকতে চাওয়া মানুষেরাও শেষমেশ বিয়ে করেই ফেলে। ব্যতিক্রমী মানুষ যে নেই তা নয়, কিন্তু তার পারসেন্টেজ কম। আর তুমি তো পিওর ম্যারেজ মেটিরিয়াল টাইপ। ভালো হাজব্যান্ড হবে তুমি।"

আমি বললাম, "ও। জেনে খুশি হলাম।"

বউ বলল, "আমি নর্থ পোল হলে তুমি মঙ্গল গ্রহের সাউথ পোল। তোমার সঙ্গে আমার কোনও মিলই নেই।"

আমি বললাম, "তা ঠিক। তুমি মডার্ন মানুষ। বিবাহিত পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক রাখাকে তোমার খারাপ বলে মনে হয় না। ভালো কিন্তু।"

বউ বলল, "খারাপ কেন? মানে সব সম্পর্কই যে সমাজের ডিফাইন করা পথ মেনে হতে হবে এটা কোথায় লেখা আছে? কিছু কিছু সম্পর্ক তো সিলেবাসের বাইরেও হতে পারে।"

আমি বললাম, "একশো বার হতে পারে। আমার তা নিয়ে কোনও বক্তব্য নেই। কিন্তু সেই সম্পর্ককে লালন পালন করতে গিয়ে যখন অন্য মানুষের জীবনে প্রভাব পড়ে, তখন সমস্যা দেখা দিতে পারে। তোমার প্রেমিকের বউ কোনও দোষ করেনি। আমিও কোনও দোষ করিনি। আমাদের দুজনের জীবন জড়ানোর কি কোনও প্রয়োজন ছিল? মেয়েটি জানলে মারাত্মক কষ্ট পাবে।"

বউ জানলার বাইরে থেকে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি কি আমার গিলটি ফিলিংস জাগানোর কোনও চেষ্টা করছ?"

আমি বললাম, "তা কেন? কথাই আছে পরের ছেলে পরমানন্দ, যত গোল্লায় যাবে তত আনন্দ। তুমি গোল্লায় যাও না, আমার কী দরকার তোমার মধ্যে গিলটি ফিলিংস জাগিয়ে? সমস্যা হল, আমি যে বিয়ে করেছি আমার বাড়ির লোক থেকে শুরু করে পাড়ার লোক সবাই জানে। ডিভোর্সের পরে বিভিন্ন জায়গায় কথা হবে। সেটা আমার ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা না করলেও আমার বাবা মার সমস্যা হতেই পারে, তাই না?"

বউ বলল, "তাহলে ডিভোর্স কোরো না। নিজের মতো করে একটা মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক করে ফেলো। মিটে গেল।"

আমি হেসে ফেললাম, "সব কিছু খুব সোজা ভাবো তুমি, তাই না? পৃথিবীটা এতই সোজা?"

বউ বলল, "আমরাই তো কঠিন করে ফেলি। ভেবে নিতে চাইলে বানিয়েও নিতে পারবে। কী হয়? তুমি থাকবে তোমার মতো, আমি আমার মতো। রাতে এক ঘরে থাকব। সম্পর্ক দুজনের আলাদা হবে। সবাই জানবে আমরা হ্যাপিলি ম্যারেড কাপল। সিম্পল।"

আমি বললাম, "সিম্পলের দরকার নেই। তুমি আমাকে ডিভোর্স দিয়ে দিয়ো।"

বউ জানলার দিকে মুখ ফেরাল, "তাহলে এত প্যাচাল পাড়ছিলে কেন?"

আমি বললাম, "তুমি ঝগড়া করতে চাইছ নাকি? ঝগড়া কোরো না দয়া করে। ঘুরতে এসেছ, ঘোরো। কিন্তু তোমার বানিয়ে দেওয়া ফরমুলা অনুযায়ী আমি চলব, এটা ভুলেও ভেবো না।"

বউ আর কিছু বলল না। চোখ বন্ধ করল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ঘুমিয়েও পড়ল।

আমি এবার সত্যি অবাক হলাম। এত তাড়াতাড়ি কেউ ঘুমাতে পারে কী করে?

তিস্তার কাছে এসে পড়েছিলাম। এত সুন্দর প্রকৃতি সত্ত্বেও মনটা খিঁচড়ে গেল সকাল সকাল।

কিছু কিছু মানুষের জীবন তারা না চাইতেও এত জটিল হয়ে যায় কী করে?

৩১ কপালকুণ্ডলা

বাবা মা দুজনেই আমার ওপর বেজায় খচে আছে। সাঁপুইরাও বলে গেছে এরকম মেয়ের জীবনেও বিয়ে হবে না। আমি তাতে খুশি হয়েছি বটে কিন্তু রেগেও যে যাইনি এমন না।

বাইরের লোক এসে আমার সম্পর্কে জ্ঞান দেবে এত সাহস পাবে কেন? বাবা কেন তাদের কিছু বলবে না? কই আমাকে যদি কোনও বাইরের লোক আমার বাবা মার সম্পর্কে কিছু বলে আমি তো তাকে ছেড়ে কথা বলব না। কপালে দুঃখ হয়ে যাবে তার। পাগলের মতো দৌড় করাব।

অবশ্য সদুজ্যাঠার কথা আলাদা। তবে সদুজ্যাঠা তো আর বাইরের লোক না। রক্তের সম্পর্ক না থাকলেও কোনও কোনও সম্পর্ক রক্তের সম্পর্কের থেকেও বেশি কিছু হয়। সদুজ্যাঠার সঙ্গে আমার সেই সম্পর্ক।

আমার নবকুমারের সম্পর্কে তো কিছুই জানতে পারতাম না সদুজ্যাঠা না থাকলে।

সদুজ্যাঠাই একদিন বিকেলে নবকুমারের টেবিলের সামনে গিয়ে বসল। নবকুমার তখন শিঙাড়ায় কামড় দিয়েছে। সদুজ্যাঠা একটা স্যান্ডো আর নীল চেক কালারের লুঙ্গি পরা অবস্থায় ছিল। ভুঁড়িটা এত বড়ো যে স্যান্ডো সেটাকে পুরোপুরি ঢাকতে পারে না। চকচকে মোটা কালো ভুঁড়ি বেরিয়ে থাকে। সদু জ্যাঠাকে বসতে দেখে নবকুমার শিঙাড়াটা কামড়ানো অবস্থাতেই অবাক হয়ে বড়ো বড়ো চোখ করে সদুজ্যাঠার দিকে তাকাল।

মাইরি বলছি, সেই সময়টায় নবকুমারকে এত মিষ্টি লাগছিল না, যে, আমার মনে হচ্ছিল ব্যাটার দুই গালে চকাস চকাস করে চুমু খেয়ে নি।

সদুজ্যাঠা বলল, "আপনি এ পাড়ায় নতুন। দেখছি কদিন ধরেই। তা কেমন লাগছে?"

নবকুমার শিঙাড়াটা নামিয়ে রেখে বলল, "ভালো লাগছে। শান্ত পাড়া। ভালো তো।"

সদুজ্যাঠা বলল, "বাড়ি কোথায়?"

নবকুমার আমার দিকে একবার তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিল। আমি ক্যাশে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম।

সে বলল, “মুর্শিদাবাদে।”

সদুজ্যাঠা বলল, “বাহ, নবাবদের জায়গা। তা কী করা হয়?”

আমার হাসি পাচ্ছিল। সদুজ্যাঠা কীরকম সিবিআইয়ের মতো জেরা শুরু করেছে।

নবকুমার অবশ্য বেশ ভদ্রলোক। সদুজ্যাঠার প্রশ্ন শুনে জবাব দিল, “এই তো, এই লোকাল কলেজে ক্লার্কের কাজ পেয়েছি।”

সদুজ্যাঠা বলল, “বেশ। বাড়িতে কে কে আছে?”

নবকুমার বলল, “বাবা মা।”

সদুজ্যাঠা বলল, “ও। এক ছেলে? তা প্রেম করো?”

নবকুমার সদুজ্যাঠার কথায় ঘাবড়ে গিয়ে বিষম খেয়ে বলল, “না না, সে কী! ওসব করার সময় কোথায়?”

সদুজ্যাঠা আমার দিকে তাকিয়ে একবার হেসেই গম্ভীর হয়ে নবকুমারের দিকে তাকিয়ে বলল, “ভালো ভালো। রসমালাই খাবে? আমি বানিয়েছি আজ। স্পেশাল।”

নবকুমার আবার ক্যাবলা চোখে তাকাল।

সদুজ্যাঠা বলল, “খাও খাও। টাকা দিতে হবে না। আমি বানিয়েছি। এই কেতো, এখানে একটা ভাঁড় দিয়ে যা তো। খেয়ে দ্যাখো, এসব জিনিস সবাই পারে না।”

কার্ত্তিক একটা রসমালাইয়ের ভাঁড় দিয়ে গেল। নবকুমার ভালো মানুষের মতো সে ভাঁড়টা শেষ করে হেসে বলল, “খুব ভালো হয়েছে। সত্যিই আপনার রান্নার হাত ভীষণ ভালো।”

সদুজ্যাঠা বলল, “রান্নার হাত না। মিষ্টির হাত। রান্নার হাত ওর ভালো।”

সদুজ্যাঠা আঙুল তুলে আমার দিকে দেখাল।

নবকুমার আমার দিকে তাকিয়েই জোরে জোরে কাশতে শুরু করল।

সদুজ্যাঠা জলের গ্লাস নবকুমারের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "যা চিংড়ি মাছের মালাইকারি করবে না, ভাবতে পারবে না। অসাধারণ হাত। অবশ্য চিংড়ি মাছের মালাইকারি করলেই যে মোচার ঘণ্ট করতে পারবে না, এমন তো নয়। সেও আমাদের মেয়ে অসাধারণ রান্না করে। আর খাসির মাংসের তো তুলনাই হয় না। ওরে ও কপাল, কী যেন হাঁড়িতে করিস অল্প আঁচে একটু একটু করে, কী নাম যেন?"

আমার সদুজ্যাঠার ওপর এমন রাগ হল না! ঈশ, এভাবে কেউ বলে? যদি বুঝে ফেলে? আমি রাগি গলায় বললাম, "আমি জানি না। আর আমি রাঁধতেও পারি না। কেন অকারণ বাড়িয়ে বলো?"

নবকুমার কেমন ভয় পেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমি চলি, হ্যাঁ?"

বলে ক্যাশে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট এগিয়ে দিয়ে চেঞ্জ না নিয়েই দৌড় মারল। সদুজ্যাঠা হাসতে লাগল।

আমি রাগি গলায় বললাম, "এটা কী হল?"

সদুজ্যাঠা বলল, "তোর লাইন ক্লিয়ার করলাম। এবার তো তোকে নিয়ে ভাববে রে পাগলি।"

আমি বললাম, "তোমায় মিথ্যে করে বলতে কে বলেছিল? আমি ভালো রাঁধি?"

সদুজ্যাঠা বলল, "আমি শিখিয়ে দেব তো। রাঁধা তো আর্ট রে! যত শিখবি, যত মনের মানুষকে রেঁধে খাওয়াবি, দেখবি তত ভালো লাগছে।"

আমি কপট রাগ দেখিয়ে বললাম, "তুমি হেবি খারাপ। আমাকে চমকে দিলে।"

সদুজ্যাঠা দাঁত বের করে হাসতে লাগল।

৩২ অমৃত

সারারাত ঘুমাতে পারিনি।

ভোর হতেই বাইক নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

শহরটার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ থাকে। রাত হলে একরকম।

ভোর হলে আর-একরকম।

কর্পোরেশনের গাড়ি বেরিয়েছে। পুলিশ টহলদারি গাড়ি ক্লান্ত হয়ে ফিরছে। ফাঁকা বাসগুলো রাস্তায় বেরিয়েছে কমসংখ্যক যাত্রী নিয়ে। অবশ্য পেপারওয়ালারা ভীষণ ব্যস্ত। তারা হুড়মুড়িয়ে সাইকেল নিয়ে রওনা দিয়েছে।

আমার এত সব কিছু দেখার সময় ছিল না। আমি বাইক চালিয়েছি মনের সুখে। আত্রেয়ীদের বাড়ির সামনে গিয়ে যখন পৌঁছোলাম তখন সাড়ে পাঁচটা।

বাইরের গেট বন্ধ।

আমি পাঁচিল ডিঙিয়ে কলিং বেল বাজালাম।

বেশ খানিকক্ষণ পরে আত্রেয়ীর বাবা ঘুমচোখে দরজা খুলে আমাকে দেখে বললেন, “এত সকালে? কী ব্যাপার?”

আমি বললাম, “ইয়ে, কাকু, না জেঠু, মানে বুঝতে পারছি না কী বলব, আত্রেয়ী আছে?”

আত্রেয়ীর বাবা দরজা ছেড়ে দাঁড়িয়ে বললেন, “হ্যাঁ আছে তো। এসো ভিতরে এসে বসো। কী হয়েছে? এত সকালে?”

আমি মাথা চুলকে বললাম, “তুমুল ঝগড়া। মার মার কাট কাট যাকে বলে।”

আত্রেয়ীর বাবা ঘুমচোখেই হো হো করে হেসে ফেলে বললেন, “মার মার কাট কাট? আচ্ছা, দাঁড়াও। আমি চা বসাই। দুজনে একটু গল্প করি, তারপর নাহয় মুনাইকে ডেকে দিচ্ছি। তোমার মার মার কাট কাট ঝগড়াটা আমার ভালো লেগেছে। একটু বলবে নাকি আমাকে?”

আমি সোফার উপর বসে পড়ে বললাম, “কিছুই না, মানে আমার মাথাটা হঠাৎ করে গরম হয়ে যায় তো। শনি খুব নিচে।”

আত্রেয়ীর বাবা কৌতুকপূর্ণ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, “ওরে বাবা, এসব জ্যোতিষ চর্চাও করা হয় নাকি?”

আমি বললাম, “না না, শনি নিচে সেটা দেখা তো খুব সোজা। এই দেখুন না আমার কেনো আঙুলটার যেখান থেকে উৎপত্তি, তার পাশের আঙুলটার উৎপত্তিস্থল থেকে কত নিচুতে। আমার এক বন্ধু জ্যোতিষচর্চা করে। ওর থেকেই শিখেছিলাম। ও আমাকে বলেছিল আমার শনি খুব নিচে। কী সব রত্ন দিতে চেয়েছিল, আমিই নিইনি।”

আত্রেয়ীর বাবা বললেন, “ভালো করেছ নাওনি। মানুষের ভাগ্য মানুষের নিজের হাতেই থাকে। তোমার শনি তোমাকেই নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। রাগটাও। মুনাইয়েরও রাগ মারাত্মক। তোমারও। তা এত রাগ থাকা কি ভালো?”

আমি বললাম, "জানি তো ভালো না। চেষ্টা করি সামলাতে।"

আত্রেয়ীর বাবা বললেন, "মানুষের সবথেকে খারাপ রিপু রাগ। বাকিগুলোও বেকায়দায় ফেলে বটে, কিন্তু রাগ এমন একটা বস্তু যা সুস্থ, স্বাভাবিক মানুষকে অমানুষ করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। চেষ্টা কোরো এ রিপু দমন করতে। আমি মুনাইকে ডাকছি, অপেক্ষা করো।"

ভদ্রলোক উঠে ভিতরের ঘরে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে আত্রেয়ী এল। আমাকে দেখে কঠিন গলায় বলল, "তুমি এত ভোরে?"

আমি উঠে আত্রেয়ীর হাত ধরে বললাম, "আমায় ক্ষমা করো প্লিজ। বিরাট ভুল হয়ে গেছে। তুমি যার খুশি প্রোফাইলে লাভ রিয়্যাক্ট দাও, যে তোমার প্রোফাইলে যা খুশি কমেন্ট করুক, আমি তোমাকে কিছু বলব না। প্লিজ। ক্ষমা করে দাও।"

আত্রেয়ী সরে গিয়ে বলল, "বাবা আছে, কী করছ? আমি ছেলেটাকে ব্লক করে দেব। খুশি?"

আমি বললাম, “করতে হবে না। আমারই ভুল। আমি সারারাত ধরে ভেবেছি। জ্যোতি বসুর পরে আমার এই রাগটাই দ্বিতীয় ঐতিহাসিক ভুল। মাইরি বলছি, আর হবে না।”

আত্রেয়ী হেসে ফেলে বলল, “ঠিক আছে। অসভ্য ছেলে। তোমার জন্য সারারাত ঘুম হল না আমার।”

আমি বললাম, “আমারও তো হয়নি। চলো তোমার ঘরে গিয়ে ঘুমাই।”

আত্রেয়ী চোখ বড়ো করে বলল, “কী শুরু করেছ? বাবা আছে দেখোনি?”

আমি জিভ কেটে বললাম, “ঠিক ঠিক। আসলে আবেগ কন্ট্রোল করতে পারছি না আর কী।”

আত্রেয়ী বলল, “সোফায় বসো। আমি চা করছি।”

আত্রেয়ীর বাবা এসে বললেন, “লুচি ভাজতে বলে দিস মা। ছেলেটা এত সকালে এসেছে, আমাদের বাড়ির স্পেশাল লুচি ছোলার ডাল খেয়ে যাক।”

আমি ক্যাবলার মতো হাসলাম।

৩৩ অনিরুদ্ধ

ঋতুজা কোনও মেসেজ করছে না চব্বিশ ঘণ্টা হয়ে গেল।

আমার মাথা কাজ করছে না। ঋতুজা মেসেজ না করলে আমার মাথা কাজ করে না।

মেসেজ করি রোজই। কিন্তু এবারে প্রথমে দেখলাম হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজগুলো সিন হচ্ছে না। আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতেই ফোনটা কেটে গেছিল। প্রতি রাতেই ও বলে, তোমার মাথায় বিলি কেটে দিচ্ছি, তুমি ঘুমিয়ে পড়ো। আমার মাথার ঘন চুল ওর নাকি ভীষণ পছন্দ। যেদিন ওর বাড়ি গেছিলাম, আমার মাথায় অনেকক্ষণ বিলি কেটে দিয়েছিল। এরপর থেকে রাতে ফোন করলে বলবে, তোমার মাথায় বিলি কেটে দিচ্ছি।

এবারে ফোন কেটে যাবার পর আর কিছুতেই কানেক্ট করতে পারছি না। পাহাড়ে গেছে, নেটওয়ার্ক ট্রাবল হতে পারে ভেবে প্রথমে চেষ্টা করিনি, পরে অধৈর্য হয়ে গেলাম। আমার সঙ্গে কথা না বলে এতক্ষণ থাকার মেয়ে তো ঋতুজা নয়।

ওর বাড়ির ল্যান্ডলাইন নাম্বার আমার কাছে ছিল। সকাল হতেই সেখানে ফোন করলাম। ওর বাবা ধরলেন। গম্ভীর গলায় বললেন, "হ্যালো।"

আমাকে চেনেন ওর বাবা। আমি বললাম, "কাকাবাবু, আমি অনিরুদ্ধ বলছি, ঋতুজা আছে?"

ওপাশ থেকে গম্ভীর গলায় জবাব এল, “না, ও দার্জিলিং গেছে তো। তা ছাড়া ও এখানে থাকেও না এখন।”

আমি বললাম, “জানি তো। আচ্ছা, ওর হাজব্যান্ডের নাম্বারটা দেওয়া যাবে, একটু আর্জেন্ট ছিল আর কি।”

ওর বাবা বললেন, “আমার কাছে নেই। বিকেলের দিকে ফোন কোরো। যদি পাওয়া যায়, আমি তোমায় দিয়ে দেব।”

আমি “আচ্ছা” বলে ফোন রাখলাম। হৃৎস্পন্দন বাড়ছিল।

ঠিক করে স্নান না করে অফিস গেলাম।

প্রতাপ দেখেই বলল, “কী রে ভাই, আজ এরকম ঝোড়ো কাকের মতো অবস্থা কেন?”

আমি মাথায় হাত দিয়ে বসে বললাম, “সমস্যা হয়ে গেছে। ঋতুজাকে পাচ্ছি না।”

প্রতাপ বলল, “সে তো বিয়ে করেছে। এখন না পেলেই বা কী করবি? বরের সঙ্গে ফুর্তি মারছে দেখ গে।”

আমি কড়া চোখে প্রতাপের দিকে তাকিয়ে বললাম, "ফালতু বকিস না। বরের সঙ্গে ফুর্তি মারবে কী, ওই বানচোদকে ও ছুঁতে পর্যন্ত দেবে না এটা আমি লিখে দিতে পারি।"

প্রতাপ বলল, "বেশ তো। তোর তো বউ আছে। ওর সঙ্গে থাক গিয়ে।"

আমি কয়েক সেকেন্ড প্রতাপের দিকে তাকিয়ে বললাম, "দে সে, প্রেমটা ড্রিবলিং, বিয়েটা গোল। বল জালে শেষ অবধি না জড়ালেও, কিছু ড্রিবলিং চিরকাল মনে থেকে যায়*।" (*লেখা ঋণ— বাউন্ডুলে)

প্রতাপ হেসে ফেলল, "ঋতুজার বর গোল দিয়ে দিল তো। এবার?"

আমি প্রতাপের দিকে স্থির চোখে তাকালাম। পেপারওয়েটটা হাতে ছিল। ইচ্ছা করছিল প্রবল জোরে প্রতাপের দিকে ছুড়ে মারি। অতি কষ্টে আটকে বললাম, "তোকে আমি একবার বলেছি, ও আমাকে ছাড়া কাউকে ছুঁতে দেবে না।"

প্রতাপ জলের গ্লাসটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "ওকে, কুল, কুল। মাথা ঠান্ডা কর প্লিজ। আমি কথা দিচ্ছি, এটা নিয়ে তোকে আমি রাগাব না। শোন, বল, আমাকে বল আমি কী করব।"

আমি বললাম, “ওকে কনভিন্স করা। সব কিছু ছেড়ে আমরা দুজন কোথাও পালিয়ে যাব। সম্ভব হলে স্টেটসে। কোথাও একটা হলেই হল। আমার বউ দরকার নেই, বউকে আমি ছেড়ে দিচ্ছি। ওকে কনভিন্স কর, ও বরকে ছেড়ে চলে আসুক।”

প্রতাপ মাথায় হাত দিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, “ভাই আমার জেল হবে। তুই খেপেছিস?”

আমি বললাম, “তুই না বললে তোকে খুনের দায়ে আমার জেল হবে এটা মনে রাখিস। আমার জন্য তোকে এটা করতে হবে।”

প্রতাপ বলল, “ওকে, কুল। মাথা ঠান্ডা কর। আমি বলব। কথা দিলাম। দে ওর নাম্বার দে।”

আমি বললাম, “তোকে তো বললাম, ওকে ফোনে পাচ্ছি না। বিকেলে ওর বরের নাম্বার পেতে পারি, ওকে ফোন করে নিস।”

প্রতাপ হতভম্ব গলায় বলল, “ওর বরকে ফোন করে আমি ওকে চেয়ে এসব বলব? তুই পাগল হয়ে গেছিস? কী সব বলছিস, এ কী রে?”

আমি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলাম, আমার ফোনটা বেজে উঠল। ভাবলাম ঋতুজা ফোন করছে, লাফিয়ে উঠে ধরতে গিয়ে দেখি অনিন্দিতা ফোন করছে।

আমি ব্যাজার মুখে প্রতাপের দিকে একবার তাকিয়ে ফোনটা রিসিভ করলাম, “হ্যালো।”

অনিন্দিতা বলল, “কী ব্যাপার বলো তো, কাল প্রায় রাত তিনটে অবধি হোয়াটসঅ্যাপে তোমাকে লাস্ট সিন দেখাচ্ছিল। কী করছিলে?”

আমি বললাম, “কিছু না। হবে কোনও সমস্যা। কেন, কী হয়েছে?”

অনিন্দিতা খুশি খুশি গলায় বলল, “একটা সারপ্রাইজ আছে।”

আমি বললাম, “কী?”

অনিন্দিতা বলল, “প্রেগনেন্সি কিট পজিটিভ ফিডব্যাক দিয়েছে।”

আমি হতভম্ব মুখে ফোনটা হাতে দাঁড়িয়ে রইলাম।

৩৪ জীমূতবাহন

পাহাড়ের সমস্যা হল কখন যে বৃষ্টি নামবে, আর কখন যে রোদ উঠবে কেউ বলতে পারে না।

হোম স্টেতে যেরকম ভালো আবহাওয়া পেয়ে বেরিয়েছিলাম, সিকিমে ঢোকার কিছুক্ষণের মধ্যে সেটা উবে গেল। পরিবর্তে শুরু হল আবার গতকালের মতো বৃষ্টি। গাড়িটা যাও বা চলছিল ধীরে সুস্থে, খানিকক্ষণ পরে দেখা গেল রাস্তায় আবার ধ্বস নেমে গেছে। গাড়ির লাইন লেগে গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই।

বউ ঘুমাচ্ছিল। উঠে পড়ে বলল, "বাহ, ধ্বস নেমেছে? সুন্দর।"

আমি রাগি গলায় বললাম, "সুন্দরের কী আছে? পাহাড়ে ধ্বস নামবে এটা সুন্দর? রাস্তা আটকে গেল, সেটা ভাল্লাগছে?"

বউ বলল, "তুমি রেগে যাচ্ছ কেন? পাহাড় মানেই তো আনসার্টেনিটি। এরকম তো হবারই ছিল। এত ভাবার কী আছে?"

আমি বললাম, "ভাবার আছে, কারণ আমার এত তাড়াতাড়ি মরে যাবার কোনও ইচ্ছা নেই। কোনও ভাবে যদি আমাদের গাড়ির ওপরেই ধ্বস নেমে যায়, তাহলে কী হবে?"

বউ বলল, "মরে যাবে! আবার কী হবে? বেঁচে থেকে কী এমন লাভ আছে?"

আমি বললাম, "সে জেনে তুমি কী করবে? তোমার মতো উদ্দেশ্যহীন লাইফ লিড করি না তো।"

বউ বলল, "তাই বুঝি? তা কী এমন উদ্দেশ্য আছে তোমার জীবনে? কী হবে তুমি? মুকেশ আম্বানি না শাহরুখ খান?"

আমার মাথায় রক্ত চড়ছিল। এরকম করে কেউ তর্ক করলে আমার খুব রাগ হয়ে যায়। আমি বললাম, "যাই হই, তোমাকে বলতে যাব কেন? তুমি যে চুলোয় যাও, বাঁচো, মরো, মাঝরাতে দুঃস্বপ্ন দেখে উঠে বসে থাকো, সেটা তোমার সমস্যা, তুমি বুঝবে। আমি আমার মতো করে থাকব। সেটাই ভালো।"

বউ বলল, "আচ্ছা। তাই হবে। তুমি তোমার মতো করেই থেকো। এবার একটা কাজ করতে পারো। ঘুমিয়ে পড়ো বরং।"

আমি বললাম, "ঘুমিয়ে পড়ব? এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে আমি ঘুমিয়ে পড়ব? আমি কি তোমার মতো কুম্ভকর্ণ?"

বউ হেসে ফেলল। বলল, "তোমার হেড অফিস হেবি গরম। এত রাগ ভালো না। প্রেশার আছে তোমার?"

আমি বললাম, “জানি না। থাকলে থাকবে। তোমার জেনে কী কাজ?”

বউ বলল, “তা ঠিক। আচ্ছা। আমি আবার ঘুমাই তবে।”

বলে আমাকে অবাক করে চোখ বন্ধ করল, আর ঘুমিয়ে তলিয়ে গেল।

আমি কয়েক সেকেন্ড ওর দিকে কঠিন চোখে তাকিয়ে যখন বুঝলাম ও সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছে, আমি গাড়ি থেকে নামলাম। বৃষ্টি পড়ছে ঝিরঝির করে। রাস্তার অবস্থা সঙ্গিন। একটা মেশিন এসেছে, রাস্তা পরিষ্কার হচ্ছে। গাড়িতে এসে বসলাম। আধঘণ্টা পরে রাস্তা ছাড়ল।

রাবংলায় কোন এক গ্রামে থাকার কথা ছিল, কিন্তু আসল জায়গায় দেখা গেল ড্রাইভার কোনও হোম স্টে না জোগাড় করে সরাসরি একটা হোটেলে নিয়ে তুলল।

বউ রাগারাগি করছিল বটে, কিন্তু সে ছোকরা নেপালি ভাষায় কী সব কিচকিচ করে বলে কেটে পড়ল।

বউ বলল, “ডিসগাস্টিং। আমার একদম এরকম লোকালিটির মধ্যে থাকতে ভাল্লাগে না। অফবিট জায়গা খুঁজতে বেরোলাম, কোনও কাজ হল না। হুস।”

আমি পাড়াগেঁয়ে গরিব আদমি। এই সব "অফবিট" শব্দ-টব্দ ফেসবুকেই শুনেছি, থুড়ি দেখেছি। চিরকাল ভিড়ের মধ্যে ঘুরে বেড়ানো অভ্যাস। বউয়ের কথা শুনে বললাম, "তাহলে কি বাক্স প্যাঁটরা নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ব?"

বউ রাগি গলায় বলল, "নাহ। আমার ঘুম পেয়েছে। খিদেও পেয়েছে। কিন্তু ড্রাইভারটাকে আমি ছাড়ব না। ওর কপালে দুঃখ আছে।"

আমি চুপচাপ ভালো মানুষের মতো হোটেলের রুমে ঢুকে পড়লাম। সুন্দর গিজার আছে। গরম জলে স্নান সেরে খেয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম যখন, তখন বেলা গড়িয়েছে। সাড়ে চারটে বাজে। বৃষ্টি বন্ধ হয়ে আবার হালকা রোদ উঠেছে।

বউ বলল, "তুমি শুয়ে থাকবে? বিকেলে বেরোবে না?"

আমি বললাম, "তুমি বেরোবে? তাহলে বেরোব।"

বউ বলল, "আমার একটু লোকাল বাজারে যেতে হবে। কেনার আছে কিছু।"

আমি বললাম, "ঠিক আছে, তৈরি হয়ে নাও।"

বউ বলল, "মদ খাব আজ। হুইস্কি কিনো। তুমি হুইস্কি খাও?"

আমি বললাম, "খাই। কিন্তু তোমার সঙ্গে খাব না। তুমি খেয়ো।"

বউ রাগি গলায় বলল, "কেন, খাবে না কেন? কী হয়েছে?"

আমি বললাম, "এমনি, ইচ্ছা নেই খাবার তাই খাব না। তোমায় কিনে দেব, খেয়ো যত খুশি।"

বউ জামাকাপড় নিয়ে বাথরুমে যেতে যেতে বলল, "যা ইচ্ছে করো। তৈরি হও। বেরোব।"

বেরোলাম কিছুক্ষণ পরেই।

ফোনটা যখন এল তখন সাড়ে পাঁচটা বাজে। বউ একটা দোকানে ঢুকে কীসব কিনছিল। আমার ফোনটা বেজে উঠল। দেখি আননোন নাম্বার। ধরলাম, "হ্যালো।"

"হ্যালো, ঋতুজা আছে? অ্যাকচুয়ালি ওর ফোনটা পাচ্ছি না।"

আমি কয়েক সেকেন্ড চুপ থেকে বললাম, "আপনি?"

"আমি অনিরুদ্ধ। ঋতু মনে হয় আপনাকে আমার কথা বলেছে, তাই না ভাই?"

আমি আবার একটু চুপ করে থেকে বললাম, "ও, আপনিই সেই মাতৃসম্ভোগকারী বঞ্চিত শুয়োর?"

ওপাশ এবার একটু চুপ থেকে বলল, "মানে? কী বলতে চাইছেন?"

আমি চোখ বন্ধ করে যত খিস্তি জানি সব মনে করলাম। তারপর বলতে শুরু করলাম। কয়েক সেকেন্ড পরে ওপাশ থেকে ফোনটা কেটে গেল।

বউ দোকান থেকে বেরিয়ে দেখল আমি থরথর করে কাঁপছি।

অবাক গলায় বলল, "কী হয়েছে তোমার? মৃগী আছে নাকি?"

আমি ধাতস্থ হয়ে বললাম, "না, এমনি। চলো। যাওয়া যাক।"

৩৫

সন্ধ্যা নেমেছে। তার সঙ্গে নেমেছে তুমুল বৃষ্টি।

হোটেলের বয় জানাল রাবংলার বৃষ্টি এমনই। যখন হবে সারাক্ষণ ধরে হতেই থাকবে।

বৃষ্টির শব্দটা দারুণ লাগছিল। গরম গরম চিকেন পকোড়া আর কফি দিয়ে গেছে। আমি কফি খাচ্ছি। বউ কম্বলের তলায় শুয়ে টিভি দেখছে।

ফোনে মেসেজে ভরে যাচ্ছে। অনিরুদ্ধ অজস্র থ্রেট দিয়ে চলেছে। আমি দেখছি।

ফোনটার ব্যাপারে বউকে কিছুই বলিনি। চুপচাপ শপিং সেরে চলে এসেছি।

কীসব কিনল।

আমার মনটা একটু মদ মদ করছিল বটে এই ওয়েদারে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত খাব না বলেই ঠিক করলাম।

এরকম নিঃস্পৃহ বেড়ানো আমার জীবনেও হয়নি। কোথাও গেলে বাড়ির সবাই মিলে বেড়াতে যেতাম ছোটোবেলায়। কাকার ছেলেরা, জেঠুর ছেলেরা মিলে লাফঝাঁপ দিয়ে সবাইকে অস্থির করে তুলতাম।

একটা ঘরে দরজা বন্ধ করে বসে থাকার কথা কোনও দিন ভাবিওনি।

নিজেকে কেমন সাইকো মনে হচ্ছে। পরিস্থিতি সুস্থ মানুষকে সাইকো বানিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে।

আমার নিজেকে তেমন মনে হচ্ছে।

অনিরুদ্ধ ফোন করা শুরু করল।

বউ বলল, "কে ফোন করছে?"

আমি বললাম, "অফিস থেকে ফোন আসছে। ধরব না ধুস।"

বউ বলল, "তুমি এরকম কাজ থেকে পালিয়ে থাকো নাকি?"

আমি বললাম, "কাজের মধ্যেই তো থাকি সারাদিন। এখন একটু পালিয়ে থাকি নাহয়।"

বউ বলল, "ও। আর-একটা কফি বলো। খুব ভালো বানিয়েছে।"

আমি রুম সার্ভিসে ফোন করলাম।

চুপ করে বসে টিভি দেখতে দেখতে মাথায় একটা বুদ্ধি এল।

বউকে বললাম, "তুমি ফেসবুকে আছ?"

বউ বলল, "আছি তো। কেন? অ্যাড করবে?"

আমি বললাম, "না না, এমনি। কোনও কারণ নেই।"

বউ বলল, "অ্যাড করলে করো, কিছু লিখো না। লোকজনকে জানাবার প্রয়োজন নেই। আমি কাউকে কিছু জানাইনি।"

আমি বললাম, "তুমি রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট না করলে লিখবই বা কী করে? তা ছাড়া অ্যাড করছি না। এমনিই মনে হল হঠাৎ করে আর কি।"

বউ বলল, "ওহ। তাহলে ঠিক আছে।"

সেট ম্যাক্সে পঞ্চান্ন কোটি বারের মতো সূর্যবংশম দিয়েছে। বউ সেটা দেখতে লাগল।

আমি আর কোনও কথা না বলে ফোন ঘেঁটে বউয়ের প্রোফাইল বের করলাম।

হুঁ, এই তো, অনিরুদ্ধ আছে!

কমেন্ট করেছে একটা ছবিতে।

অনিরুদ্ধর প্রোফাইল খুললাম।

বউয়ের সঙ্গে ফটো দিয়েছে, এবং কী সর্বনাশ! এ তো অনিন্দিতা! আমাদের সঙ্গে পড়ত একই কলেজে, একই ক্লাসে!

হাসি পেয়ে গেল।

পৃথিবী গোল।

অনিন্দিতা প্রি-ওয়েডিং থেকে শুরু করে গাদাগুচ্ছের ফটো দিয়েছে। সব বসে বসে দেখতে লাগলাম।

কী মনে হতে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্টও পাঠিয়ে দিলাম।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট হয়ে গেল। অনিন্দিতা অনলাইনই ছিল।

অ্যাকসেপ্ট করেই পিং করল, “কী রে, অ্যাদ্দিন পরে মনে পড়ল?”

আমি বললাম, “একদম। কেমন আছিস রে? বিয়ে করেছিস দেখলাম!”

ফোনে অনিরুদ্ধর মেসেজ এল একটা, “আমার ঋতুজাকে যদি কিছু করেছিস তাহলে তোর কপালে দুঃখ আছে।”

অনিন্দিতা আমার মেসেজের রিপ্লাই করল, “এই তো। কদিন হল। তুই বিয়ে করলি?”

ঘরের কলিং বেল বাজল। কফি দিতে এসেছে।

বউ কফিতে চুমুক দিয়ে বলল, “উফ, এসব জায়গায় কফি খেতে হেবি লাগে। একটা সিগারেট ধরাই?”

আমি বললাম, “ঘর ধোঁয়ায় ভরে যাবে। কী দরকার?”

বউ বলল, “তাও ঠিক। ঘুমটা নষ্ট হবে। থাক।”

আমি ফোনের দিকে তাকালাম।

অনিন্দিতা আমার প্রশ্নের উত্তর না পেয়ে একটা জিজ্ঞাসাচিহ্ন দিয়েছে।

আমি লিখলাম, “বিয়ে করেছি রে। তবে যে মেয়েটাকে বিয়ে করেছি, সে লোকটা একটা সদ্যবিবাহিত লোকের প্রেমিকা। খুব জটিল।”

অনিন্দিতা চোখ বড়ো বড়ো করা স্মাইলি পাঠিয়ে লিখল, “ওরে বাবা। সে কী রে! তুই মানছিস কেন? লোকটাকে ধরে ক্যালা।”

আমি হাসির স্মাইলি দিয়ে লিখলাম, “ধুস। সে তো ভুবনেশ্বরে বসে আছে। তাকে পাব কী করে?”

অনিন্দিতা লিখল, “ভুবনেশ্বরে? কী নাম রে? আমার বরও আছে। নামটা বল তো। দেখি বরকে বলে। চেনে নাকি!”

আমি চুপ করে বউয়ের দিকে তাকালাম। ফোনটা টেবিলের ওপর রেখে সোফায় পা তুলে বসলাম। অমিতাভ বচ্চন বিষ ভরা পায়েস খাচ্ছেন। ভীষণ ইমোশনাল সিন।

ফোনে মেসেঞ্জার টোন বাজল। হাতে নিয়ে দেখলাম অনিন্দিতা লিখেছে, “কী রে মড়া, কোথায় গেলি?”

আমি অনিরুদ্ধর ফেসবুক প্রোফাইল থেকে ওর ডিপিটা অনিন্দিতাকে পাঠিয়ে বললাম, “এই লোকটা।”

ওপাশে মেসেজটা সিন হল। আর কোনও রিপ্লাই এল না।

৩৬ আত্রেয়ী

কোনও কোনও দিন আসে, যে দিনগুলো টিভি সিরিজের সময় নষ্ট করার মতো সময় নিয়ে আসে। আমরা ঘুম থেকে উঠি, খাই দাই, স্কুল কলেজ অফিস যাই, আবার ফিরে খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়ি।

আর কোনও কোনও দিন আসে, যে দিনগুলো ঘটনাবহুল হয়। ওই একদিনেই এমন সব কাণ্ড ঘটে, যা আমাদের গোটা জীবন, চিন্তাভাবনাকে নাড়িয়ে দিয়ে চলে যায়।

এরকম সুন্দর সকালও তো আমার জীবনে খুব একটা আসেনি।

অমৃত যখন অপরাধী অপরাধী মুখ করে আমার সঙ্গে কথা বলছিল, বারবার ক্ষমা চাইছিল, আমার মনে হচ্ছিল ওর মাথার চুলগুলো ঘেঁটে দি। বাবা না থাকলে সারা মুখে চুমু খেতাম। এমন পাগলামি প্রেম তো কোনও দিন করিনি। প্রেম শব্দটা সম্পর্কেই একটা ভীতি কাজ করে এসেছিল চিরকাল। ভেবেছিলাম কোনও দিন বিয়ে করব না। বিয়ে সম্পর্কেও আমার ভীতি আছে।

অমৃত যখন অমন করে আমার ওপর হম্বিতম্বি করছিল, খুব রাগ হয়েছিল। শুতে পারছিলাম না। ছটফট করছিলাম। গোটা দিনটা তেতো হয়ে গেছিল। ক্লাস নিতে নিতে কখন যে দু চোখ দিয়ে অবিশ্রান্ত জলের ধারা নেমে যাচ্ছিল, বুঝতে পারছিলাম না। ছাত্রছাত্রীরা অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল, কিন্তু কেউই কিছু বলতে সাহস পাচ্ছিল না।

সম্পর্ক তো এভাবে হয় না। একজন মালিক হবে, আর একজন কুকুর। পায়ের তলায় রেখে দেবে তাকে। সে কুকুর কারও সঙ্গে কথা বলবে না। মালিক যেভাবে বলবে, যেমনভাবে চলতে বলবে, তেমনভাবে চলবে।

এরকম সম্পর্ক থেকেই তো আমি বরাবর ভয় পেয়ে এসেছি। তবে অমৃতও সেরকম হয়ে গেল। যতবার ভেবেছি, কান্না পেয়েছে। চোখ মুখ শক্ত করে টিচার্স রুমে বসে ছিলাম।

আদৃতার প্রগলভ কথা ভালো লাগেনি।

বরং অনিন্দিতাদি খানিকটা বুঝেছিল আমার মুড ঠিক নেই। কখন যেন পাশে এসে পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেছিল, “কী রে পাগলি, কী হয়েছে?”

কেউ এভাবে বললে ঠিক থাকা যায় না। আমি হঠাৎ করে কেঁদে ফেলেছিলাম।

অনিন্দিতাদিও আর জানতে চায়নি কী হয়েছে। কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছে। বলেছে, "মন খারাপ করিস না।"

আজ সকালে অমৃত স্কুলে নামিয়ে দিয়ে গেল। ওকে জড়িয়ে ধরে পিঠে মুখ গুঁজে বসে ছিলাম। অমৃত অপরাধীর মতো মুখ করে ছিল। তবু খুব কষ্ট হচ্ছিল।

ভালোবাসলে বুঝি এমনই হয়। এত নির্ভরতা কোত্থেকে আসে কে জানে!

স্কুলে নামিয়ে দিয়ে যাবার সময় অমৃত বলল, "রাস্তা পার হবে সাবধানে।"

তখনও আমার কান্না পাচ্ছিল। অনেক কষ্টে সেসব সামলে বলেছি, "তুমি বাইক চালিয়ো সাবধানে। আর রাগটা কমাও। এই বয়সে হাই প্রেশার হলে ভালো লাগবে?"

অমৃত ফিক করে হেসে দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল যতক্ষণ না আমি রাস্তা পার হলাম তারপর। স্কুলের গেট দিয়ে ঢোকার আগে আমি দাঁড়িয়ে ইশারা করলাম, "যাও।"

অমৃত বেরিয়ে গেল। যতক্ষণ ওর বাইকটা দেখা যায়, ততক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। ঝগড়া হবার পর মিল হলে বুঝি এমন ভাবেই ভালোবাসা বাড়ে?

ঘোরের মধ্যে ছিলাম। সেটা ভাঙল টিচার্স রুমে এসে। লাফাতে লাফাতে এসে অনিন্দিতাদিকে জড়িয়ে ধরতে যাব, দেখলাম অনিন্দিতাদি কেমন পাথরের মতো বসে আছে। রোজ কী সুন্দর করে চুল বেঁধে আসে, আজ আসেনি। চোখে মুখে প্রসাধনের চিহ্নমাত্র নেই। কাল পর্যন্ত কত সুন্দর করে সিঁদুর পরে এসেছিল, আজ সিঁদুরটাও পরেনি। বাণীদি খাতা দেখছিলেন। আদৃতা আসেনি তখনও। অন্য কোনও দিদিও আসেননি।

আমি অনিন্দিতাদিকে বললাম, "এই, কী হয়েছে? কোনও ব্যাড নিউজ?"

অনিন্দিতাদি ম্লান মুখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "না তো। কিছু হয়নি। তুই কেমন আছিস বল? ঠিক আছিস?"

আমি হেসে বললাম, "হ্যাঁ ঠিক আছি। তুমি বলো না আমায় কী হয়েছে। কেমন লাগছে। আচ্ছা এসো।"

অনিন্দিতাদিকে নিয়ে টিচার্স রুম থেকে বেরোলাম।

ক্লাস টেনের পরীক্ষা চলছিল বলে ছুটি ছিল। টেন এ-তে ফাঁকা ক্লাস রুমে নিয়ে গিয়ে বসালাম।

অনিন্দিতাদি বসেই কেঁদে ফেলল। জোরে জোরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না।

আমি অনিন্দিতাদির হাত ধরে বসে রইলাম।

কান্না থামতে বলল, "আত্রেয়ী, আমার সব শেষ হয়ে গেল রে।"

আমি বললাম, "কেন গো? কী হয়েছে?"

অনিন্দিতাদি বলল, "আমি কনসিভ করেছি কালকে জানতে পারলাম।"

আমি খুশি হয়ে বললাম, "সে তো ভারী খুশির কথা।"

অনিন্দিতাদি বলল, "আর কালকেই জানতে পারলাম আমার বর আমাকে চিট করছে দিনের পর দিন।"

আমি স্তম্ভিত হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, "মানে?"

অনিন্দিতাদি বলল, "বিয়ের আগে থেকে ওর একটা মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। মেয়েটা ওকে রিজেক্ট করায় আমাকে বিয়ে করে। বিয়ের পরে মেয়েটার মনে হয়েছিল ও ভুল

করেছে। অনিরুদ্ধ ওর সঙ্গে আমাকে লুকিয়ে যোগাযোগ করে চলেছে। ওদের মধ্যে ফিজিক্যাল রিলেশনও আছে সম্ভবত।”

আমি বললাম, “ধুস। এগুলো মিথ্যেও তো হতে পারে। লোকমুখে শুনেছ? অন্যের কথা শুনে এসব বলতে নেই।”

অনিন্দিতাদি বলল, “না রে। প্রমাণ আছে। আমি কী করি বল তো? বাচ্চাটাকে নষ্ট করে ফেলব?”

অনিন্দিতাদি কেমন অসহায় চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি কী বলব বুঝেই উঠতে পারলাম না।

৩৭

মানুষ সম্পর্কে বাঁচে। সম্পর্ক যতদিন না কারও সঙ্গে তৈরি হয়, মানুষ একরকমভাবে থাকে। সম্পর্কের পর সে মানুষের বাঁচা মরার রকমভেদ হয়।

বাঙালির যেমন দুর্গাপুজো। দুর্গাপুজোর আগে মানুষের জীবন একরকম থাকে। পরে আর-একরকম।

সম্পর্কটাও তাই। যারা বলে একটা ব্রেক আপে তাদের কিছু যায় আসে না, ভুল বলে। ব্রেক আপ মানুষকে দুমড়ে মুচড়ে দিয়ে যায়। সব কিছুর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটাই পরিবর্তন হয়ে যায়।

অনিন্দিতাদিকে দেখে আমার অস্বস্তি হচ্ছিল। এই অনিন্দিতাদিই আমাকে একদিন বলেছিল, "কেন চাকরি করি জানিস? কোওন পরের বাড়ির ছেলে যেন একদিন দুম করে বলে না বসতে পারে, আমার টাকায় খাও পরো, লজ্জা লাগে না?"

খুব কাঁদছিল অনিন্দিতাদি।

আদৃতা এসে গেছিল রুমটায়। আমি ইশারায় ওকে চলে যেতে বললাম।

অনিন্দিতাদি বলল, "আমি কী করি বল তো আত্রেয়ী?"

আমি বললাম, "দাদাকে জিজ্ঞেস করো সরাসরি। কী আবার করবে? এটা তো আর প্রেম না যে ব্রেক আপ হয়ে গেলেই সব মিটে যাবে। রীতিমত সই সাবুদ করে বিয়ে করেছ। একজন স্ত্রী হিসেবে সমস্ত আইনগত সুবিধা পাবে তুমি। এসব মানুষকে সহজে ছাড়তে নেই। এ তো রীতিমত ফ্রড কেস দিদি।"

অনিন্দিতাদি কান্না থামিয়ে ঠান্ডা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি ওকে জেলে দি, ফাঁসি দি, যাই করি, ও তো আমায় ভালোবাসে না। তাহলে এসব করেই বা কী হবে?"

আমার চোয়াল শক্ত হচ্ছিল। বললাম, "হবে। অনেক কিছুই হবে। তুমি হয়তো একরকম ভেবেছ, কিন্তু যারা মানুষকে এভাবে ঠকায়, তাদের ছেড়ে দিলে তুমি অপরাধ করবে। অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, দুজনেই অপরাধী দিদি। অনিরুদ্ধদা যেমন অন্যায় করে দোষী, তুমি যদি ওকে সহজে ছেড়ে দাও, তবে তুমি অন্যায় সহ্য করে দোষী হবে। তুমি নাহয় ওকে ডিভোর্স দিয়ে দিলে, কিন্তু ও যে আর-একটা বিয়ে করে সে মেয়েটার জীবনও তোমার জীবনের মতোই অসহনীয় করে দেবে না তার কোনও গ্যারান্টি আছে?"

অনিন্দিতাদি আমার হাতদুটো ধরল হঠাৎ। বলল, "আচ্ছা, অ্যাবরশন কোথায় করা হয়, জানিস?"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "মানে? তুমি বাচ্চাটা নেবে না?"

অনিন্দিতাদি বলল, "না, নেব না। অনাদরের বাচ্চা রাখব না। তাতে আমি মরে গেলে যাব। কিন্তু এই বাচ্চা আমি কিছুতেই নিতে পারব না।"

আমি মাথায় হাত দিয়ে বসলাম। স্কুলের ঘণ্টা পড়েছে। ভাগ্য ভালো আমার এখন কোনও ক্লাস নেই। টিচার ইন-চার্জ যদি না অন্য কোনও স্টপ গ্যাপে পাঠান তাহলে কিছুটা সময় পাওয়া যাবে।

বললাম, "তুমি যাই করো অনিন্দিতাদি, একটা দিন বা দুটো দিন পরে করো। রাগের মাথায় বা কোনও কিছুর ঝোঁকে পড়ে কিছু করতে গেলে মানুষ আরও বেশি করে ভুল করে ফেলে।"

অনিন্দিতাদি ধরা গলায় বলল, "একটা মেয়ের তো সব কিছু ঘিরে ওই একজনই থাকে রে আত্রেয়ী। সে-ই তার সব হয়, ওই যে পৃথিবী না কী বলছিস সে সব। আমার তো পায়ের তলার মাটিটাই সরে গেছে। ঈশ, কী লজ্জা বল তো, লোকে যখন জানতে পারবে আমার হাজব্যান্ড আমাকে দিনের পর দিন ঠকিয়েছে, ঈশ।"

অনিন্দিতাদির গলা বুজে এল।

আমি আমার ব্যাগ থেকে বের করে জলের বোতল বের করে অনিন্দিতাদির হাতে দিয়ে বললাম, "জলটা খাও আগে। নাও।"

অনিন্দিতাদি অনেকটা জল খেল।

বললাম, "শোনো, আমাকে ফোনটা দাও। অনিরুদ্ধদার সঙ্গে আমি কথা বলি।"

অনিন্দিতাদি বলল, "তুই বলবি?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ। ফোন ধরে দাও তো। সকালে কথা হয়েছিল?"

অনিন্দিতা বলল, "হ্যাঁ। আমি স্বাভাবিক কথা বলেছি। বুঝতে দিইনি কিছু।"

আমি বললাম, "কেন বুঝতে দাওনি?"

অনিন্দিতাদি বলল, "বুঝিয়ে কী হবে?"

আমি বললাম, "নাম্বারটা দাও। আমি অন্য একটা জিনিস করি। লয়ালটি টেস্ট। একটা চ্যানেলে হত, খুব দেখতাম।"

অনিন্দিতাদি ফোনটা বের করে নাম্বারটা দিলাম।

আমি মিসড কল মারলাম।

সঙ্গে সঙ্গে ফোন এল। "হ্যালো, কে বলছেন?"

আমি বললাম, "রং নাম্বার।"

ওপাশ থেকে ভেসে এল, "রং নাম্বারই তো? হ্যান্ডসাম ছেলেদের নাম্বারে মেয়েদের মিসড কল মারা স্বভাব আছে কিন্তু।"

আমি মিষ্টি গলায় বললাম, "আচ্ছা? আপনার নাম্বার কী করে পেলাম বলুন তো?"

অনিরুদ্ধদা বলল, "পেয়ে যায়। আপনিও নিশ্চয়ই কোথাও থেকে পেয়েছেন। মে বি টিন্ডার? আমরা দেখা করেছি কি কোনও দিন?"

আমি বললাম, "কই না তো। তবে ইচ্ছা আছে।"

অনিরুদ্ধদা বলল, "করলেই হয়। সিঙ্গল মানুষ, সুন্দরীরা দেখা করতে চাইলে কেন করা যাবে না? এই উইকএন্ড ফ্রি আছেন?"

ফোন স্পিকারে চলছিল। আমি দেখতে পেলাম অনিন্দিতাদির দু চোখ দিয়ে জলের ধারা পড়েই চলেছে।

৩৮ জীমূতবাহন

আগের রাতে ঘুম হয়নি বলে এ রাতে বিছানায় পড়তেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। মাঝরাতে টের পেয়েছিলাম বউ আমার গায়ে পা তুলে দিয়েছে, বাধা দিইনি আর। ঘুম থেকে উঠে দেখলাম গলা জড়িয়ে ঘুমাচ্ছে। ওকে হালকা ঠেলে উঠলাম।

বউ ঘুম ভেঙে আমাকে ঘুমজড়ানো গলায় বলল, "ওহ, আমার ঘুমটা খুব খারাপ। তোমাকে জড়িয়ে ধরেছিলাম?"

আমি বললাম, "কাকে জড়িয়ে ধরলে খুশি হতে? অনিরুদ্ধকে?"

বউ বলল, "ঘুম থেকে উঠেই তুমি ছয় হাঁকাতে শুরু করে দিলে যে। একটু অপেক্ষা করতে পারতে তো!"

আমি বললাম, "এমনিই ইচ্ছা হল। রেডি হয়ে নাও, সাইট সিয়িং করে আসি।"

বউ বলল, "কোথায় নিয়ে যাবে? ঘুমালে হত না?"

আমি বললাম, "কত ঘুমাবে? একটু ঘুরে নাও। খিদে পাবে ভালো।"

বউ বলল, "স্নান করে নি। তুমি আগে বাথরুমে গেলে যাও। আমার স্নানে টাইম লাগে।"

আমি বললাম, "পেট পরিষ্কার করে বেরিয়ো। মাঝরাস্তায় হাগা পেয়েছে বলবে না।"

বউ রেগে গেল, "আমি কি একবারও হাগা পেয়েছে বলে গাড়ি দাঁড় করিয়েছি? এরকম কথা মনে হল কেন হঠাৎ? আর আমার পেট ক্লিয়ারই হয়। তোমাকে দেখে যেরকম কোষ্ঠকাঠিন্যের রুগি বলে মনে হয়, আমি সেরকম নই। আমার স্কিন দেখেছ, একটা পিম্পল পর্যন্ত নেই।"

আমি বললাম, "আমারও ক্লিয়ার হয়। আগে থেকে বয়ফ্রেন্ড থাকা মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হলে সব পুরুষের কোষ্ঠকাঠিন্য কেন, পাইলস, ফিশার সব হতে পারে।"

বউ চ্যাঁচাল, "সবাই কি তোমার মতো নাকি? ফ্রাস্ট্রু পাবলিক। জীবনেও গার্লফ্রেন্ড জোটাতে না পারা লোকগুলো আজীবন ফ্রাস্ট্রেশনেই মরে যায়।"

আমি বললাম, "তাও ভালো করে, তোমার মতো কাউকে ঠকিয়ে যেতে হয় না।"

বউ রাগি চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি কাউকে ঠকাইনি।"

আমি বললাম, "তুমি নিশ্চিত?"

বউ বলল, "হ্যাঁ।"

আমি সোফায় বসে পড়ে ঠান্ডা গলায় বললাম, "তোমার অনিরুদ্ধের বউ আমার ক্লাসমেট ছিল। ওকে সব বলে দিয়েছি।"

বউ আমার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বলল, "তারপর?"

আমি কাঁধ ঝাঁকালাম, "তারপর তোমার অনিরুদ্ধর এখন পাপড় সেঁকা হচ্ছে মে বি, আমার কী?"

বউ বলল, "তোমার কী? তুমি কেন বলতে গেলে?"

আমি বললাম, "তোমারই বা কী? তুমি ওর বউকে কেন ঠকাবে? আমার বলার ইচ্ছা হয়েছে, আমি বলে দিয়েছি। তুমি অনিরুদ্ধকে ফোন করবে? সান্ত্বনা দেবে? ওদের ডিভোর্স হয়ে যাবে নিশ্চয়ই এবারে, তখন তোমরা নিশ্চিন্তে সংসার করতে পারবে।"

বউ আমার দিকে ছোটো ছোটো চোখ করে তাকিয়ে বলল, "তুমি আমাকে ডিভোর্স দিয়ে দেবে সহজে?"

আমি হাসলাম, "না। সহজে দেব না। তোমার ওই অনিরুদ্ধকে বলবে একদিন একটা একলা জায়গায় আমার সামনে একা আসতে। ওর স্পেশাল জায়গায় কিছু স্পেশাল লাল পিঁপড়ে ছেড়ে দেওয়ার প্রবল ইচ্ছা আছে আমার।"

বউ রেগে গিয়ে বলল, "যে তোমার কোনও ক্ষতি করেনি, তার সম্পর্কে এরকম মানসিকতা রাখার মানে কী?"

আমি বললাম, "ক্ষতি করেনি কে? অনিরুদ্ধ? মানে তুমি সিরিয়াসলি বলছ? একটা স্বাভাবিক ছেলে, যে কিনা খুব ভালো ছিল, তাকে একটা ডিসপুটেড ম্যারেজের মধ্যে জড়িয়েছ তোমরা, তথ্যপ্রমাণ জোগাড় করছি, এমন হাল করব তোমাদের, দুটোকেই জেলের ঘানি টানাব।"

আমি রেগে গেছিলাম।

বউ সেটা দেখে হাই তুলে শুয়ে পড়ে চোখ বন্ধ করে বলল, "জেলে পাঠালে পাঠাবে। মানুষের সব এক্সপেরিয়েন্স হওয়া দরকার চিতায় ওঠার আগে। সঞ্জু দেখে আমার জেল লাইফের প্রতি একটা ইন্টারেস্ট এসেছে। জেল তো ভালো জায়গা।"

আমি বললাম, "জেল ভালো জায়গা? মোটাসোটা চেহারার মহিলারা যখন জায়গামতো বেগুন ঢুকিয়ে দেবে তখন বুঝতে পারবে।"

বউ বলল, “ধ্যাত। ফালতু কথা যত।”

আমি বললাম, “ফালতু কথা হলে ফালতু কথা। আমি শুনেছি বলেই বললাম।”

বউ বলল, “যাহ্, কী বলো তুমি? সত্যি নাকি?”

আমি বললাম, “হ্যাঁ, আরও অনেক কিছু হয়। আমি গুগল সার্চ করে দেখে বলব তোমায়।”

বউ সিরিয়াস মুখে বলল, “তাহলে জেলে যাব না। তুমি ডিভোর্স চেয়ো, দিয়ে দেব। খামোখা কেস খাইয়ো না। শোনো না, সকালে আলুপরোটা বলে দাও না। ডিভোর্সের কথায় খিদে পেয়ে গেল।”

আমার প্রবল সন্দেহ হল এই মেয়ে মানসিক ভারসাম্যহীনতায় ভুগছে।

৩৯ আত্রেয়ী

টিচার ইন-চার্জকে জানিয়ে স্কুল থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে অনিন্দিতাদিকে ওর বাড়ি নিয়ে গেলাম।

বাড়ি বলতে ওর শ্বশুরবাড়ি। অনিন্দিতাদি গোটা রাস্তা চোখ মুখ শক্ত করে বসে থাকল। আমাকে বাড়ি ঢোকার সময় বলল, "আমার ব্যাগ গোছাতে বেশিক্ষণ লাগবে না, তুই আমাকে হেল্প করিস শুধু।"

আমি হতভম্ব গলায় বললাম, "তোমার তো নর্থ বেঙ্গলে বাড়ি। কোথায় যাবে তুমি এখন?"

অনিন্দিতাদি বলল, "আপাতত কোনও একটা হোস্টেলে থাকি। তারপর দেখা যাবে।"

আমি কিছু বললাম না। যেরকম চোখ মুখ শক্ত করে রেখেছে, কিছু বলা সম্ভব বলে মনে হল না।

কলিং বেল বাজাতে অনিন্দিতাদির শাশুড়ি দরজা খুললেন। অবাক গলায় বললেন, "কী ব্যাপার বউমা? তুমি এত তাড়াতাড়ি চলে এলে?"

অনিন্দিতাদি বলল, "একটু কাজ ছিল মা। বেরোতে হবে আমাকে। ওর সঙ্গে পরিচয় করুন, আত্রেয়ী, আমার কলিগ।"

অনিন্দিতাদির শাশুড়ি আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসেই অনিন্দিতাদির দিকে তাকিয়ে বললেন, "কোথায় যাবে তুমি? অনিকে বলেছ?"

অনিন্দিতাদি ব্যস্ত গলায় বলল, "হ্যাঁ বলে দেব। বাড়ি থেকে জরুরি ফোন এসেছে তো আসলে। আয় আত্রেয়ী, আমার ঘরে আয়।"

অনিন্দিতাদির শাশুড়ির হতভম্ব মুখ পিছনে ফেলে গুটিগুটি অনিন্দিতাদির পিছন পিছন ওর ঘরে গেলাম।

পরিপাটি করে সাজিয়ে রাখা ঘর। অবশ্য অনিন্দিতাদিকে দেখলেই সেটা বোঝা যায়, সব সময় এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে থাকে। অনিন্দিতাদি খাটে বসল একটু। খাটের পাশের টেবিলে অনিরুদ্ধদা আর অনিন্দিতাদির বিয়ের ছবি। অনিরুদ্ধদা হাসি হাসি মুখে বসে বিয়ে করছে। ছবিটা দেখে কেমন একটা অদ্ভুত অস্বস্তি হল।

এই লোকটা এভাবে বসে বিয়ে করছে, এতটা অভিনয় কেউ করতে পারে? এতটা?

ভাবতে পারছিলাম না ঠিক। বিশ্বাসও হচ্ছিল না।

অনিন্দিতাদি বলল, "তোকে আর মেসেজ করেছে?"

আমাকে বেশ কয়েকটা মেসেজ করেছিল অনিরুদ্ধদা, কিন্তু আমি অনিন্দিতাদিকে আর চাপ দিতে চাইলাম না। বললাম, "না করেনি আর। কেন বলো তো?"

অনিন্দিতাদি বলল, "আমি ঠিক বুঝতে চাইছি আত্রেয়ী, ও কত দূর এগিয়েছে। এরকম একটা মানুষের সঙ্গে বিয়ে হল আমি তো ভাবতেই পারছি না। এরকম কেন হল বল তো আমার সঙ্গে?"

আমি বললাম, "কিচ্ছু হয়নি অনিন্দিতাদি। কিছুই হয়নি এখনও। তুমি এভাবে ভেঙে পড়ছ কেন? হয়তো এটাই অনিরুদ্ধদার কোনও অসুখ। মানুষ তো রোগের ঘোরেও এরকম কাজ করতে পারে। কথা বলতে হবে। দেখো, কথা বলে যদি সারানো যেতে পারে!"

অনিন্দিতাদি বলল, "কী সারাব আত্রেয়ী? তুই আমাকে বল দেখি, তোর সঙ্গে এরকম হলে কী করতিস তুই?"

আমার হঠাৎ করে মাথাটা ঘুরে উঠল। সত্যিই তো! এরকম হলে আমি কী করতাম? অমৃত যদি আমাকে লুকিয়ে অন্য কোনও মেয়ের সঙ্গে অনিরুদ্ধদার মতোই কিছু করে? বরাবরই ভীষণ শারীরিক ও, আমাদের প্রেমে শরীর আসে। ও এরকমই অন্য কারও সঙ্গে করতে পারে তো! চোখ বন্ধ করে ওর মুখটা মনে করলাম কয়েক সেকেন্ড ধরে। ফোনটা বের করে আমাদের একসঙ্গে তোলা ছবিগুলো দেখলাম। একটা ছবি আছে, যাতে ও আমাকে জাপটে ধরে আছে। কী সুন্দর ছবিটা! সময় পেলেই আমি এই ছবিটা দেখি। কয়েক সেকেন্ড ছবিটার দিকে তাকিয়ে মনের তেতো ভাবটা কাটালাম।

অনিন্দিতাদি আলমারি খুলল। লকার খুলে নিজের গয়নাগুলো খাটে ছুড়ে ফেলতে ফেলতে বলল, “এ বাড়ি থেকে যা দিয়েছিল, ও আমাকে যা কিনে দিয়েছে, সব রেখে যাব। শুধু আমার বাবা মা যা দিয়েছে তাই নিয়ে যাব।”

আমি বললাম, “মাথা ঠান্ডা করো প্লিজ। এভাবে খাটের ওপর ছুড়ে ফেলছ কেন?”

অনিন্দিতাদি আমার কথা শুনল না। কাঁদতে কাঁদতে যা করছিল করে যেতে লাগল। কিছুক্ষণ পর একটা ব্যাগ গোছানো সম্পূর্ণ হলে বলল, “আত্রেয়ী ক্যাব ডাক তো। আমি দেখি কোথায় যাওয়া যায়!”

আমি বললাম, “তুমি আজকের দিনটা আমার বাড়ি চলো অনিন্দিতাদি। তারপর দেখা যাবে। হুইমজিক্যাল ডিসিশন হয়ে যাচ্ছে না তো?”

অনিন্দিতাদি বলল, “না যাচ্ছে না। এক মিনিট দাঁড়া।”

অনিন্দিতাদি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। খানিকক্ষণ পর শাশুড়িকে নিয়ে এসে বলল, “মা, আমি বেরিয়ে যাচ্ছি। আপনারা বিয়েতে যা দিয়েছিলেন, খাটের ওপর থাকল। নিয়ে নেবেন।”

অনিন্দিতাদির শাশুড়ি অবাক হয়ে অনিন্দিতাদির দিকে তাকিয়ে বললেন, “মানে?”

অনিন্দিতাদি আমাকে বলল, “আয় আত্রেয়ী।”

প্রৌঢ়াকে পিছনে রেখে যেভাবে এসেছিলাম সেভাবেই বাড়িটা থেকে বেরিয়ে এলাম।

দুপুর গড়াচ্ছে। খিদেও পেয়েছে। ক্যাব এল। অনিন্দিতাদি গোটা রাস্তা একটা কথাও বলল না।

আমার ফোন বাজছিল। আমি দেখলাম অমৃত ফোন করছে।

ধরলাম, “হ্যালো।”

অমৃত বলল, “অন আসছ না দেখলাম, আজ খুব প্রেশার যাচ্ছে?”

আমি বললাম, “অন্য ব্যাপার আছে, আমি পরে তোমাকে বলি?”

অমৃত “আচ্ছা” বলে ফোনটা রেখে দিল।

ফোনটা রেখে দেখলাম অনিরুদ্ধদা হোয়াটসঅ্যাপ করেছে আবার, “কবে দেখা হচ্ছে?”

৪০ অমৃত

প্রেমের সমস্যা হল, ঝগড়ার প্রথমে মনে হয় দিই সব শেষ করে। তারপর যত সময় যায়, তত মনে হয়, ও কি আদৌ আমার কথাই ভাবছে?

আর তারপর যখন সব মিটে যায়, তখন প্রেম দশ গুণ বেড়ে যায়। এটা সমস্যা বললাম, এই কারণেই যে, আত্রেয়ীর সঙ্গে যেদিন সব মিটল, সেদিনই আত্রেয়ী ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ওর স্কুলে কোন কলিগের কী সমস্যা হয়েছে, সেসব একটা মেসেজে বলে বলল, রাতে জানাচ্ছে সব। বাবা ক্লাবে গেছে, দাদা আর বউদি বেরিয়েছে।

বাড়িতে বসে বসে নেই কাজ তো খই ভাঁজ আত্রেয়ীর প্রোফাইলটা খুললাম আবার। আত্রেয়ী জানিয়েছে, যেই ছেলেটা ওকে দিদিমণি দিদিমণি বলে বাজে ভাবে ফ্লার্ট করত, সেটাকে ব্লক করে দিয়েছে। আমার কথায় নাকি করেনি, ওর নিজেরই মনে হয়েছে ছেলেটা একটা জায়গায় সীমা পেরিয়ে যাচ্ছিল। আমি অনেক কষ্টে কিছু বলিনি। আমার বারবার মনে হয়েছিল ছেলেটাকে গিয়ে রাম খিস্তি মেরে আসি। কোথাকার কোন বেবুনের উল, আমার বউকে উলটোপালটা বলে ফ্লার্ট করার এত সাহস পায় কী করে? সামনে পেলে শরীরের বলগুলো ডিসম্যান্টেল করে টেবিল টেনিস খেলতাম! আত্রেয়ী জানিয়েছে ছেলেটার একটু ইয়ে ছিল বইকি, ও-ই ওকে কাটিয়ে দিয়েছে। আমি তখন বলেছি, ছেলেটার ইয়ে আছে জেনেও তুমি প্রশ্রয় দিয়েছিলে কেন?

আত্রেয়ী বলেছে ও বন্ধুই ভেবেছিল।

আমি রেগেছি। আবার নিজেই নিজেকে বুঝিয়েছি। আমার এরকম করা ঠিক না। ও তো ব্লক করে দিয়েছে। অফিসের সৌরভদা বলে প্রেমের শুরুতে অনেক রকম ইনসিকিউরিটি থাকে। এই ফেসবুকের জমানায় এই সব ইনসিকিউরিটি ডানা মেলার সুযোগও বেশি পায়।

এসব ছেলে তো সামনে ওভাবে কথা বলার সাহস পাবে না। ফেসবুকের আড়ালটা ব্যবহার করতে পারছে বলেই যা নয় তাই বলে দিতে পারছে।

কথা হল কেউ যদি যা নয় তাই বলেও, একটা মেয়ের জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি সেটাকে প্রশ্রয় দেব কেন? সবাই কি বন্ধু হয়? বন্ধু শব্দদুটো কি এতটাই সোজা যে যার তার সঙ্গে যা খুশি বলা যায়?

আত্রেয়ী আমার পিঠে মুখ গুঁজে যখন আসছিল, আমার এই সব প্রশ্নগুলো কোথায় যেন ডানা মেলে চলে গেছিল।

ঘরে বসে এই কথাগুলো আবার মাথায় ঘুরতে শুরু করল। আমি ফেসবুক বন্ধ করে গান শুনতে চেষ্টা করলাম। লাভ হল না।

অস্বস্তি হচ্ছিল। আমার কেন এরকম হয়? বসও বললেন কাজের প্রতি মন না দিলে সমস্যা বাড়ে। বিয়ের পর কি এরকম হবে? এতটা ইনসিকিউরিটি আসতে পারে?

আমি ফোন রেখে শুয়ে পড়লাম। খানিকক্ষণ ছটফট করার পর দেখলাম আত্রেয়ী ফোন করেছে। ধরলাম, "হ্যালো।"

আত্রেয়ী গলা নামিয়ে বলল, "একটা বাজে জিনিস হয়ে গেছে বুঝলে। এইজন্যই বিজি ছিলাম।"

আমি বললাম, "সেসব তো বলেছ বটে, কিন্তু আমি কিছুই বুঝিনি। কী ঘটেছে একজ্যাক্টলি?"

আত্রেয়ী বলে গেল। আমি সব শুনলাম। আত্রেয়ী বলল, "আমি রুটি করে আসছি দাঁড়াও।"

আমি গুম হয়ে বসে রইলাম। বাবা ফিরেছে। দাদা বউদিও। বউদি একবার ঘর নক করে গেছে। আমি ঘুমজড়ানো গলায় বলেছি, ঘুমাচ্ছি।

খানিকক্ষণ পরে আত্রেয়ী ফোন করল আবার। আমি ফোন ধরেই বললাম, "তুমি ওই লোকটাকে ফোন করতে গেলে কেন নিজের ফোন থেকে? মেসেজই বা করলে কেন?"

আত্রেয়ী কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বলল, "ওই সময়টা আমি কী করতাম? আমি ব্লক করে দিয়েছি অলরেডি।"

আমি গোঁ গোঁ করতে লাগলাম।

আত্রেয়ী বলল, "দ্যাখো অমৃত, মানুষের জীবন তো এরকম না যে, আমি তোমার প্রেমিকা বলে আর কোনও ছেলের সঙ্গে কথা বলতে পারব না কোনও ভাবেই। এরকম মানসিকতা মধ্যযুগে ছিল। তুমি বুঝতে পারছ তোমার কোনও একটা সমস্যা হচ্ছে? আমার কাছে একজন ভালো মনোবিদের নাম্বার আছে, তোমাকে দেব?"

আমি রেগে গিয়ে বললাম, "মনোবিদ মানে? আমি পাগল?"

আত্রেয়ী বলল, "পাগল তো বলিনি। কিন্তু আমার মনে হয় তোমার ট্রিটমেন্ট দরকার। সাধারণ ঘটনাগুলো নিয়ে তুমি যেভাবে ইস্যু বানিয়ে ফেলছ, তাতে দুদিন পরে দেখা যাবে তুমি কাউকেই সহ্য করতে পারছ না। আমি কাউকে লয়ালটি চেক করতে ফোন করেছি মানে এই না যে আমি তার সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ছি। টিনএজারদের মতো করছ কেন?"

আমি বললাম, "আমি তো কোনও দিন প্রেম করিনি, আমি জানি না কার মতো করছি। তুমি করেছ, তুমি বলতে পারবে।"

আত্রেয়ী ঠান্ডা গলায় বলল, "তুমি ঝগড়া শুরু করতে চাইছ, তাই তো?"

আমি বললাম, "আমি কিছু শুরু করতে চাইছি না, এই ধরনের ভুলভাল লোককে তুমি ফোন নাম্বার দেবে না, ব্যস!"

আত্রেয়ী হেসে ফেলল, "আচ্ছা হেগোরাম, দেব না। খুশি?"

আমি রাগি গলায় বললাম, "আমি হেগোরাম নই, আমার পাতলা হাগা হয় না।"

আত্রেয়ী বলল, "আচ্ছা। শক্ত হাগারাম। খুশি? কাল দেখা করবে। বেশি চুমু লাগবে বুঝতে পারছি তোমার, নইলে পাগল হয়ে যাচ্ছ। ভাট বকছ।"

আমি এবার হেসে ফেললাম।

৪১ জীমূতবাহন

মাঝরাত।

বৃষ্টি নেমেছে তুমুল। মনে হচ্ছে আজকেই সৃষ্টির শেষ দিন। ঘুম ভেঙে গেছে।

বউ কাঁপছে আবার। বিড়বিড় করে বলে যাচ্ছে, "ছেড়ে যাস না, পাবলোদা, শোন না, শোন, বাবা মা সবাই মারবে আমায়। আমি কী করব বল? এই পাবলোদা, শোন না"...

আমি আলো জ্বালিয়ে ঠেললাম বউকে।

বউ উঠল না। আমি আবার ঠেললাম।

এবার চোখ খুলল, বলল, "কী হল?"

আমি বললাম, "আবার কী সব বলে যাচ্ছো।"

বউ বলল, "কটা বাজে?"

আমি ঘড়ি দেখলাম, "দেড়টা বাজে।"

বউ আনমনে বলল, "হুঁ। কফি খাব।"

আমি বললাম, "এত রাতে কে তোমাকে কফি বানিয়ে খাওয়াবে?"

বউ বলল, "তুমি? খাওয়াও না। ভালো লাগছে না।"

আমি বললাম, "আচ্ছা, দাঁড়াও। দেখছি।"

রুম সার্ভিসে ফোন করলাম। ফোন বেজে গেল। কেউ ধরল না।

মনে পড়ল রুমে ইলেকট্রিক কেটলি আছে। চিনি, চা আর কফির ছোটো ছোটো স্যাশেও আছে। গরম জল বসিয়ে কফি বানিয়ে দিলাম। বউ কম্বল জড়িয়ে খাটের ওপর উঠে বসে কফি খেতে খেতে বলল, "কলকাতা ফিরে আবার ডাক্তার দেখাতে হবে। কমে গেছিল এটা। আবার ফিরে এসেছে।"

আমি বললাম, "দেখিয়ো। বাড়িতে একা ঘুমাতে?"

বউ উপর নিচে মাথা নাড়াল।

বললাম, "একা ঘুমালে বুঝতে কী করে এরকম করছ?"

বউ বলল, "মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে উঠতাম। বাবা বা মা ছুটে আসত। বাকি রাতটা আর ঘুমাতাম না।"

আমি বললাম, "তারপর?"

বউ বলল, "একজন সাইকিয়াট্রিস্টকে দেখিয়েছিলাম। উনি ওষুধ দিয়েছিলেন। কমেও গেছিল। ইদানীং আবার শুরু হয়েছে। মেন্টাল স্ট্রেসের জন্যই সম্ভবত।"

আমি বললাম, "কী রকম স্ট্রেস?"

বউ বলল, "অনিরুদ্ধ আর আমার কথা যখন শুরু হয়েছিল, আমি ওর সঙ্গে সেভাবে কথা বলতাম না। অনিরুদ্ধ বিভিন্ন কথা বলত, আর আমি তার উত্তর দিয়ে যেতাম। সোশ্যাল নেটওয়ার্ক ব্যাপারটা তো পুরোটাই অভ্যাস আসলে। অনিরুদ্ধ আমার সিস্টেমে ঢুকে গেল। আমরা সারাক্ষণ কথা বলতে শুরু করলাম। সব বিষয় নিয়ে। একটা সময় আমার পাস্ট নিয়েও কথা বলতে শুরু করলাম। ও আমাকে সাপোর্ট দিত। আমি ওকে।"

অনেকটা কথা বলে বউ কফিতে চুমুক দিল।

আমি বললাম, "সেটা বুঝলাম। কিন্তু বন্ধুত্ব হওয়া তো এক জিনিস, তাই না? স্বাভাবিক বন্ধুত্ব সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হতেই পারে। তুমি যদি ওকে ভালোবাসতে তাহলে বিয়ে করলে না কেন?"

বউ মাথায় হাত দিয়ে বলল, "আমি যে ওকে ভালোবাসি সেটা বুঝতে পারিনি প্রথমে। একটা সময় ও আমাকে প্রোপোজ করে। আমি সরাসরি না করে দি। আমার থেকে প্রত্যাখ্যান পাবার পর ও একজন মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়, সে রাজিও হয়ে যায়। আমার সঙ্গে তখন আর ওর কোনও রকম কথা হত না। কিন্তু আমি তো গুমরে গুমরে মরতে শুরু করি। এমনিতেই বরাবর ভীষণ একাকিত্বে ভোগা মানুষ আমি। অনি হুট করে কথা বন্ধ করে দিল, অনলাইন এসেও কথা বলছে না, আমি কিছুতেই মানতে পারছিলাম না। একদিন দুম করে ওকে জিজ্ঞেস করলাম, কী হে, বিয়ে হল? অনি জানাল সামনের মাসে বিয়ে। তারপর আবার কথা শুরু। আমি জড়িয়ে গেলাম। বিয়ের পরেও আমাকে কতবার বলেছে আমাকে নিয়ে সব ছেড়ে পালিয়ে যাবে। আমিই আটকেছি। একটা মেয়ে তো জড়িয়ে গেছে।"

আমি বললাম, "মেয়েটা তো জেনে গেছে, ওকে ছেড়েও দেবে। আমিও তোমাকে ছেড়ে দেব। দুজনে মিলে ভালোভাবে থাকবে এখন। তোমার লাইন ক্লিয়ার।"

বউ কফি খেতে খেতে বলল, "হলে ভালো, কারণ আমি অনিরুদ্ধকে ভালোবাসি। ওর বউ ওকে আমার জন্য ছাড়লে আমি ভেবে দেখতেই পারি।"

আমি হাসলাম, "অবশ্যই। এত সব কিছুর মধ্যে আমার লাইফের কটা দিন নষ্ট করলে এই যা।"

বউ বলল, “কারও জন্য করেছ ভাববে। সমাজসেবা টাইপ। অসুবিধা হবে না। তুমি ভালো মানুষ। তোমার কোনও ক্ষতি হবে না।”

আমি বললাম, “বাপ রে, বিরাট কমপ্লিমেন্ট দিয়ে দিলে। জানতামই না। আচ্ছা, এবার ঘুমাই। তুমি জেগে থাকলে জাগো।”

আমি শুয়ে পড়লাম। বউ কফি মাগ রেখে বলল, “শোনো না।”

আমি বললাম, “কী?”

বউ বলল, “আমি যদি তোমাকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরে ঘুমাই তোমার অসুবিধা হবে? আমার না ভয় লাগে এত বাজ পড়লে।”

আমি মাথায় হাত দিলাম।

এ কী আজব সমস্যা হল!

৪২ অমৃত

আত্রেয়ীকে আমি ভালোবাসি।

আত্রেয়ীকে আমার স্বপ্নে দেখতে ভালো লাগে।

এই যেমন আজকে ভোরের স্বপ্ন দেখলাম, আমার খুব জ্বর হয়েছে। আত্রেয়ী আমাকে ওর বাড়িতে নিয়ে গেছে। সারাদিন এক্কেবারে সুচিত্রা সেনের মতো আমার মাথার কাছে বসে আমার সেবা করে যাচ্ছে। ওর বাবা একবার এসে বললেন, "কী রে মা, ঠাকুর দেখতে যাবি না?"

আত্রেয়ী সুজয়দা পুচকির অ্যাডের পুচকির দাদার মতো করে বলল, "তোমরা যাও। আমি থাকি।"

এসব কথা তো বলতে ইচ্ছা করে নাকি? কিন্তু সেটা ভোর ছটা হলে তো বলা সম্ভব না। মেয়েটার স্কুল থাকে। বাড়িতে একগাদা কাজ থাকে।

তবু হোয়াটসঅ্যাপ করে দিলাম। দেখলে ভালো।

বাবা ভোরে উঠে প্রাণায়াম করে। আমি বসার ঘরে গিয়ে দেখলাম কপালভাতি করছে। আমাকে দেখে থামিয়ে বলল, "কী রে, এত সকালে উঠে পড়লি যে? অন্য দিন তো আটটার আগে নামগন্ধ পাই না!"

আমি বললাম, "এমনি, ইচ্ছা হল, উঠে পড়লাম।"

বাবা বলল, “অ। আচ্ছা শোন না, বলছি তোর কখন ইচ্ছা বিয়ে করার? শীতে না গরমে?”

আমি বললাম, “যখন খুশি।”

বাবা বলল, “শীতেই ভালো। লোক খাইয়ে সুখ আছে। গরমকালে গাড়োলে বিয়ে করে। তোর দাদা এক গাড়ল। গরমে বিয়ে করল। পাত্র ঘামছে, পাত্রী ঘামছে, পুরোহিত ঘামছে, বরযাত্রী ঘামছে, কন্যাযাত্রী ঘামছে, সবাই ঘেমো হয়ে বসে আছে। লোকে খাসি খেতে খেতে ঘামছে, অবিশ্যি ছাড়ছে না কেউই। বেশ একটা ইয়ে ব্যাপার।”

আমি বললাম, “আমার ওরকম বিয়ে করার ইচ্ছা নেই বাবা। ছোটোখাটো প্রোগ্রাম হোক। অত লোককে খাওয়ানোর কোনও দরকার নেই।”

বাবা অবাক হয়ে বলল, “মানে?”

আমি বললাম, “দু বাড়ি থেকে একটা কমন রিসেপশন হোক, সেখানে সবাই এসে খেয়ে যাক। অতগুলো টাকা নষ্ট করার কোনও দরকার নেই।”

বাবা বলল, “তোর কাছে আমি টাকা চেয়েছি? আর কে বলেছে এসব? আত্রেয়ী?”

আমি বললাম, "না না, ও তো বলেই দিয়েছে আমরা যা ঠিক করব ও তাতেই রাজি। কিন্তু আমার মনে হয় বিয়েতে এত টাকা অপচয় করার কোনও যৌক্তিকতা নেই।"

বাবা বলল, "বেশ তো, তাহলে ওর বাবার সঙ্গে কথা বল। দু পক্ষ রাজি থাকলে তো অসুবিধা হবার কথা না। কিন্তু আত্মীয়স্বজনরা যদি উলটোপালটা বলে তাহলে তুই সামলাবি তো?"

আমি বললাম, "ওদের কাজই তো উলটোপালটা বলা। ওদের তুমি আটকাতে পারবে? পৃথিবীর সেরা রান্না হলেও ওরা ঠিক কোনও না কোনও খুঁত খুঁজে বের করবে।"

বাবা বলল, "সেটা তুই ঠিকই বলেছিস। মন্দ না প্রস্তাব তোর। আচ্ছা তোর দাদার সঙ্গে আলোচনা করে নি।"

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, "এটা নিয়ে দাদা আবার কী বলবে? দাদার বিয়ে না আমার?"

বাবা বলল, "দাদা তোর বড়ো না? ওরও একটা মতামত আছে তো নাকি? ওরা যদি বলে, না মানব না, যা হবে ধুমধাম করেই হবে, তখন সেভাবেই করতে হবে। আমি গৃহে অশান্তি চাই না।"

আমি গোঁজ হয়ে বসে রইলাম।

বাবা বলল, "শোন না, বউমার নাম্বারটা দিবি। কথা বলব। কথা বলা দরকার। তোর মা নেই তো, আমাকে তো সব দিক সামলাতে হবে। গয়না কেনার কথা ভেবেছিস কিছু?"

আমি বললাম, "আমি কিছুই ভাবিনি। আমি তো মিনিমালিস্টিক বিয়ের কথাই বলে আসছি বরাবর। নিজেরা নিজেরা বিয়ে হবে, গুচ্ছ লোককে ডেকে গেলাবার কোনও যৌক্তিকতা পাই না আমি।"

বাবা বলল, "এই তোর সমস্যা, একটা জিনিস নিয়ে বলতে থাকলে আর সেই লুপ থেকে বেরোতে পারবি না। আমি সেটা বলেছি তোকে? মিনিমালিস্টিক করে হেদিয়ে মরছিস! শোন, তোর মা তোর বউয়ের জন্য যে গয়নাগুলো রেখে গেছে, সেগুলো আত্রেয়ীকে দেখা, ওর যদি পছন্দ হয় সেগুলোই থাকুক, নইলে আবার নতুন করে কিছু বানানো যাবে। নিমন্ত্রিতদের তালিকা বানাতে হবে, পিওর বাঙালি ফুড না মোগলাই খাবার হবে সব হিসেব করতে হবে, ওরে বাবা কত কাজ, ভাবতেই মাথা ঘুরাচ্ছে, এই তুই আমাকে নোটপ্যাডটা আর পেনটা দে তো। লিস্ট করতে শুরু করি এখন থেকেই। কী চাপ, কী চাপ!"

বাবা সিরিয়াস হয়ে গেল।

যাহ্, কী থেকে কোথায় চলে গেল! আমি রেগেমেগে বসে রইলাম।

৪৩ আত্রেয়ী

অনিন্দিতাদি সারারাত জেগে বসেছিল। আমি ওর সঙ্গে কথা বলতে গেছিলাম। আমায় বলল, "তুই ঘুমা। জাগতে হবে না। একটা রাত দে। আমি ঠিক হয়ে যাব।"

অনিরুদ্ধদা ওর ফোনে বেশ কয়েকবার ফোন করেছে। সম্ভবত বাড়িতে ফোন করে জানতে পেরেছে অনিন্দিতাদি বেরিয়ে গেছে, সে কারণেই ফোন করেছে।

মজার ব্যাপারটা হল, এর মধ্যে আমাকেও ফোন করেছে। আমি ধরিনি আর। মেসেজ করে বলেছে, "প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন। সিঙ্গল হবার কী কষ্ট কী করে বোঝাই? আমরা কি বন্ধু হতে পারি না?"

দেখে আমার মাথায় রক্ত উঠে গেছে। তবু অনিন্দিতাদিকে বলিনি। বলে লাভ নেই। অনিন্দিতাদি যা বোঝার বুঝে গেছে।

আমার অবশ্য একটা সময় পরে মনে হচ্ছে অনিরুদ্ধদা মানসিকভাবে অসুস্থ। নইলে একটা মানুষ এরকম করবে কেন? ঘরে বউ আছে অথচ অন্য একটা মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলেছে, আবার অন্য একটা নাম্বার পেলে তার সঙ্গেও শুরু করে দিচ্ছে,

এরকম মানুষেরা আসলে কি মারাত্মক একাকিত্বে ভোগে? না কোনও রোগ! এগুলো কেমন রোগ? একটা সংসার, একটা মেয়ের জীবন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

ঘুম থেকে উঠে দেখলাম অনিন্দিতাদি বাথরুমে কল ছেড়ে দরজা বন্ধ করেছে। সম্ভবত কল ছেড়ে রেখে কাঁদছে যাতে কান্নার শব্দ না বেরোয়।

বাইরের ঘরে গেলাম। বাবা খবরের কাগজ পড়ছিল। আমায় দেখে বলল, "ঠিক আছে অনিন্দিতা এখন?"

আমি মাথা নাড়লাম।

বাবা বলল, "আমাকে কি এবার বলা যাবে কী হয়েছে?"

আমি বললাম, "সাংসারিক সমস্যা। মিটে যাবে হয়তো। নাও মিটতে পারে। কেন, এখানে থাকলে কি তোমার অসুবিধা আছে?"

আমার গলাটা খানিকটা রূঢ় শোনাল, বলে নিজেই বুঝতে পারলাম।

বাবা অবাক হয়ে বলল, "আমার কী অসুবিধা? তোর কী হয়েছে সেটা বল তো! অমৃতর সঙ্গে আবার ঝগড়া করেছিস নাকি?"

আমার লজ্জা পেয়ে গেল। বললাম, "না। ওসব কেন করতে যাব?"

বাবা বলল, "সে করতেই পারিস। সব সম্পর্কেই একটু আধটু মন কষাকষি, মতের অমিল না থাকলে সে সম্পর্কটাকে সুস্থ সম্পর্ক বলা চলে না।"

আমি বললাম, "না সেসব কিছু না। আমি ওরকম ঝগড়াটে বলে তোমার মনে হলই বা কেন?"

বাবা হেসে ফেলল, "তুই ঝগড়ুটে না?"

আমি রেগে গেলাম, "আমি ঝগড়াটে? তোমার মনে হয় এটা?"

বাবা বলল, "না না। একবারেই না। তুই একবারেই ঝগড়াটে না। মাঝে মাঝে শুধু একটু মাথা গরম করে ফেলিস এই আর কি!"

আমি বললাম, "সে তুমিও করো। সবাই করে। তাতে কেউ ঝগড়াটে হয় না।"

বাবা বলল, "তাহলে কি অমৃত ঝগড়াটে?"

আমি বললাম, “উফ, তুমি কেন এসব কথা বলছ বল তো? আমার অস্বস্তি হচ্ছে এসব শুনলে। দেখছ একজন মহিলা একটা ক্রাইসিসের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। সেটার সলিউশন বেরোক অ্যাটলিস্ট, তারপর নাহয় তুমি এসব কথা বলো।”

বাবা এবার সিরিয়াস হল, “তা ঠিক, আচ্ছা আমি কি কিছু করতে পারি? বলা যায় আমায়?”

আমি বললাম, “এখনই কিছু না। তবে সেরকম কিছু সমস্যা হলে বলব। অনিন্দিতাদি থাকবে হয়তো কদিন।”

বাবা বলল, “তা থাকুক। কী বাজার করব জানিয়ে দিস। খাওয়াদাওয়াটা ঠিক করে করে যেন। আজকাল আধুনিক যুগে মানুষের সমস্যাগুলো, মানসিক টানাপোড়েনগুলিও বড়ো অদ্ভুত হয়ে গেছে। আমাদের সময় এত জটিলতা ছিল না। টেকনোলজির যত আপগ্রেডেশন হবে, মানুষের সমস্যাগুলিও তেমনি এক-এক রকম ভাবে পালটাতে থাকবে। আমাদের সময় কী ছিল, টাইপরাইটার ছিল। ল্যান্ডলাইন ছিল, মোবাইল ছিল না। তখন মানুষের চলাফেরা একভাবে ছিল। এখন দেখ, মোবাইল আসার পরে সব কিছুই কেমন দ্রুত পালটে যাচ্ছে। এটা হবে। সমস্যা বাড়বে। এর সলিউশন খুঁজতে আমাদেরকেও পালটাতে হবে। নইলে সমূহ বিপদ। যাক গে, তোরা দুজনেই স্কুলে যাবি তো?”

আমি বললাম, “যাব। তাও একবার কথা বলে আসি।”

বাবা বলল, “ঠিক আছে। সেভাবে রান্না করতে বলে দিচ্ছি তবে। নিজের খেয়াল রাখিস মা। সবাইকে ভালো রাখতে গিয়ে নিজে অসুস্থ হয়ে পড়িস না।”

বাবার গলাটা হঠাৎ নরম হয়ে গেল।

আমার কেন জানি না খুব কান্না পেল।

৪৪ জীমূতবাহন

সকাল আটটা। বৃষ্টি কমলেও কুয়াশা আছে।

বউ পুরো বাচ্চাদের মতো ঘুমাচ্ছে।

সারারাত ওভাবেই ঘুমিয়েছে। আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল। কোনও মেয়ে এভাবে কোনও দিন আমাকে জড়িয়ে ধরেনি। আমার যা সমস্যা হবার সেগুলো হচ্ছিল।

যখন বুঝলাম ঘুমিয়ে পড়েছে, সোজা হয়ে ওকে সরাতে গেলাম। সরল না। উলটে আরও বেশি করে জড়িয়ে ধরে বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে ঘুমাল। বহুকষ্টে সামলাতে হল নিজেকে।

চিরকাল মেয়েদের থেকে দূরে থাকা ছেলেদের এভাবে নিজেকে সংযত রাখা যে কতটা চাপের, সেটা যার হয়, সে ভালো বুঝতে পারে। আর আমি তো বরাবর "আমাকে কেউ ভালোবাসে না আর আমাকে কেউ দেয় না" ক্লাবের প্রেসিডেন্ট। আমার মতো পাবলিককে কোনও মেয়ে জড়িয়ে ধরলে কী হতে পারে সেটা আমি ছাড়া কে বুঝবে?

আমার ঘুম পরে এল। সকালে ঘুম ভাঙার পরও বউ জড়িয়ে ঘুমাচ্ছিল, তবে এবার ওকে সরিয়ে উঠতে পারলাম।

বাথরুম সেরে এসে জানলা খুলে বাইরেটা দেখে জানলাটা আবার বন্ধ করে দিলাম। শীতে চা খেতে ইচ্ছা করছিল। রুম সার্ভিসে বলতে দু কাপ চা দিয়ে গেল।

বউকে ঠেললাম। বউ বিরক্তিমাখা গলায় বলল, "কী হয়েছে?"

আমি বললাম, "চা খাবে?"

বউ বলল, "দাও। খাই।"

আমি চায়ের কাপ দিলাম। বউ খাটে উঠে বসে চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, "আহ, কী ভালো লাগছে! এই, বেরোই চলো।"

আমি বললাম, "কোথায় যাবে?"

বউ বলল, "সাইট সিয়িং করে আসি? সারাদিন ঘরে বসে থাকব নাকি কালিম্পঙের মতো? বৃষ্টি পড়ছে না তো, চলো চলো।"

আমি বললাম, "বাহ, এই তো রামের সুমতি হয়েছে। ঠিক আছে চলো।"

বউ বলল, "ড্রাইভারটাকে ফোন করো। চলো ঘুরে আসি।"

আমি ড্রাইভারকে ফোন করলাম। জানাল নটায় আসবে। বউকে বলতে বউ বলল, "ঠিক আছে, আমি স্নান সেরে আসি।"

আমি বললাম, "তুমি কাল স্নান করোনি, না?"

বউ হাই তুলে বলল, "ভুলে গেছিলাম। শীতে রোজ স্নান করলে ঠাকুর পাপ দেয় জানো না?"

আমি বললাম, "তাই নাকি? কোন ঠাকুর? তোমায় কানে কানে বলে দিয়ে গেছেন বুঝি?"

বউ ফিক ফিক করে হাসতে হাসতে বলল, "হ্যাঁ তো, বলে গেছে। এই, তুমি বড্ড নিয়ম মেনে চলো নাকি? রোজ স্নান করো, সব খাবার ঠিক সময়ে খাও?"

আমি বললাম, "অত ভাবিনি। নিয়ম মানামানির কিছু নেই। সময় নষ্ট করার সময় ছিল না তো কোনও দিন।"

বউ বলল, "কেন ছিল না? চিরকাল দৌড়ে বেরিয়েছ? অমলকান্তিকে দেখবে, কত রাত জেগে জেগে লেখে।"

আমি বললাম, "ওরা তো অসাধারণ মানুষ সবাই, অমলকান্তি, কিংবা তোমার অনিরুদ্ধ। আমি ওরকম নই। আমি সাধারণ মানুষ। আমার বাড়ি সামলানো আছে, কর্তব্য আছে, রোজগার না করলে বাড়ি কে সামলাবে আমার? সব হিসেব করে না চললে আমার চলবে না।"

বউ বুঝদারের মতো মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, "বুঝেছি, তুমি হলে কাঠখোট্টা আনরোম্যান্টিক একজন মানুষ, তাই তো?"

আমি হাসলাম, "না, আমি তাও নই। আমি হলাম ক্রাউড। ভিড় দ্যাখো না সিনেমায়, যারা রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে হিরো হিরোইনের নাচ দ্যাখে? আমি হলাম সেই ভিড়, হিরো হিরোইন তো তোমরা। আমি তোমাদের দেখি। মাঝে মাঝে আমাকেও সিনেমায় নামিয়ে

দেয়, তখন হয়ে যায় সমস্যা। ঠিক শেখানো বুলি আউড়াতে পারি না, যেমন চাও তেমন করতে পারি না, তখন সমস্যা হয়ে যায়। তোমার যেমন আমাকে নিয়ে হচ্ছে। ভেবেছিলে ভেড়া টাইপ বর হবে, যা বলবে সেভাবে চলবে। চলছি না দেখে সমস্যায় পড়ে গেলে।"

বউ চোখ মুখ কুঁচকে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি কি আমাকে সেন্টু দিতে চাইছ? যদি দিতে চাও, লাভ নেই, আমি সেন্টু খাই না।"

আমি বললাম, "খেয়ো না। রেডি হও, বেরোই।"

বউ বলল, "ঠিক আছে। আমি স্নানে যাচ্ছি।"

বউ চায়ের কাপ রেখে বাথরুমে ঢুকে গেল। আমি কিছুক্ষণ বসে থেকে টিভি চালালাম।

আধঘণ্টা পর বাথরুম থেকে টাওয়েল জড়িয়ে বেরোল বউ। আমাকে বলল, "ওহ, তুমি আছ, না? ভুলে গেছিলাম। ওকে, তুমি চোখ বন্ধ করো, আমি চেঞ্জ করব।"

আমি বললাম, "চেঞ্জ করবে? এখানে? বাথরুমে করো! আর চোখ বন্ধ করা যায় নাকি ওভাবে?"

বউ বলল, "করবে না? ওকে। দেখো।"

বউ টাওয়েল খুলে দিল।

আমি “ওরে বাবা রে” বলে চোখ বন্ধ করলাম।

বউ বলল, “চোখ পিটপিট করে দেখবে না?”

আমি বললাম, “না দেখব না।”

বউ বলল, “ভালো করে বললাম, শুনলে না। এখন বসে থাকো এভাবে। আমি বললে তবে চোখ খুলবে।”

আমি বসে বসে শীতের মধ্যেও ঘামতে লাগলাম।

এ কেমন মেয়ে!

এসব তো সিনেমায় দেখতাম রে ভাই!

৪৫ অনিরুদ্ধ

কোম্পানির দেওয়া ফ্ল্যাটে বাথরুমে একটা বিরাট আয়না আছে। আমি সেটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

আমি কি খুব খারাপ লোক?

খারাপের সংজ্ঞা কী রকম?

মানুষ একই সঙ্গে দুজন কিংবা তার বেশি কাউকে ভালোবাসতে পারে না? প্রতিটা পুরুষ বন্ধু তার মেয়ে বন্ধুটির সঙ্গে একটা রাতও শুতে চায়নি বা তাকে ভেবে হস্তমৈথুন করেনি এটা আমাকে বোঝাতে এলে সে পশ্চাৎদেশে লাথি খাবে।

পুরুষ কী রকম, তা আমি জানি। আমার থেকে ভালো কেউ জানে না।

পুরুষ মাত্রেই বহুগামী। কেউ স্বীকার করে, কেউ করে না।

প্রতিটা পুরুষ বউয়ের সঙ্গে সংগমের সময় অন্য কোনও নারীকে ভাবে। প্রথমে ভাবে না, পরে ভাবে। ভাবতে বাধ্য। জীবনে একঘেয়েমির কোনও জায়গা নেই।

আমি ঋতুজাকে ভালোবেসেছি। আবার অনিন্দিতাকে ভালোবেসেছি বলেই তো সে প্রেগন্যান্ট হয়েছিল।

এবার একই দিনে দুজনই আমার থেকে দূরে চলে যাবে এটা আমি ভাবিনি।

অবশ্য এটা সম্ভব হয়েছে ঋতুজার বর ওকে আগলাচ্ছে বলে। ঋতুজা তো সরাসরি কিছু বলেনি। বলবেও না। ও আমাকে ছাড়া আর কাউকে ভালোবাসতে পারবে না। আর অনিন্দিতা যদি বাচ্চাটা নষ্ট করে দেয়, তাহলে দিক। ওকে আমি এখনও অতটা ভালোবাসতে পারিনি। বাচ্চার বাবা যদি কারও হতে হয়, তাহলে ঋতুজার বাচ্চার বাবা হব।

সেলফ কন্ট্রাডিক্টরি শোনাচ্ছে? এক জায়গায় বলছি অনিন্দিতাকে ভালোবাসি, আর-এক জায়গায় বলছি অতটাও ভালোবাসি না? হ্যাঁ, আমি এরকমই। ভালোবাসার রকমফের থাকবে তো! নইলে মানুষ আর কুকুরে তফাত হবে কী করে?

মা ফোন করে জানাল অনিন্দিতা বেরিয়ে গেছে, আমি বুঝলাম কোনও একটা জায়গা থেকে ঋতুজার ব্যাপারে জানতে পেরেছে।

তা জানুক, ক্ষতি নেই। অনিন্দিতাকে আমি হিসেবের মধ্যে ধরিওনি কোনও দিন।

আমার মাথায় ঋতুজার নামটাই ঘুরছে। আর ওর বরেরও। আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার যখন করেছে, এত সহজে ওকে আমি ছেড়ে দেব না। কলকাতায় কামড়ে দেওয়ার জন্য

অনেক ভাড়াটে কুকুর পাওয়া যায় যাদের টাকা দিয়ে অবলীলায় আমার কাজে লাগানো যাবে। কত বড়ো সাহস! আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে। ওর যে কী হাল করব, আমার মাথায় আগুন চড়ে যাচ্ছে মাঝে মাঝেই।

অফিস থেকে ছুটি নিয়েছি দুদিন। আগে অনিন্দিতার কাছে যেতে হবে। পালস বুঝতে হবে। স্বাভাবিকভাবেই প্রচুর রেগে থাকবে। দাঁড়িপাল্লায় সেন্টিমেন্টের জায়গায় পর্যাপ্ত সেন্টিমেন্ট চড়াতে হবে যাতে রাগটা কমে। বোঝাতে হবে ঋতুজা পাস্ট। তুমিই ফিউচার। দরকার হলে ঋতুজার চরিত্র খারাপ করে দিতে হবে। অনিন্দিতাকে মাথায় তুলতে হবে। একটা বিয়ের সার্টিফিকেট আজকাল মেয়েদের অনেক সুবিধে করে দিয়েছে। অনিন্দিতা সে সুবিধাটা পাবে। আমার চাকরি পর্যন্ত চলে যেতে পারে। তাই এই জায়গাটা আগে মেরামত করে নি। তারপর কুকুর ধরতে হবে। ঋতুজার বরকে আমি পায়ের তলায় না আনলে নাম পালটে নাম রাখব। কত বড়ো সাহস ওর, আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে। ওর যে কী করতে পারি, সে সম্পর্কে ওর কোনও ধারণা নেই।

গাড়ি এসেছে, স্টেশনে যাওয়ার। গাড়িতে উঠে শহরটাকে দেখছিলাম। প্রতিটা শহর একরকম হয়, আর যেখানে যত বেশি লোক থাকে, সেখানে তত বেশি কেচ্ছা জন্মায় প্রতিটা কোণে। একটা মেয়ে কাল আমায় ফোন করেছিল। মেয়েটাকে মেসেজ করেছি। জাল পেতে যেতে হবে প্রতিটা মুহূর্তে, প্রতিটা সময়ে। যে মাছ উঠবে, সে মাছটাকেই ভেজে খেতে হবে।

পুরুষ মাত্রেই পলিগ্যামাস। এটা যারা বোঝে না, তারা বোকা।

ঋতুজা বোঝে, ঋতুজা বুদ্ধিমতী। আমি জানি, ওর বরের থেকে ও ঠিক বেরিয়ে যাবে একদিন, পৃথিবীর কোনও মানুষ আমার কাছে আসা থেকে ওকে আটকাতে পারবে না। আমি ঠিক করেছি এখন আর ঋতুজার সঙ্গে যোগাযোগ করব না। ফিরুক কলকাতায়। আমি নিশ্চিত, ঋতুজা আমাকে ফোন করবেই।

করবেই।

না করে যাবে কোথায়?

৪৬ আত্রেয়ী

ডাক্তার চৌধুরীকে অনিন্দিতাদি দেখায়। ওঁর চেম্বারে ওকে বসে থাকতে দেখে কষ্ট হচ্ছিল খুব। কেমন ভেঙে পড়া চেহারা।

আমি হাত ধরে ছিলাম। অনিন্দিতাদি বলল, "তুই স্কুলটা খামোখা গেলি না আজ আমার জন্য। ঠিক করলি না আত্রেয়ী।"

আমি বললাম, "এই কথাটা বারবার কেন বলছ বলো তো? এভাবে বোলো না। আমার দিদি থাকলে আমি কী করতাম? একা রেখে চলে যেতাম?"

অনিন্দিতাদি বলল, "আচ্ছা। বলব না। কিন্তু নিজের কেরিয়ারটা পরের জন্য..."

আমি অনিন্দিতাদির হাতে আলতো করে চিমটি কেটে বললাম, "এর বেশি বললে আমি খামচানো শুরু করব কিন্তু। আমার নখ ডেঞ্জারাস।"

অনিন্দিতাদি এত দুঃখেও হাসল। বলল, "আচ্ছা বলব না।"

ডাক্তারবাবু অনিন্দিতাকে দেখে চিনলেন। হাসিমুখে বললেন, "ভালো তো সব?"

অনিন্দিতাদি আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "বাইরে বসবি?"

আমি বুঝলাম অনিন্দিতাদি আমার সামনে কথা বলতে চাইছে না। আমি মাথা নাড়লাম, "ঠিক আছে। বসছি।"

বাইরে অনেকগুলো কৌতূহলী চোখ আমায় দেখছিল। স্বাভাবিক, এভাবে চেম্বারে ঢুকে কজন বেরোয়! কিন্তু অনিন্দিতাদির যা মানসিক অবস্থা, কিছু মনে করার জায়গাতেই কেউ থাকবে না।

আমি চুপ করে বসে মোবাইল ঘাঁটতে লাগলাম। অমৃত মেসেজ করেছে একগাদা। অনিরুদ্ধদাকে মেসেজ করেছিলাম বলে বেশ রেগে ছিল। এখন আবার সরি বলে যাচ্ছে। পাগল একটা। হাসি পেলেও হাসলাম না, ওকে একটা অ্যাংরি ইমোজি পাঠিয়ে লিখলাম, "অফিস করো। বিয়ের আগেই চাকরিটা যাবে মনে হচ্ছে তোমার।"

অমৃত লিখল, "বেশ তো, বউয়ের টাকায় খাব। আমার কোনও চাপ নেই।"

আমি লিখলাম, "আচ্ছা খেয়ো, আমি অনিন্দিতাদির সঙ্গে এসেছি, পরে মেসেজ করছি।"

অমৃত লিখল, "তুমি বেশি জড়িয়ে যাচ্ছ না তো?"

এই এক সমস্যা ওভার পজেসিভনেসের। মাঝে মাঝে মনে হয় গলা টিপে ধরছে। আমি লিখলাম, "না, জড়ানোর কিছু নেই। তোমার কোনও কলিগের কিছু হলে তুমি হেল্প করতে না?"

অমৃত লিখল, "তা ঠিক। আচ্ছা টেক কেয়ার।"

আমি হাঁফ ছেড়ে ফোনটা রাখলাম। অমৃতর কোনও কোনও ব্যাপার আমাকে বিরক্তও করে এটা কি ওকে বলা ঠিক? ভাবছিলাম। এটা হয়তো প্রেমের শুরুতে হয়।

উথালপাতাল ভাব। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ম্যাচিওরিটি আসবে কোনও দিন নিশ্চয়ই। নইলে তো বড়ো ঝামেলা! কোথায় যাব, কী করব, সব কিছুর যদি জবাবদিহি করতে হয় তাহলে বড়ো সমস্যা হয়।

অনিন্দিতাদি মিনিট পনেরো পরে বেরোল।

চোখে মুখে অস্বস্তিটা বোঝা যাচ্ছিল।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। বাইরে বেরিয়ে বললাম, "কী হল?"

অনিন্দিতাদি বলল, "তুই কিছু মনে করিসনি তো? আমার যে কী হল, তুই সবই জানিস, তবু তোকে বাইরে দাঁড়াতে বলে দিলাম।"

আমি বললাম, "ধুস, সেটা তো বুঝেছি। অস্বস্তি হলে কী করবে? তোমার জায়গায় আমি থাকলেও একই ব্যাপার করতাম হয়তো। তুমি কথা বলে স্যাটিসফায়েড তো?"

অনিন্দিতাদি বলল, "হুঁ, ডক্টর চৌধুরী খুব রেগে গেলেন। অ্যাবরশন এখন করানো যাবেই না বলছেন। আর করা গেলেও উনি অন্তত করবেন না।"

আমি বললাম, "সে কী? তাহলে কী করবে?"

অনিন্দিতাদি দিশেহারা মুখে বলল, “ওর বাচ্চা আমি রাখব না আত্রেয়ী। আমি ওকে সামনে দেখলে সহ্য করতে পারব না বিশ্বাস কর। একটা মানুষ সব বিশ্বাস এভাবে ভেঙে চলে যাবে আমি কিছুতেই মানতে পারছি না। ওই লোকটা আমার সঙ্গে শুয়েছে, আমার বাচ্চার বাবা হবে, এসব ভাবলেই আমার কেমন যেন হচ্ছে।”

আমি বললাম, “ঠিক আছে, একটা কাজ করি চলো, একটা কাফে আছে এখানে, কফি খাই। দুজনে অন্য কথা বলি। তুমি রিসেন্ট কী কী বই পড়েছ সেসব আলোচনা করি। করবে?”

অনিন্দিতাদি বলল, “কফি খাব? আচ্ছা, চ।”

দুজনে মিলে কাফেটায় গিয়ে বসলাম। দুটো কফি অর্ডার করে বললাম, “বলো দেখি, কী বই পড়লে?”

অনিন্দিতাদি কয়েক সেকেন্ড আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কেঁদে ফেলে বলল, “মনে পড়ছে না বিশ্বাস কর।”

৪৭ কপালকুণ্ডলা

বাড়ির আবহাওয়া ভালো নেই। বাবা আজকাল আমার সঙ্গে ঠিক করে কথা বলে না। মাও ঠারেঠোরে বোঝায় এত বড়ো মেয়েকে বেশিদিন টানা যায় না।

আমি চাপ নিই না।

চাপ নেওয়ার কোনও কারণ খুঁজে পাই না। আল বাল ছাল লোকের সঙ্গে বিয়ে করে লাইফের মা মাটি মানুষ করার থেকে জীবনেও বিয়ে না করা অনেক ভালো।

বিয়ে করলে নিজের পছন্দের ছেলের সঙ্গেই করব, নইলে করব না।

মেলার মাঠে সার্কাস এসেছে, দেখতে যাব ভাবছি। কাউকে পাই না।

আমার নবকুমারটাও হয়েছে তেমনি। মুখের দিকে তাকাতেই তার সাহস হয়ে ওঠে না। যেন নতুন বউ। তাও অ্যারেঞ্জড ম্যারেজে।

ফুলশয্যায় দুধ নিয়ে এসেছে!

এর মধ্যে অবশ্য একটা কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলেছি।

তার জন্য সদুজ্যাঠাই দায়ী। এই তো, গত পরশুর কথা।

নবকুমার দোকান থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরের দিকে রওনা দিয়েছে, আমি ক্যাশে বসে মন দিয়ে তার যাওয়া দেখছি, এমন সময় সদুজ্যাঠা আমার পাশে এসে ফিসফিস করে বলল, "শুধু যাওয়াটা দেখছিস? জীবনে যদি কিছু করতে চাস, তাহলে সাইকেলটা নিয়ে যা। নিজে ঠিক কর, কী করবি।"

কথাগুলো যেন যাত্রাদলের বিবেকের মতো বলল সদুজ্যাঠা।

আমারও যে কী হল, সাইকেলটা নিয়ে জোরে চালিয়ে একদম নবকুমারকে পিছন থেকে দুম করে মেরে দিলাম। নবকুমার ছিটকে পড়ল রাস্তায়। আমিও পড়লাম।

আশপাশের বাড়ির কাকিমারা, যারা আড্ডা মারছিল সব হইহই করে ছুটে এল।

সবাই আমাকে আর নবকুমারকে রাস্তা থেকে ধরে তুলল।

আমার ভীষণ লজ্জা লাগছিল, নবকুমারের দিকে একবারও তাকাইনি।

এক কাকিমা বলল, "কী রে কপাল, তুই দেখতে পাস না? চোখে ন্যাবা হয়েছে?"

নবকুমারের মুখ আড়চোখে দেখলাম। রেগে গেছে বোঝা যাচ্ছে। আমি বললাম, "আমার যে কী হল, মনে হল মাথাটা ঘুরে গেল।"

কাকিমাদের দঙ্গলে সবাই গালে হাত দিল, বলল, "সে কী রে, তোর মাথা ঘুরাল কেন? কী হয়েছে তোর?"

আমি বুঝলাম এরা অন্য মানে বের করার চেষ্টায় আছে, তাতে প্রেস্টিজে গ্যামাক্সিন হতে পারে। আমি তাড়াতাড়ি সাইকেলটা তুলে "আমি আসছি পরে কথা হবে" বলে জোরে প্যাডেলে চাপ দিয়ে ধাঁ হয়ে গেলাম। দোকানে হাঁফাতে হাঁফাতে ঢুকতেই সদুজ্যাঠার সামনে পড়লাম। আগ্রহী গলায় সদুজ্যাঠা বলল, "কী রে কিছু পারলি বলতে?"

আমি দাঁত খিঁচিয়ে বললাম, "আমি কী বলব? মাঝখান দিয়ে সাইকেল দিয়ে গুঁতিয়ে দিয়েছি।"

সদুজ্যাঠা অবাক গলায় বলল, "সে কী রে? গুঁতিয়ে দিয়েছিস মানে?"

আমি চারদিকে তাকিয়ে গলা নামিয়ে বললাম, "সাইকেল দিয়ে ধাক্কা লেগে গেছে। কী করব বুঝতে না পেরে টেনশনে এই হাল হয়ে গেল।"

সদুজ্যাঠা মাথায় হাত দিয়ে বলল, "হা ঈশ্বর, তোর দ্বারা যদি কিছু হত! শেষে এই কেলোর কীর্তি করলি?"

আমি বললাম, "তুমি বলতে গেলে কেন? আমি তো দিব্যি এখানে বসেই ভালো ছিলাম।"

সদুজ্যাঠা বলল, "তো কী করব? নিজে একা একা গুমরে গুমরে মরিস! আমি এত হেল্প করি তাও কোনও লাভ হচ্ছে না। মনে হচ্ছে তোর বাবাকেই বলতে হবে।"

আমি হাঁ হাঁ করে উঠলাম, "একদম না, অনেক উপকার করেছ, আর করতে হবে না। বাবাকে বলার প্রয়োজন নেই।"

সদুজ্যাঠা ফিক ফিক করে হাসছিল।

কালকেও ক্যাশে বসে ছিলাম। নবকুমার খেতে এসেছিল ঠিকই, কিন্তু আমাকে দেখে এমন একটা দৃষ্টি দিল যে বুঝলাম হেবি রেগে আছে।

আমি রাগতে গিয়েও খুশি হলাম।

যাক, রাগ হোক, দুঃখ হোক, কষ্ট হোক, কিছুতে তো আমাকে মনে রাখছে। নইলে এতদিন তো ঠিক করে তাকাতও না।

আমার খুব ইচ্ছে করে জানতে, নবকুমার ঘরে গিয়ে কী করে। সেই যে ঘরে গিয়ে ঢোকে, আর তো বেরোয়ও না। কী করতে পারে? টিভি দ্যাখে? টিভিতে কী দ্যাখে?

ঘরে একটা সিসিটিভি বসাতে পারলে ভালো হত। সারাদিন ধরে নবকুমারকে দেখা যেত।

এর মধ্যে একটা খবরে মাথা গরম হয়ে গেল।

সাঁপুইদের ছেলে নাকি বাড়িতে জানিয়েছে, বিয়ে করলে আমাকেই করবে, নইলে করবে না।

শোনা অবধি মাথা কাজ করছে না।

লোকের ঝাঁট জ্বালালেও যে তাদের ভালো লাগে, জীবনে প্রথম দেখলাম মাইরি!

৪৮ জীমূতবাহন

কোথাও আপনি বেড়াতে যাবেন, আর এলাকার লোকের সঙ্গে দেখা হবে না, এটা হতে পারে না। ট্যুরের মধ্যে কোথাও না কোথাও ঠিক দেখা হয়েই যাবে।

আমাদেরও হল।

রাবংলার বুদ্ধ পার্কে টিকিট কাটছি, বউ কানে কানে বলে দিয়েছে রাত্তিরে আমার সঙ্গে বসে হুইস্কি খাবে, ড্রাইভার বলছে এখানে তাড়াতাড়ি করে নিতে, নামচি যাবার রাস্তার হাল খুব খারাপ, এমন সময় পিঠে একটা থাবড়া এসে পড়ল।

অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখি অভিজিৎদা। আমাদের পাড়াতেই থাকত, পরে দিল্লি চলে যায়। আমাকে দেখেই বলল, "আমি অনেকক্ষণ ধরে দেখে যাচ্ছি, এটা আমাদের জীমূত কি না! তোর সঙ্গে এভাবে দেখা হয়ে যাবে ভাবিনি।"

মেঘ রোদের খেলা চলছে রাবংলায়। বুদ্ধমূর্তিকে ঘিরে ধরে রয়েছে মেঘ। পাশের পাহাড়গুলোতে মেঘ ধাক্কা খেয়ে বৃষ্টি হয়ে পড়ছে। আমার মনে পড়ল অভিজিৎদা খুব ভালো আউটসুইং দিত। তখন প্রথম প্রথম পাড়ার মাঠে ডিউস বলে খেলতে গেছি। অভিজিৎদা একটা ম্যাচে হ্যাটট্রিক করেছিল। পড়াশুনোতেও ভালো ছিল। কলেজ লাইফে সেই যে বাইরে গেল, তারপর খুব কম পাড়ায় আসে।

আমি হাসলাম, "বাহ। আমিও অবাক হলাম তোমায় দেখে। তুমি কোত্থেকে এলে? দিল্লি থেকেই?"

অভিজিৎদা বলল, "না রে আমি এখন মুম্বইতে শিফট করে গেছি। হানিমুনে এসেছি। এই তো বিয়ে করলাম।"

আমি বললাম, "কবে?"

অভিজিৎদার কাছে তারিখটা শুনে অবাক হলাম। একই দিনে আমরা বিয়ে করেছি। অভিজিৎদা আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে বলল, "কী কোইন্সিডেন্স রে ভাই। কোথায় তোর বউ?"

আমি বউকে ডাকলাম। অভিজিৎদাও ওর বউকে ডাকল। বউদি মারাঠি। অভিজিতদা বলল, "শাইনিং বুদ্ধতে উঠেছি। রাত্তিরে চলে আসিস। আড্ডা হবে।"

আমার বউ ফস করে বলে বসল, "রাত্রে তো হবে না। রাত্রে আমাদের হুইস্কি পার্টি আছে।"

অভিজিৎদা আমার বউয়ের দিকে তাকিয়ে হো হো করে হেসে বলল, "বাহ বাহ। দারুণ প্ল্যান তো! তা আমায় তো ডাক্তার হুইস্কি খেতে বারণ করেনি। মীরাকেও করেনি। আচ্ছা থাক, তোমরা প্রাইভেসি চাইলে জোর করব না।"

আমি বললাম, "বিকেলে দেখা যাবে অভিজিৎদা। নামচি থেকে ফিরি আগে। যা অবস্থা!"

অভিজিৎদাবলল, “আচ্ছা। জানাস কিন্তু। আমার কার্ড নে। সিঙ্গল মল্ট খাওয়াব কিন্তু।”

আমি কার্ডটা নিয়ে দাঁত বের করলাম। অভিজিৎদারা বেরিয়ে গেল।

বউ বলল, “আমার কিন্তু লোক একদম ভালো লাগে না।”

আমি বললাম, “আমারও না।”

বউ বলল, “একবারে বারণ করে দিলে পারতে।”

আমি বললাম, “তুমি যা বলেছ তা বারণ করার মতোই হল তো।”

বউ বলল, “তা বটে। আমায় মা আবার শিখিয়ে দিয়েছিল শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে মেয়েদের কম কথা বলতে হয়। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম কেন কম কথা বলতে হয়? এ আবার কী? আমি আমার মতো কথা বলব, কার বাপের কী? শ্বশুরবাড়ি গেছি মানে কি নিজের সব মান সম্মান গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়ে যাব নাকি? বাল।”

আমি বললাম, “এই তুমি খিস্তি মারলে কেন? একটা পবিত্র জায়গায় তুমি খিস্তি মেরে দিলে?”

বউ বলল, "বাল খিস্তি নাকি? কে বলেছে তোমায় বাল খিস্তি? বাল একটা ইমোশন। অবশ্য অনিরুদ্ধও খিস্তি পছন্দ করে না। ও আমাকে খিস্তি মারলে বকে।"

আমার মোবাইলে অনিরুদ্ধর পাঠানো গালাগালগুলো ওকে দেখানোর প্রবল ইচ্ছা দমন করে আমি বললাম, "ঠিক আছে, চলো ঘুরি। জায়গাটা বেশ সুন্দর।"

বউ বলল, "অনিরুদ্ধর নাম শুনলে তুমি কথা ঘোরাও কেন? তোমার হিংসা হয়? আচ্ছা তুমি কি আমাকে ভালোবেসে ফেলেছ?"

হুট করে এই প্রশ্নটার কী উত্তর দেব বুঝতে না পেরে বললাম, "ভালোবাসতে যাব কেন খামোখা? তুমি তো আমাকে ডিভোর্স দিয়ে দেবে।"

বউ বলল, "রাইট। তারপর তুমি একটা শান্তশিষ্ট মেয়ে বিয়ে করবে যার কোনও দিন প্রেম ছিল না। হেবি ভালো মামণি হবে। সে তোমার সব কথা শুনবে, তার কোনও সমস্যা থাকবে না..."

আমি বউকে বাধা দিয়ে বললাম, "বিয়ে করতেই হবে এরকম কোনও মানে নেই। একটা বিয়েতেই যা অভিজ্ঞতা হয়ে গেল, তাতে আবার বিয়ে করার কথা ভাবলেই

আমার অস্বস্তি হচ্ছে। তুমি বরং এসব কথা ছাড়ো। নিজের কথা ভাবো। অনিরুদ্ধকে নিয়ে সংসার করবে তো? কোরো।"

বউ দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, "তুমি কি আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে চাইছ?"

আমি বললাম, "না। এখানে ঝগড়া করার কী আছে? আমাদের মধ্যে সব কথাই তো পরিষ্কার হয়ে গেছে, নতুন কোনও কথা নেই তো আর। আছে নাকি?"

বউ বলল, "তুমি না বহুত ফালতু লোক। কিছু হলেই চ্যাটাং চ্যাটাং কথা শোনাও। আমি একটু ঘুরতে চাইছিলাম, তুমি মুডটা নষ্ট করে দিলে।"

আমি বললাম, "তুমিই বা ওই শুয়োরের বাচ্চাটার নাম নিলে কেন? না নিলে কিছু হত না।"

বউ বলল, "এবার পবিত্র জায়গায় কে গালাগাল দিচ্ছে?"

আমি বললাম, "পবিত্র জায়গায় অপবিত্র নামই বা নিলে কেন?"

বউ হেসে ফেলল, "হিংসুটে। মোমো খাওয়াবে?"

আমি গোঁ গোঁ করতে করতে মোমো স্টলের দিকে গেলাম।

৪৯ আত্রেয়ী

অনিন্দিতাদি বাড়ি ফিরে দুপুরে অল্প খেল। একেবারেই খেতে পারছিল না। জোর করে খাওয়ালাম।

অনিন্দিতাদিকে ঘরে শুইয়ে এসে দেখি বাবা টিভি দেখছে।

আমাকে দেখে বলল, "কী রে, সব ঠিক আছে?"

আমি বসলাম। ক্লান্ত গলায় বললাম, "নাহ। কিছুই ঠিক নেই। পারিবারিক সমস্যায় জেরবার অনিন্দিতাদি।"

বাবা চিন্তিত গলায় বলল, "এই চিন্তাটাই তো থাকে। মেয়ের বাবাদের এই চিন্তাটাই থাকে। বিয়ের আগে, আর বিয়ের পরে অনেক তফাত। যার জন্য সব ছেড়ে কোনও মেয়ে বাড়ি ছাড়ে, দেখা যায় সেই ছেলেটাই সবথেকে বেশি কষ্ট দিল জীবনে। এরকম গাদা গাদা একজ্যাম্পল আছে। আবার এমন একজ্যাম্পলও আছে, দেখতে গম্ভীর কোনও লোক, একেবারেই বোরিং পারসোনালিটি, কিন্তু সে ফ্যামিলি লাইফে চমৎকার। মানুষ চেনা কি এতই সহজ? স্বয়ং রবি ঠাকুরও চিনতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথের বড়ো প্রিয় মেয়ে ছিলেন বেলা। রূপে, গুণে অতুলনীয়। যত্ন করে বড়ো করে তুলেছিলেন।

মেমসাহেব শিক্ষিকা ছিল বেলার। বড়ো আশা করে তিনি বিহারীলাল বাবুর পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক জুড়বেন বলে বিয়ে দিয়েছিলেন। পরিণামে কী হয়েছিল জানিস? সে মেয়ের ক্ষয় রোগে মৃত্যু হয়েছিল। জামাই পছন্দ করত না রবীন্দ্রনাথ মেয়েকে দেখতে আসুন। সম্পর্কের ক্ষেত্রে সব সময় বাবা মা-ই যে ঠিক তাও নয়। সন্তানেরাও ঠিক হতে পারে। আসলে যে-কোনো সম্পর্ক ব্যাপারটাই বড্ড গোলমেলে। কী থেকে যে কী হয়ে যেতে পারে, কেউ জানে না।"

আমি চুপ করে শুনে যাচ্ছিলাম।

বাবা হুট করে বলল, "হ্যাঁ রে, অমৃতর সঙ্গে তোর সব ঠিকঠাক আছে তো?"

আমি বললাম, "কেন বলো তো?"

বাবা বলল, "এমনি বললাম। ঠিক আছে?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ ঠিক আছে।"

বাবা টিভির দিকে তাকিয়ে বলল, "বিয়ের পরে চাকরি নিয়ে ওর কোনও প্রবলেম নেই তো?"

আমি বললাম, “না। কেন হবে প্রবলেম?”

বাবা বলল, “ওই যে তোকে বললাম, মানুষের বিয়ের পর আর বিয়ের আগের চেহারায় অনেক পার্থক্য থাকে। কত উদার লোক বিয়ের পরে বউ পেটায়। কত কিছু দেখলাম। আমাদের পাড়াতেই আছে, দুলুদার ছেলে। ওর বউ অসুস্থ না হয়ে পড়লে কেউ জানতেই পারত না ছেলেটা রেগুলার মদ খেয়ে এসে মেয়েটাকে মারত। অথচ কী সজ্জন চেহারা বল তো?”

আমি বললাম, “তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ কেন? অমৃত ভালো ছেলে। এসব বোলো না দয়া করে।”

বাবা বলল, “আমি ভয় দেখাচ্ছি না রে। বয়স হলে বিভিন্ন চিন্তা এসে মাথার মধ্যে ঘুরতে শুরু করে। আমার তাই হয়েছে। আর কিছু না। তোর মা থাকলে এই চিন্তাগুলো শেয়ার করতাম। এখন তো সেটা সম্ভব না। তাই তোকে বলি। কদিন আর থাকব, যে কদিন আছি, তোকে যেন ভালো দেখে যেতে পারি।”

আমার বুকের মধ্যে একটা কষ্ট দলা পাকিয়ে এল। আমি বললাম, “কী বলছ বলো তো বাবা? তোমার কী হয়েছে? এমন বলছ কেন? আচ্ছা আমায় বলো অমৃতর মধ্যে কি খারাপ কিছু দেখেছ?”

বাবা হাসল এবার, "না না, ধুস, সে সব কিছু না। এগুলো রিটায়ার্ড মানুষের দুঃখবিলাস। আচ্ছা ভাব না, বিয়ের পর তুই যখন থাকবি না, তখন তো আমি একা হয়ে যাব। সেটা ভাবলেও তো কষ্ট লাগে। যখন অফিস করতাম, তখন এসব ভাবতাম না, তোর মার ওপর ছেড়ে দিতাম। এখন বাড়িতে থাকি, তোর মা নেই, স্বাভাবিকভাবেই যত উলটোপালটা চিন্তা এসে মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে। এ সবই ইনসিকিউরিটি থেকে আসে। অমৃত চমৎকার ছেলে। ওর মধ্যে একটা অদ্ভুত চাঞ্চল্য আছে। ও তোকে খারাপ রাখবে না। ওর বাবাও যথেষ্ট সজ্জন মানুষ। ভালো পরিবার। পরিবার ঠিক না থাকলে আমি আপত্তি করতাম বই কি।"

আমি হাঁফ ছাড়লাম, "তুমি ভেবো না। ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স নিয়েও ভেবো না। আমায় কেউ মারলে আমি মার খাবার পাবলিক না, দু ঘা আমিও দিয়ে দেব।"

বাবা বলল, "হ্যাঁ, তা তুই পারবি। ঝাঁসির রানি তো।"

আমি বাবার ভুঁড়িতে ঘুসি মারলাম, "একদম উলটোপালটা ভেবো না তো। এসব ভেবে প্রেশার সুগার বাড়িয়ো না দয়া করে।"

বাবা বলল, "ভাবিস না, নাতি নাতনির মুখ না দেখে আমি মরছি না।"

আমি কপালে হাত দিয়ে বললাম, "এসব কী কথা বাবা?"

বাবা কিছু একটা হেসে বলতে যাচ্ছিল, দরজায় অনিন্দিতাদি তৈরি হয়ে এসে দাঁড়িয়ে বলল, "আত্রেয়ী, আমি একটু বেরোচ্ছি। অনিরুদ্ধ ফোন করেছিল, কথা বলতে চায়।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "কোথায় যাবে? এখানেও তো কথা বলতে পারতে।"

অনিন্দিতাদি ইতস্তত করে বলল, "না রে, এখানে আর কিছু বলব না। আমি বরং তোকে ফোনে সব বলব। এখন বেরোই।"

আমি বললাম, "আচ্ছা। ঠিক আছে। একা পারবে তো?"

অনিন্দিতাদি বলল, "পারব। আমি বেরোচ্ছি।"

আমার উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে অনিন্দিতাদি বেরিয়ে গেল।

আমি বুঝে উঠতে পারলাম না হঠাৎ করে কী হল।

৫০ জীমূতবাহন

পাহাড়ের মধ্যে একটা অদ্ভুত মায়া আছে। না চাইতেও সে শক্তপোক্ত মানুষকেও কবি বানিয়ে ফেলার ক্ষমতা রাখে। রাবংলার সে গুণটা আরও বেশি আছে।

লোকালয় ছেড়ে পাহাড়ি পথ ধরতেই মেঘ এসে ধাক্কা খাচ্ছে পাহাড়ে, সেখানেই বৃষ্টি হচ্ছে। অপূর্ব সে দৃশ্য। আমি মুগ্ধ হয়ে সেদিকেই তাকিয়ে ছিলাম, বউ বলল, "কলকাতা পচা জায়গা।"

আমি বললাম, "হুঁ। তবু পেটের ভাত দেয়।"

বউ বলল, "দিক। তাতে কী? আমার ভালো লাগে না। এখানে থেকে যেতে ইচ্ছা করছে।"

আমি বললাম, "অনিরুদ্ধকে নিয়ে? ও কি বউ ছেড়ে আসতে পারবে?"

বউ বলল, "ঠিক আসবে। আমি অপেক্ষা করব।"

আমার মনে হল আমার শরীরের ভেতরে কেউ কেরোসিন দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দিল। যেটুকু ভালো লাগা এসেছিল, এই কথায় সব কোথায় যেন চলে গেল।

শুধু বললাম, "ওহ।"

বউ বলল, “অনি পাহাড় খুব পছন্দ করে। কতবার আমরা ঠিক করেছিলাম পাহাড়ে একটা ছোট্ট কুঁড়েঘর করে থাকব।”

আমি চোখ বন্ধ করার চেষ্টা করতে করতে বললাম, “ও।”

বউ বলল, “এখানে জমি কিনে বাড়ি করার প্রসিডিওর জানো?”

আমি বললাম, “তোমার অনিরুদ্ধকে জিজ্ঞেস কোরো। আমি কী করে জানব?”

বউ বলল, “কী করে জিজ্ঞেস করব? ফোন তো তুমি ভেঙে দিলে।”

আমি আমার ফোনটা এগিয়ে দিয়ে বললাম, “এ নাও, ফোন করো।”

বউ বলল, “থাক। লাগবে না।”

আমি বললাম, “লাগবে। কথা বলো। ওকে মিস করছ বুঝতে পারছি।”

বউ জানলার বাইরে মুখ করে বলল, “মিস করার কিছু হয়নি। ভালোবাসাটা একটা অভ্যাস। অনিরুদ্ধ একটা সময়ে না থাকলে আমি চরম একাকিত্বে ভুগতাম। সেটা আমার

জন্য মোটেও ভালো হত না। মেন্টাল সাপোর্ট যে দেয়, তার প্রতি একটা সফট কর্নার তৈরি হবেই।"

আমি আর কিছু বললাম না। গাড়ি পাহাড়ি পথ ধরে এগিয়ে চলছিল। আমি সেদিকে মন দিলাম। বুঝতে পারছিলাম যত বেশি ওর কথা শুনব, তত আমার মেজাজ খারাপ হবে।

খানিকটা এগিয়ে নামচির পথ ধরতে দেখা গেল রাস্তায় গাছ পড়েছে। জ্যাম লেগে গেছে।

বউ বলল, "প্রতি পদে বাধা আসছে। ধুস!"

আমি রাস্তায় নেমে এগিয়ে গেলাম। মেশিন আছে কাছাকাছি। আসবে নিশ্চয়ই শিগগিরি। ড্রাইভারেরা অলস হয়ে হাসিঠাট্টা করছে। পাহাড়ের দিক থেকে আর-একটা গাছও বিপজ্জনক ভাবে ঝুলছে। মনে হল যে-কোনো সময় পড়ে যাবে। আমি সেদিকে সভয়ে তাকাতে তাকাতে নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে দাঁড়ালাম। ডানদিকে গভীর খাত, বাঁদিকে চড়াই পাহাড়। আমার মনে হল আমার জীবনটাও এখন এরকম হয়ে গেছে। যেদিকেই যাব, কিছুই পাব না।

মনটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল, জীবনে তো কারও কোনও ক্ষতি করিনি, নাক মুখ গুঁজে পড়াশুনা করেছি, চাকরি করছি ভালো ছেলের মতো, এরকম একটা লাইফ পেলাম... কী

করে? কর্মফল না কী বলে, আমি কি কোনও পাপ করেছিলাম কোনও কালে যে এরকম একটা জীবন হল?

বউয়ের প্রতি অসহ্য একটা রাগ হচ্ছিল কেন জানি না। মনে হচ্ছিল ছুটে গিয়ে ওকে খাদে ফেলে দিই। একটা মানুষের জীবনকে এভাবে নষ্ট করার অধিকার এরা পায় কোত্থেকে? অনিরুদ্ধকে পেলে আমি ছাড়ব না। কপালে দুঃখ আছে ওর।

চোয়াল শক্ত হল আমার।

মেশিন এসে রাস্তা পরিষ্কার করল কিছুক্ষণ পরে। গাড়িতে গিয়ে দেখলাম বউ যথারীতি ঘুমিয়ে পড়েছে।

আমি গাড়ির ভেতর বসতে করুণ মুখে বউ বলল, "বাথরুম পেয়েছে। পেটটা কেমন করছে।"

বৃষ্টি এসে গেছিল। আমি জানলার কাচ তুলতে তুলতে বললাম, "অনিরুদ্ধকে বলে দাও। নিয়ে গিয়ে করিয়ে নিয়ে আসবে।"

বউ বলল, "অনিরুদ্ধ তো নেই এখানে। তুমি আছ, তুমি ব্যবস্থা করো।"

আমি বললাম, "চেপে বসে থাকো। কোনও পেট্রোল পাম্পে ব্যবস্থা করা যায় নাকি দেখছি। এই রাস্তাঘাটে হাগু পাওয়া নিয়ে তোমার অমলকান্তি কোনও কবিতা লেখেনি?"

বউ মুখ বেঁকিয়ে বলল, 'ফালতু কথা বোলো না এখন। আমার কেমন করছে পেটটা। মোমোর পরে কফি খাওয়া উচিত হয়নি।"

আমি হাসিমুখে বললাম, "উপরওয়ালা আছেন। উনি ঠিক আমার কষ্টটা বুঝেছেন, বেশ হয়েছে।"

বলেই টের পেলাম আমারও পেটটা কেমন কেমন করছে।

৫১ অনিরুদ্ধ

একটা সময় ছিল, যখন ভাবতাম মেয়েরা অন্য গ্রহের প্রাণী। ভয় পেতাম, কথা বলতে গিয়ে কথা জড়িয়ে যেত। হাজার রকম ইনসিকিউরিটি চলে আসত।

সময় গেল, যত বড়ো হলাম, যত বিভিন্ন মেয়েদের সঙ্গে মিশলাম, বুঝলাম মেয়ে হ্যান্ডলিং-এর মতো সহজ কাজ পৃথিবীতে কিছু নেই। আরও বুঝলাম, মেয়েরা কিছু চায় না। কিচ্ছু না। সময় চায়। যত বেশি সময় দেবে, তত তারা ছেলেদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। ঋতুজার ক্ষেত্রেই দেখেছি।

ঋতুজা প্রথমে আমাকে দূর ছাই করত। পাত্তা দিত না। আমি কিন্তু হাল ছাড়িনি। কথা বলে গেছি। দশটা কথায় একটা রিপ্লাই দিত। একদিন হঠাৎ করেই হয়তো, সেদিন যাদের সঙ্গে কথা বলত তারা অনলাইনে ছিল না হবে, আমার সঙ্গে অনেক কথা বলে ফেলল। আমি সেদিনের পরে ওর সঙ্গে কথা বলার জন্য আগে যেমন হাভাতেপনা করতাম, সেটা কমিয়ে দিলাম। ইনফ্যাক্ট পাত্তা দেওয়াই ছেড়ে দিলাম। ব্যস, আর পায় কে, মেয়ে যেই বুঝল ওর ওপর হয়তো আমি ইন্টারেস্ট হারিয়ে ফেলেছি, ইগোতে নিয়ে নিল। নিজে থেকে এটা সেটা জিজ্ঞেস করতে শুরু করল। আমি সময় নিয়ে গেলাম। ঋতুজা জানতও না আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। গোটা ব্যাপারটাকে এমনভাবে ওর কাছে সাজালাম, যেন আমি না, আমার বন্ধুরা জোর করে আমাকে বিয়ে করাচ্ছে।

পৃথিবীর কোন বিয়ে কারও অনিচ্ছায় হয় না। আমারটাও হয়নি। ভেতরে ভেতরে অবশ্য আমি নাটকটা চালিয়ে গেছিলাম ঋতুজার সঙ্গে। ফুলশয্যায়, অনিন্দিতার সঙ্গে শুয়ে উঠে বাথরুমে গিয়ে ঋতুজাকে টেক্সট করে লিখেছিলাম, "খুব মিস করছি তোমায়।"

ঋতুজা উলটে আমাকে বুঝিয়ে গেছে, এরকম বলে না, বিয়ে করেছ, সংসার করার চেষ্টা করো। কনভারসেশনগুলো পড়েছি, আর নিজের মনেই ফিক ফিক করে হেসেছি। জানি তো, মেয়েরা কিছু চায় না। সময় চায় শুধু।

অনিন্দিতার সঙ্গে আমার রেজিস্ট্রি না হলে আমি জীবনেও এত কষ্ট করে কলকাতা আসতাম না।

ফোনে ওকে যখন দেখা করতে বললাম, প্রথমে গাঁইগুঁই শুরু করল। আমি সেন্টুর ভাণ্ডার খুললাম, “শোনো, আমি জানি আমি মারাত্মক ভুল করেছি। তোমাকে ঠকিয়েছি। আমাকে যা শাস্তি দেওয়ার দাও, জেলে দাও, আমি কিচ্ছু বলব না, কিন্তু আমার সঙ্গে শেষবারের মতো একবার দেখা করো।”

অনিন্দিতা গলেছে। অরিজিতের ফ্ল্যাটের চাবি ছিল আমার কাছে। ওখানে আসতে বলেছিলাম।

যখন দরজা খুললাম, দেখলাম মুখ থমথমে।

আমি ইচ্ছা করলেই ওকে ধরতে পারতাম, কিন্তু ধরলাম না। এই সময়ের নিয়ম আছে, রেগে থাকলে ছুঁতে নেই। বেশি অনুনয় করলে মাথায় চেপে বসবে। ব্যালান্সের খেলায় কখনও মেয়েকে মাথায় চড়তে দিতে নেই।

দরজা ছেড়ে দিলাম, অনিন্দিতা ঘরের ভিতরে গেল।

আমি হালকা গলায় বললাম, “বসো।”

অনিন্দিতা বলল, “আমি বসতে আসিনি, তোমার যা বলার বলে দাও, আমি চলে যাই।”

আমি দেখলাম পারদ চড়ছে। এবার মেয়ে মাত্রেই মা, অন্য দিক দিয়ে সেন্টু দিলে বরফ গলতেই পারে। বললাম, "আমি সেই ভুবনেশ্বর থেকে এলাম তো, পারছি না, শরীরটাও ভালো যাচ্ছে না কদিন ধরে। খাওয়া হয়নি কিছু। আমি বসি?"

অনিন্দিতা কঠিন গলায় বলল, "বসো।"

আমি বললাম, "প্লিজ বসো।"

অনিন্দিতা শক্ত হয়ে বসল।

আমি ওর উলটোদিকে বসে যতটা পারি কাঁদো কাঁদো অথচ দৃঢ় গলায় বললাম, "আমি জানি, আমি যা করেছি তার কোনও ক্ষমা হয় না। একই সঙ্গে আমি দুটো মেয়েকে ভালবেসেছি। বিশ্বাস কর, আমি ভালোই বেসেছি, এর বাইরে কিছু না। এক অদ্ভুত টানাপোড়েনে জড়িয়ে গেছিলাম। বিয়ের আগে থেকেই ঋতুজার সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল। সেটা যে বিয়ের পরে কীভাবে থেকে গেল বুঝিনি। কী বলব তোমায়..."

চুপ করে গিয়ে মাথা নিচু করলাম। পালস বোঝার জন্য। আমার কথার ঠিক কী উত্তর আসে জানতে হবে।

অনিন্দিতা বলল, "ভয় পেয়ো না, তোমাকে আমি কোনও রকম কোনও ঝামেলায় জড়াব না। ডিভোর্সটা মিউচুয়ালি করে ফেললে ভালো হয়। আর বাচ্চাটাকে আমি রাখব না।"

আমি বমি করার ভাব করলাম। জোরে জোরে ওয়াক টানতে টানতে মেঝেতে গড়াগড়ি দিয়ে থুতু ফেলতে লাগলাম আর কাঁদতে শুরু করলাম। অনিন্দিতা শক্ত ছিল এতক্ষণ, আমাকে এরকম করতে দেখে ভয় পেয়ে গিয়ে বলল, "কী হয়েছে তোমার?"

আমি বললাম, "এক ধরনের রোগ। তোমাকে বলিনি আগে। এই রোগে মনের সমস্ত যন্ত্রণা শরীরে চলে আসে। আমি ছটফট করছি সারাদিন ধরে, যতবার ভাবছি ঋতুজার ব্যাপারে, আমি মাটিতে মিশে যাচ্ছি। বিশ্বাস করো অনিন্দিতা, ঋতুজার সঙ্গে আমার কিছু নেই। ওর বিয়ে হয়ে গেছে।"

অনিন্দিতা জল নিয়ে এসে আমার গায়ে মাথায় দিতে দিতে বলল, "ঠিক আছে, সেসব পরে দেখা যাবে। এখন ডাক্তার দেখালে ভালো হয়।"

আমি হাঁফ ছাড়লাম।

এ ধরনের ড্যামেজ কন্ট্রোল রাহুল দ্রাবিড়ের ব্যাটিং-এর মতো। লোপ্পা বলে হাজারো লোভ থাকলেও বল শেষ মুহূর্তে ছেড়ে দিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে খেলে যেতে হবে। একটা একটা রান।

জয় হবেই।

পর্যাপ্ত পরিমাণে সেন্টু দিলে মেয়েরা গলবেই।

অনিন্দিতা তো শিশু আমার লেভেলের পাবলিকের কাছে।

মেঝেতে শুয়ে অজ্ঞান হবার ভান করলাম।

অনিন্দিতা জল খাইয়ে দিল আমার মাথাটা ওর কোলে নিয়ে।

আমি মনে মনে হাসতে লাগলাম।

৫২ অমৃত

যে দেখা হওয়াটা রোজ হত, যে কথাটা রোজ হত, সেটাই হওয়া বন্ধ হয়ে গেলে অস্বস্তি হয়। দম বন্ধ হয়ে আসে। আত্রেয়ীকে ফোনে পাচ্ছি না, পেলেও ঠিক করে কথা বলছে না, দেখা করতে চাইছে না, আমার ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছিল।

কোনও মতে অফিস শেষ করে বাইক নিয়ে রাস্তায় উদ্দেশ্যহীনভাবে অনেকক্ষণ ঘুরলাম। ভালো লাগছিল না। বারবার মনে হচ্ছিল আত্রেয়ী আমাকে এড়িয়ে যাচ্ছে। ঠিক করলাম

আর ফোন করব না। যে কাফেটায় আমরা বসে কফি খাই, সেটায় ঢুকলাম। একটা কফি নিয়ে চুপ করে বসে রইলাম।

প্রেম করার সময় কাউকে দেখতে পাই না আত্রেয়ীকে ছাড়া। আর এখন আত্রেয়ী নেই, সবাইকে চোখে লাগছে। ওই যে কোণে দুজন বসে বসে খুনসুটি করছে কিংবা এক ভদ্রমহিলা এক প্রৌঢ়ের সঙ্গে বসে আছেন, এসব দেখতে দেখতে ফোনে আত্রেয়ী আর আমার ছবিটা অনেকক্ষণ ধরে দেখলাম। আমাকে জড়িয়ে ধরে আছে পরম নিশ্চিন্ততায়। দেখলে মনটা শান্ত হয়। চোখ বন্ধ করে আত্রেয়ীর আদরগুলো মনে করার চেষ্টা করলাম।

মনে করার চেষ্টা করলাম এই কাফেতেই দুজনে দুজনের হাত চেপে ধরা। ঘোর বৃষ্টিতে রাস্তায় দাঁড়িয়ে দুজনের ঠোঁটে ঠোঁট মিশে যাওয়ার কথা মনে করলাম চোখ বন্ধ করে। নিজের মনকে প্রাণপণে বোঝানোর চেষ্টা করলাম আত্রেয়ী আমার। শুধু আমার। আর কারও নয়। সমস্ত রকম সমস্যা থেকে বেরিয়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরবেই ও। ওকে আসতেই হবে আমার কাছে।

ফোনটা বেজে উঠল, আত্রেয়ী ফোন করছে ভেবে তড়িঘড়ি সেটা হাতে নিতে দেখলাম বউদি ফোন করছে, ধরলাম, “বলো।”

বউদি বলল, “এই অমু, তুমি কোথায়? ফিরতে দেরি হবে?”

আমি বললাম, "তা একটু হবে, কেন বলো তো?"

বউদি বলল, "শোনো না, আমার বেশ কয়েকটা জিনিস দরকার। তোমার দাদা বাসন্তী পোলাও করতে বলেছিল সকালবেলা, এখন দেখছি গোবিন্দভোগ চালটাই নেই। আর কাজু কিশমিশও লাগবে। তোমার দাদাকে ফোন করছি, বলল, অফিসে ব্যস্ত আছে, ফিরতে রাত হয়ে যাবে। তুমি পারবে আনতে? আমিই বেরোতাম, কিন্তু একগাদা কাজ পড়ে আছে..."

আমি বললাম, "না না, তোমাকে বেরোতে হবে না। আমি নিয়ে যাব, ভেবো না।"

বউদি বলল, "ঠিক আছে। তুমি কোথায়? আত্রেয়ী আছে নাকি আশেপাশে? দাও না, একটু কথা বলি।"

আমি বললাম, "ধুস, নেই এখন। যখন থাকবে তখন দেব।"

বউদি বলল, "যাহ্, আমি ভাবলাম আছে বোধহয়। ঝগড়া করোনি তো আবার?"

আমি বললাম, "না। আমি কি ঝগড়ুটে নাকি? এই চিনলে অ্যাদ্দিনে?"

বউদি বলল, "ঝগড়ুটে না হলেও তুমি শর্ট টেম্পারড খুব। আর অধৈর্যও হয়ে পড়ো অল্পে। হুটহাট মাথা গরম কোরো না। বুঝলে ভাইটি?"

আমি বললাম, "বুঝেছি। আর কিছু বলবে?"

বউদি হাসল, "যেগুলো আনতে বললাম, এনো। ভুলো না। হোয়াটসঅ্যাপ করে রাখব?"

আমি বললাম, "না না লাগবে না। মনে থাকবে, রাখি।"

ফোনটা কাটলাম। আত্রেয়ী ফোন করছিল লক্ষ করিনি। কল ওয়েটিং নোটিফিকেশন এসেছিল বুঝিনি। দুটো মিসড কল দেখাচ্ছে।

তড়িঘড়ি ফোন করলাম। একবার রিং হতেই আত্রেয়ী ধরল, বলল, "কার সঙ্গে কথা বলছিলে?"

আমি বললাম, "বউদি।"

আত্রেয়ী বলল, "ও। আমি ভাবলাম কাউকে জুটিয়েছ নাকি!"

আমি বললাম, "এত তাড়াতাড়ি কেউ জুটে গেলে গিনেস বুকে নাম উঠবে তো। সম্ভব এত তাড়াতাড়ি কাউকে জোটানো?"

আত্রেয়ী বলল, "অনিন্দিতাদির বর পারলে সবাই পারবে হয়তো। আমার আজকাল পুরুষমানুষের ওপর ভরসাটাই উঠে যাচ্ছে।"

আমি হতভম্ব গলায় বললাম, "কার বর কী করেছে তার জন্য আমাকে বিশ্বাস করতে পারছ না? আমাকে দেখে কি তোমার ফ্রড মনে হয়? আমি যে আদর করেছি, সেগুলো সব মিথ্যা বলে মনে হয়?"

আত্রেয়ী বলল, "তুমি এত জোরে কথা বলছ কেন? কোথায় আছ তুমি?"

আমি বললাম, "কাফেতে।"

আত্রেয়ী বলল, "কাফেতে কী করছ?"

আমি বললাম, "একাকিত্ব উদযাপন করছি। তুমি তো আমাকে ভুলেই গেছ।"

আত্রেয়ী বলল, "আমি তোমাকে ভুলে গেছি? এই কথাটা তুমি বলতে পারলে?"

আমি বললাম, "একবার ফোন করে দু-চারটে চুমু খেলেই হত। সেটা যখন করোনি, মন তো খারাপ হবেই বলো।"

আত্রেয়ী বলল, "তুমি জানো না আমি মানসিকভাবে কতটা ডিস্টার্বড হয়ে গেছি। আমার মুডটা ভীষণ অফ হয়ে গেছে। আর এরকম যখন হয়, তখন সেটা থেকে রিকভার করতে অনেক সময় লাগে আমার।"

আমি বললাম, "হুঁ। ঠিক আছে। সময় নাও। আমি একা বোকা হয়ে ঘুরে বেড়াই। রাখলাম।"

আত্রেয়ী বলল, "রাগ করলে?"

আমি বললাম, "নাহ। রাখি।"

আত্রেয়ী কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, আমি না শুনে ফোনটা কেটে দিলাম।

রাগ দেখাতে গিয়ে মন খারাপটা আরও বেড়ে গেল।

মহা জ্বালা বালের প্রেম করে!

৫৩ আত্রেয়ী

আমার আজকাল মনে হয়, অমৃতর সঙ্গে সম্পর্কটা আমাকে হঠাৎ করে বড়ো করে দিয়েছে। আমার থেকে অমৃত বয়সে বড়ো হলে কী হবে, ওর শৈশব এখনও কাটেনি।

এরকম করবে কেন নইলে? আমি তো রোজই দেখা করি। দু তিন দিন করতে পারছি না বলে এরকম পাগলামি করার কী আছে? আমার যদি মনে হয় আমি কাউকে বিশ্বাস করতে পারছি না, সেটা বললেও এরকম উত্তেজিত হয়ে পড়লে তো ভারী বিপদ!

ফোনটা রাখার পর বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে ছিল পাগলটা। তারপর হোয়াটসঅ্যাপ করল, "তুমি কি আমার সঙ্গে ব্রেক আপ করতে চাও আত্রেয়ী?"

আমি মেসেজটা দেখে বিরক্ত হয়ে ফোন করলাম। ফোন তুলল না।

লিখলাম, "ফোন তুলছ না কেন?"

অমৃত লিখল, "তুলব না। মেসেজে উত্তর দাও। তুমি কি আমার সঙ্গে ব্রেক আপ করতে চাও?"

আমি লিখলাম, "এরকম উদ্ভট কথা মনে হল কেন তোমার?"

"এই তো, তুমি যে বললে..."

"কী? কী বললাম?"

"এই যে বললে তুমি ছেলেদের বিশ্বাস করতে পারছ না। কী যেন ওই লোকটা... ওর জন্য।"

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, "আমার মনে হয়েছিল হঠাৎ করে বলে ফেলেছি। এর মানে ব্রেক আপ করা কেন হবে?"

"ও। আচ্ছা।"

"তুমি এখনও কাফেতে বসে আছ?"

"হুঁ।"

"বাড়ি যাও। বাইক চালিয়ে সাবধানে ফিরবে।"

"যাব না। তোমার কোনও কথা শুনব না।"

“এ কেমন পাগলামি?”

“পাগলামি বললে পাগলামি। আমার ভালো লাগছে না কিছু।”

“কী চাও? চুমু? এ নাও।” একগাদা চুমুর স্মাইলি পাঠালাম।

“লাগবে না। তুমি আমাকে অ্যাভয়েড করছ। আমি বুঝে গেছি। কী হয়েছে? বাবা কোনও সম্বন্ধ দেখেছে নাকি?”

আমি রাগি ইমোজি দিলাম কয়েকটা। দিয়ে লিখলাম, “এসব কী বলছ? আচ্ছা আমার কি মুড অফ হতে নেই?”

“হতে আছে। তুমি আমাকে ভালোবাস তো আত্রেয়ী?”

“বাসি। কীভাবে প্রমাণ করব বলো? প্রমাণ দিচ্ছি।”

“প্রমাণ করলে হবে না। আমাকে বললেই হবে। আমার ভালো লাগছে না কিছু বিশ্বাস করো। তুমি না থাকলে আমার মনে হয় সব শেষ হয়ে যাচ্ছে। কেমন একটা অসহ্য কষ্ট হচ্ছে।”

"আচ্ছা। তুমি যদি ভাবো আমার এরকম কিছু হয় না তাহলে ভুল ভাবো। তুমি বাড়ি যাও। এসব দয়া করে ভেবো না।"

"কাল দেখা করবে বলো।"

"তুমি আজই এসো। বাড়ি চলে এসো। খুশি?"

"না বাড়ি যাব না। আমার এক হাজারটা চুমু লাগবে আমার আত্রেয়ী বউয়ের থেকে।"

হেসে ফেললাম। লিখলাম, "ঠিক আছে। দুহাজারটা চুমু দেব। এবার বাড়ি যাবে?"

"যাচ্ছি।"

"ভালো থেকো। গিয়ে মেসেজ করবে। পাগলামি কোরো না দয়া করে।"

"আমি তো পাগলই সোনা। তোমার জন্য।"

"হুঁ। হয়েছে। এবার যাও।"

"যাচ্ছি। ভালোবাসি।"

“ভালোবাসি।”

ফোনটা রাখলাম। ঠোঁটের কোণে হাসি এল একটা।

অবুঝ ভালোবাসার একটা অদ্ভুত শক্তি আছে। কেমন সব মন খারাপ দূর করে দেয়। আমার মনে হচ্ছিল অমৃত আমাকে জড়িয়ে ধরে আছে। চোখে বন্ধ করে ওর চোখ দুটো, নাক, ঠোঁট মনে করতে লাগলাম। সব সময় ছটফট করছে যেন। প্রেম পেতে শুরু করল হঠাৎ করেই।

আরও কিছু ভাবতে যাচ্ছিলাম, কলিং বেল বাজল। বাবা হাঁটতে বেরিয়েছে। আমি দরজা খুলে দেখলাম অনিন্দিতাদি দাঁড়িয়ে আছে।

বললাম, “কী গো, কী খবর?”

অনিন্দিতাদি চোখ মুখ শক্ত করে বলল, “ও বারবার ক্ষমা চাইল। আমাকে বাড়ি নিয়ে যেতে চাইছে।”

আমি কয়েক সেকেন্ড অনিন্দিতাদির দিকে তাকিয়ে বললাম, “আচ্ছা। তুমি কী বললে?”

অনিন্দিতাদি বলল, "ক্যাবে বসে আছে বাইরে। আমি ব্যাগ নিতে এলাম।"

আমার চোখের দিকে না তাকিয়েই কথাগুলো বলল অনিন্দিতাদি।

আমি বললাম, "আচ্ছা। তুমি কী করছ, ভেবে নিয়েছ তো?"

অনিন্দিতাদি আমার দু হাত ধরে বলল, "আর কটা দিন দেখি। তুই রাগ করলি না তো?"

আমি মাথা নাড়লাম, "না না ছি ছি, রাগ করব কেন? তুমি দেখতে চাইলে দেখো। কোনও অসুবিধা নেই। ভালো থাকো।"

কয়েক মিনিটের মধ্যে অনিন্দিতাদি ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে গেল।

অনিরুদ্ধদা ক্যাবেই বসে ছিল। নামল না।

আমার প্রবল অস্বস্তি হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল এত সহজে সব কিছু মিটে যায় না।

যেতে পারে না।

৫৪ জীমূতবাহন

আমি দেখেছি সাইট সিয়িং জিনিসটা আমার সঙ্গে যায় না।

মানে কোথাও বেড়াতে গিয়ে পাগলের মতো চরকি ঘোরার মানে কী? অফিস করে ক্লান্ত হয়ে হয়েই তো লোকে বেড়াতে যায় রে বাবা! সেখানে আবার নতুন করে ক্লান্ত হবার দরকারটা কী?

ঘণ্টাখানেক নিম্নচাপ সামলে রাস্তায় গাড়ি যখন ছাড়ল, ড্রাইভারকে বলে বলে একটা পেট্রোল পাম্পে গাড়ি দাঁড় করানো গেল।

বউ আর আমি একসঙ্গেই ছুটলাম। এই সব তীব্র কষ্টের পর কি আর ঘোরা সম্ভব? ফলশ্রুতি হল হালকা হয়ে ড্রাইভারকে বলে ফের রাবংলার পথেই রওনা হওয়া গেল।

বউ আমার দিকে ফিক ফিক করে হাসতে হাসতে বলল, "এইজন্য বলে পরের কষ্টে আনন্দ পেতে নেই।"

আমি রাগি গলায় বললাম, "হুঁ। খুশি হয়েছ তো?"

বউ বলল, "হেবি। এই তুমি সাবান দিয়ে হাত ধুয়েছ তো?"

আমি বললাম, "কেন ধোব না? আমাকে কী মনে হয়? ধুই না? নিজে ধুয়েছ?"

বউ বলল, "ধুয়েছি। আসলে তুমি সব সময় এমন তিরিক্ষে মেজাজে থাকো, হতেই পারে, এমন রেগে গেলে যে সাবান দিয়ে হাত ধুতেই ভুলে গেছ। হতেই পারে তো, তাই না?"

আমি বললাম, "এসব ফালতু প্রশ্নের উত্তর দেবার সময় আমার নেই। তুমি পাহাড় দ্যাখো না। কী সুন্দর সবুজ পাহাড়, এত সুন্দর পরিবেশে তোমার মাথায় এখনও এসব ঘুরছে কেন?"

বউ বলল, "আমার যখনই মনে পড়ছে আমার ওপর আপারহ্যান্ড নিতে গিয়ে তোমারও নিম্নচাপ এসে গেছিল, তখনই ভীষণ হাসি পেয়ে যাচ্ছে।"

আমি বললাম, "এক কাজ করো, তুমি একবারে হেসে নাও। গাড়ি দাঁড় করাতে বলব?"

বউ বলল, "না না, দরকার নেই। আমার এখন ম্যাগি খেতে ইচ্ছা করছে, ড্রাইভারকে বলে রাখো, যেখানেই পাওয়া যায়, গাড়ি দাঁড় করায় যেন।"

আমি বললাম, "হোটেলে ফিরে যত ইচ্ছা খেয়ো। আবার যদি কোথাও গাছ-টাছ পড়ে রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়, আর-এক কেলোর কীর্তি হবে।"

বউ বলল, "কিছু কেলোর কীর্তি হবে না, কী আর হবে, সারারাত রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। পাহাড়ে এসেছ যখন, সব রকম এক্সপেরিয়েন্স করে নাও। মনের মধ্যে সারাক্ষণ বিষ পুষে রাখা ভালো না, বুঝলে?"

আমি বললাম, "সারাক্ষণ অন্যের সংসার ভাঙার কথা ভাবার থেকে মনে বিষ পুষে রাখা ভালো।"

বউ বলল, "মানে? অন্যের সংসার ভাঙা মানে? আমি কোথায় অন্যের সংসার ভেঙেছি?"

আমি বললাম, "অনিন্দিতার সংসার ভাঙছ। একটুও আগে পিছে না ভেবে ভাঙছ। মনে বিন্দুমাত্র পাপবোধ না রেখে ভাঙছ।"

বউ বলল, "শোনো, তুমি এসব নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না। তোমার বিন্দুমাত্র সেন্সিটিভ মন থাকলে এসব নিয়ে ভাবতে না।"

আমি বললাম, "সেন্সিটিভ মনের ভাই হয়েছে। সেন্সিটিভের কী আছে? দামড়া ছেলে মেয়ে, অতই যদি প্রেম তবে বিয়ে করে দুজনের জীবন নষ্ট করার কী দরকার ছিল? নিজেদের মধ্যে বিয়ে করে নিজে নিজে মারামারি করে মরলেই পারতে? অবশ্য এখন

তাই করবে। এই টাইপের পাবলিকের সঙ্গে দুদিন থাকো না, তাহলেই বুঝবে কত ধানে কত চাল।”

বউ বলল, “আমার এই সব কথা ভাল্লাগছে না। তুমি টপিক চেঞ্জ করবে? আমি তো তোমাকে বলেছি, ফিরে গিয়ে ডিভোর্স দিয়ে দেব। কেন শুধু শুধু অনিকে টানছ বলো তো?”

আমি গুম হয়ে বসে বললাম, “কষ্ট হয় খুব?”

বউ বলল, “তোমার এ কথার আমি উত্তর দিতে বাধ্য নই।”

মাথায় আগুন জ্বলছিল। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে বললাম, “দিয়ো না। তোমার সে বোধ বুদ্ধি থাকলে ওই জন্তুটার সঙ্গে যেতেও না তুমি। গান্ডু কি আর গাছে ফলে?”

বউ বলল, “তুমি আমাকে গান্ডু বললে?”

আমি বললাম, “খারাপ লাগল? গাড়ি থেকে নেমে যেতে পারো। এক কাজ করো, তুমি বরং নেমেই যাও, নেমে তোমার অনিরুদ্ধকে খবর দাও। লাফাতে লাফাতে এসে বানচোদটা তোমায় উদ্ধার করে নিয়ে যাক।”

বউ থমথমে গলায় বলল, “তুমি এরকম করলে তাই করতে হবে। আমি কদিন এসব ভুলে থাকতে চাইছিলাম। তুমি সেটা দেবে না, তাই না?”

আমি বললাম, “আমার যখনই মনে পড়ে, আমার জীবন, অনিন্দিতার জীবন তুমি নষ্ট করে দিয়েছ, আমার মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে।”

বউ বলল, “ঠিক আছে। আগুনটা কিছু দিয়ে চাপা দিয়ে রাখা যায় না? কলকাতা গিয়ে নাহয় সেটায় ফুঁ দিয়ো।”

আমি জানলার বাইরে তাকালাম। প্রকৃতিও চুপ মেরে গেছে।

ড্রাইভারকে বললাম, যে দোকানে ম্যাগি পাওয়া যাবে সে দোকানে দাঁড়াতে।

বউ বলল, “লাগবে না। আমার খিদে চলে গেছে।”

আমি বললাম, “তুমি খেয়ো না। আমি খাব। খেতে হবে না তোমায়।”

বউ আর কিছু বলল না। চোখ বন্ধ করল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ল আমি স্পষ্ট বুঝলাম।

এরকম ইচ্ছাঘুম হলে জীবনটা এত অসহ্য হত না বোধহয় আমার।

৫৫ অনিরুদ্ধ

ঋতুজাকে আমার এমনি এমনি ভালো লাগেনি।

ঋতুজা এমনি এমনি আমার অভ্যাস হয়ে ওঠেনি।

একটা মেয়ের সঙ্গে শোয়ার পর আমি তার ওপর থেকে সমস্ত ইন্টারেস্ট হারিয়ে ফেলি।

শোয়া হয়ে গেলে তো মেয়েটার সমস্ত রহস্যই শেষ হয়ে গেল।

তার আগে মেয়েটা কত রকম কথা বলে, তার সঙ্গে সময় দিই, সমস্ত কথায় পার্টিসিপেট করি।

শোয়ার পরও মেয়েটা কথা বলে।

আমি ছুতো খুঁজি পালাবার।

ঋতুজা শোয়ার পরে নানারকম পাগলামি করে। এইজন্য ওকে আমার ভালো লাগে।

ভালোবাসা অবশ্য অন্য জিনিস। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে আজ অবধি আমি কাউকে ভালোবাসিনি। ভালোবাসা অত সহজ জিনিসই না।

এখন রাত একটা।

তুমুল ভালোবাসা, শারীরিক সম্পর্কের পরে অনিন্দিতা আমার পাশে ঘুমাচ্ছে সম্পূর্ণ অনাবৃত হয়ে। আমার বুকে ওর একটা হাত। ওকে আমি বুঝিয়েছি, ঋতুজা পাস্ট। আমার ভবিষ্যৎ ও-ই। আমার সন্তান আসছে ওর কাছে। এখন অন্য কিছু ভাবতেই পারব না।

হ্যাঁ, আমি ওকে ঠকিয়েছি। স্বীকার করে নিয়েছি। স্বীকার করে নেওয়ার পরে মেয়েরা আপনাকে বিশ্বাস করতে শুরু করে। তর্ক করবেন না। স্বীকার করে নেবেন।

আমি অনিন্দিতার হাত ধরে কাঁদো কাঁদো গলায় বলেছি, "বিশ্বাস করো, এ সবই আমি করেছি আমার একাকিত্ব থেকে। আমি ভীষণ একা অনি। তুমি কলকাতা থাকো, আমার মাথায় যেন শয়তান বাসা বাঁধে। সব কিছু জেনেও আমি পতঙ্গের মতো আগুনের দিকে ছুটে যাই। এই, এই দ্যাখো, আমি সবখান থেকে ঋতুজাকে ব্লক করে দিলাম।"

অনিন্দিতা আমার বুকে মাথা রেখে কাঁদতে কাঁদতে বলল, “কাউকে কিছু করতে হবে না। আমি ঠিক করেছি, আমি চাকরিটা ছেড়ে দেব। আমি তোমার কাছে গিয়ে থাকব। তোমাকে আর একা থাকতে হবে না।”

আমি প্রমাদ গুনে বললাম, “না, না সোনা, একদম না। চাকরি ছাড়বে কেন? নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছ তুমি। কত ইম্পরট্যান্ট বলো তো সেটা? আমি তোমাকে চাকরি ছাড়তে দেব না। আমাকে আর তিন মাস সময় দাও, আমি ভুবনেশ্বর থেকে কলকাতায় ট্রান্সফার নিয়েই ছাড়ব। তোমাকে ছাড়া আমি আর কোনও দিকে তাকাও না। প্লিজ আমায় সুযোগ দাও।”

অনিন্দিতা কেঁদেছে, বলেছে, “এভাবে বলতে হবে না।”

আমি আরও কেঁদে বলেছি, “তাহলে কথা দাও আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না।”

অনিন্দিতা কাঁদতে কাঁদতে আমাকে জড়িয়ে ধরেছে।

বাকিটা আমি বুঝে নিয়েছি।

এখন কেমন পরম নিশ্চিন্ত হয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমাচ্ছে।

একটা নিঃশ্বাস ফেললাম। মেয়েরা হল নরম জাত। কথায় কী সুন্দর তাদের টুপি পরানো যায়।

ঋতুজা শুধু ফিরুক। ওর শরীরে মুখে না গুঁজে শুলে আমার নামও অনিরুদ্ধ নয়। তবে ব্যাক আপ প্ল্যান রাখতে হবে। শুধু ঋতুজাকে পেলে হবে না। এখন ঋতুজার বর তক্কে তক্কে থাকবে। নজরে রাখবে। ঋতুজার পক্ষে আমার কাছে আসা এখন অত সহজ হবে না।

কিন্তু আমার তো নারী শরীর চাই, নতুন পারফিউমের গন্ধ, যোনির গন্ধ, নাভির স্বাদ, স্তনের আকুলতা চাই! অস্থির লাগছিল। অনিন্দিতা পুরোনো হয়ে গেছে।

ঋতুজা পুরোনো না হলেও দুর্গম হয়ে গেছে।

আমাকে যে মেয়েটা ফোন করেছিল, তাকে ফোন করতে হবে।

ভুবনেশ্বরের মেয়েদের সঙ্গে শুয়ে ভালো লাগে না।

সবথেকে বড়ো বাধা হল ভাষা। তার থেকেও বড়ো ভয় অপরিচিত মেয়েদের সঙ্গে শুলে রোগের। আমার এসকর্ট সার্ভিস ভালো লাগে না।

ভালো লাগে অনাস্বাদিত ঘ্রাণের মতো নতুন নতুন নারী শরীর। প্রতিটা মেয়ে আশ্রয় চায়, ঘর চায়। প্রতিটা মেয়ের প্রচুর ইনসিকিউরিটি থাকে। একটা পুরুষ কাঁধ চায় যেখানে মাথা রেখে নিশ্চিন্ত থাকতে পারবে। সেই ফাঁক দিয়ে আমাকে ঢুকতে হবে।

অনিন্দিতার পেটে হাত বোলালাম। সন্তান আসছে। সন্তান? ধুস! কী বাজে ইমোশনাল ব্যাপার।

হঠাৎ মাথায় একটা কথা আসতে উঠে বসলাম।

ঋতুজার সঙ্গে ছেলেটা শুচ্ছে? ঋতুজা যদি প্রেগন্যান্ট হয়ে যায়?

৫৬ জীমূতবাহন

আমার এক বন্ধু আছে, বিয়ের আগে থেকে বউকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে পাগল করে দেয়। ওর বউ কোথায় একটা বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে গেছে, সেখানে এক ছেলের পাশে বসে ফটো দিয়েছে, বন্ধু ওর বউকে পাগল করে দিয়েছিল কেন ছেলেটার গা ঘেঁষে বসেছে। ওর বউ বলেছিল ও তো আমার ভাইয়ের মতো। ছেলেটা বলেছিল নিজের মায়ের পেট থেকে তো বেরোয়নি! যে ভাই নিজের পেট থেকে বেরোয়নি, সে ভাইও হতে পারে, সুধীর ভাইও হতে পারে। সে নিয়ে তুমুল বাওয়াল লাগলেও বিয়েটা হল।

বিয়ের কিছুদিন পর সেই বন্ধুকে নিয়ে তুমুল ঝামেলা হয়েছিল ওদের। শেষমেশ বন্ধুটার ওদের বাড়ি যাওয়া বন্ধ হয়ে গেছিল। বন্ধুটা বরাবরই এরকম। মারাত্মক পজেসিভ।

আর রইলাম আমি! পজেসিভ হব কি না বোঝা-টোঝার আগে এমন বউ পেলাম যে কিনা বিয়ের আগে থেকেই সব সেটিং করে এসেছে। ছোটোবেলায় "একটি মোরগের কাহিনী" পড়েছিলাম।

নিজেকে সেরকম মোরগ মোরগ মনে হয়। কেমন আমার রোস্ট করে অনিরুদ্ধ আর আমার বউ খাবে।

আমার বন্ধুটা বলে যে প্রেমিক পুরুষ তার প্রেমিকাকে ছেলেদের সঙ্গে ঘষাঘষি করতে দেখলে রাগে না সে আসলে প্রেমিকই না। ভেড়া মানব।

আমি অবশ্য জানি আমি ভেড়া মানব নই। যেদিন অনিরুদ্ধকে সামনে পাব, কাঠ খুলে হাতে ধরিয়ে দেব।

ওদের কথা ভাবলেই আমার মাথায় ভিসুভিয়াস জ্বলে। মানুষ এত প্যাঁচালো হয় কী করে? কী করেই বা নিজে বিয়ে করার পরেও অন্যের বউকে নিয়ে টানাটানি করে? কেন করবে? কী ধরনের মানসিকতা থেকে এসব প্রবৃত্তি আসে?

আবার মাঝে মাঝে মনে হয়, যে সম্পর্কটা আমি আর টানবই না, সেটা নিয়ে কেন এত ভাবছি? সব তো শেষ হয়েই যাবে। তারপর এরা যা ইচ্ছা করুক, শুধু আমার ডিভোর্সটা দিয়ে দিক। জ্বলে ওঠা কোনও আগুনকে দুভাবে নেভানো যায়। জল দিয়ে, নয়তো তাকে পুড়তে দিয়ে। পুড়তে পুড়তে একসময় সব ছাই হয়ে যায়।

আমার বউয়ের জ্বলন্ত প্রেমে আমি জোর করে যতই জল দি, খুব ভালো করে বুঝতে পারি ও ঘুরে ফিরে অনিন্দিতার বরের কাছেই যাবে। খামোখা কেন আমি জোর করতে যাই? যা পারে করুক।

গাড়ি রাবংলায় ফিরল বিকেল নাগাদ। হোটেলের রুমে ঢুকলে আমি বউকে বললাম, "তোমাকে একটা ফোন কিনে দেব। তুমি যেখানে ইচ্ছে ফোন কোরো। আমি কিছু বলব না।"

বউ বলল, "দরকার নেই। আমি আবার কথা বলব, আবার তুমি ফোন ছুড়ে মারবে। কলকাতায় গেলে আমি নিজে থেকেই ফোন কিনে নেব। তোমাকে দিতে হবে না।"

আমি বললাম, "ওকে। যা ইচ্ছে তোমার।"

বউ খাটে বসে টিভি চালিয়ে অন্যমনস্ক গলায় বলল, "তুমি আমাকে ভালোবেসে ফেলছ। সমস্যায় পড়বে।"

আমি হতভম্ব গলায় বললাম, "মানে?"

বউ বলল, "মানেটা সিম্পল। তুমি জড়িয়ে যাচ্ছ। জড়িয়ো না। ডিভোর্স চাইছ যখন পেয়ে যাবে।"

আমি বললাম, "ভালোবেসে ফেলছি? এইসব ওভারকনফিডেন্স পাও কোত্থেকে? তোমার মতো মেয়েকে আমি ভালোবাসব ভাবো কী করে? আমি কি পাগল?"

বউ হাসল, "তোমার লক্ষণগুলো তো তাই বলছে। সারাক্ষণ অনিরুদ্ধ আর আমাকে জড়িয়ে উলটোপালটা ভেবে যাচ্ছ। গেট এ লাইফ। যাও, হুইস্কি নিয়ে এসো। চিপসও এনো। খাই। আনন্দ করি। আমাকে বন্ধু ভাবো না!"

আমি গোঁজ হয়ে বসে বললাম, "তোমার মতো বন্ধু আমার চাই না।"

বউ বলল, "ঠিক আছে। শত্রুই ভাবো। খুব বাজে, রাস্তার পচা গলা নোংরা একটা মেয়ে ভাবো। কিন্তু মানুষ তো ভাবো? নিজের ছুটিটা নষ্ট কোরো না। আমি খেপি হতে পারি, কিন্তু এটা মন থেকে বললাম। আমি বুঝতে পারছি, এই খেলায় তোমাকে জড়িয়ে আমি তোমার অনেক বড়ো ক্ষতি করে দিলাম। বিশ্বাস করো, আমি বুঝতে পারিনি, ব্যাপারটা

এরকম হতে পারে। নিজের মোহে চলতে চলতে কখন যে তোমার আর অনিরুদ্ধর বউয়ের জীবনটা নষ্ট করে দিলাম, বুঝিনি।”

আমি কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বললাম, “কী মদ খাবে?”

বউ হাসল, “যা তুমি খাওয়াবে। খেয়ে উলটে পড়ে থাকব।”

আমি রুম সার্ভিসে ফোন করলাম। ওরাই দিয়ে গেল। স্যালাড, চিপস, ড্রাই চিলি চিকেন আর একটু দামি হুইস্কি।

বউ জল না মিশিয়ে একবারে ষাট মিলিলিটার গলায় ঢেলে বলল, “এভাবে বিষ খাওয়া গেলে কবে মরে যেতাম। বেঁচে থাকা বড়ো কষ্ট। টিনএজ প্রেগনেন্সির মতো বাজে জিনিস বোধহয় আর কিছু হয় না।”

আমি কথা না বলে এক চুমুক দিলাম। জিনিসটা গলা দিয়ে নামতে নামতে এক অদ্ভুত হতাশা গ্রাস করছিল আমাকে। বউ চুল ছেড়ে দিয়েছে। কী সুন্দর লাগছে ওকে!

আমি সত্যিই ওকে ভালোবেসে ফেলেছি?

ভয় পেয়ে গেলাম।

ঘেন্না করতে করতে ভালোবেসে ফেললাম নাকি?

৫৭ অমৃত

বউদিকে বাজারের ব্যাগ দিয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে বাবার সঙ্গে টিভি দেখতে বসলাম। বাবা মনোযোগ দিয়ে সিরিয়াল দেখছে। বাড়ির বউকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হচ্ছে। সবাই দাঁড়িয়ে আছে।

বাড়ির বউ কাঁদছে খুব। কঠিন সময়।

বাবা আগে এসব সিরিয়াল দেখত না। রিটায়ার হবার পর দেখতে শুরু করেছে। এই সিরিয়ালের জ্বালায় অফিস থেকে এসে আমি বাবার সঙ্গে বসতে পারি না।

বিরক্ত গলায় বললাম, “নিউজ চ্যানেলটা দাও না।”

বাবা বলল, “তুই টিভি কিনে ফেল। আমাকে দেখতে দে। জ্বালাস না এখন।”

আমি উঠতে যাব, এমন সময় বউদি এসে বলল, “এই তুমি আবার ঝগড়া করছ না আত্রেয়ীর সঙ্গে?”

আমি অবাক গলায় বললাম, "কেন বলো তো? কী হয়েছে?"

বউদি বলল, "তোমাকে আমি গোবিন্দভোগ চাল আনতে বললাম, তুমি মিনিকেট নিয়ে চলে এলে? তোমার কি মাথাটা গেছে?"

আমি বুঝলাম কেলো করে ফেলেছি। বললাম, "ঠিক আছে, নিয়ে আসছি।"

বাবা বলল, "ওকে বলে লাভ নেই, ওর দাদাও যখন প্রেম করত এসবই করত। একবার কাপড় কাচার সাবান আনতে বলায় ফিনাইল নিয়ে এসেছিল। এসব হয় বউমা। তুমি চিন্তা কোরো না।"

বউদি লজ্জায় পালিয়ে গেল। আমি উঠে দাঁড়ালাম। বাবা বলল, "এবারে ঝগড়া কী নিয়ে?"

আমি বললাম, "তুমি সিরিয়াল দ্যাখো না। এসব জেনে কী করবে?"

বাবা বলল, "সিরিয়াল দেখতে দেখতেই ঘরসংসারের খবর রাখতে হয়। ইন্দ্রের সভায় অপ্সরারা নাচে না? তাও কি সৃষ্টি চলে না?"

আমি বললাম, "ওসব কাল্পনিক ঘটনা। ওর সঙ্গে তোমার কি যোগ? ভুলভাল বোকো না তো। রিটায়ারমেন্টের পর তুমি কেমন যেন হয়ে যাচ্ছ। এসব সিরিয়াল মানুষে দ্যাখে?"

বাবা বলল, "গোরু ছাগলের মতো ঝগড়া করে প্রেম করার থেকে সিরিয়াল দেখা ভালো। যাক গে, আমার জন্য ফ্লেক নিয়ে আসিস এক প্যাকেট।"

আমি বললাম, "ওসব খেয়ো না। ডাক্তারবাবু বারণ করলেন না?"

বাবা রেগে গিয়ে বলল, "ডাক্তারবাবু নিজে সারাদিন দশ প্যাকেট খাচ্ছে আর আমাকে কী বলল, তাই নিয়ে পড়ে আছিস। আচ্ছা, গোটা প্যাকেট আনতে হবে না। খান পাঁচেক আনলেই হবে। আমার প্যান্টের পকেটে টাকা আছে, নিয়ে যা।"

আমি বললাম, "থাক থাক। আর টাকার গরম দেখাতে হবে না। নিয়ে আসছি।"

বাবা বলল, "হ্যাঁ রে, তুই কি আমায় শান্তি দিবি না? ঝগড়া করেছিস কেন? আমি ভাবছি বিয়ের কথা এগোব, তুই যদি এরকম করতে থাকিস তাহলে তো মহা সমস্যা হবে।"

আমি বাবার কথার উত্তর না দিয়ে দরজা খুলে রাস্তায় নামলাম।

পাড়ার মুদির দোকানে গিয়ে আবার ভুলে গেলাম কেন এসেছিলাম, বউদিকে ফোন করলাম। বউদি ধরল, "হ্যাঁ বলো।"

আমি বললাম, "তুমি কী আনতে বলেছিলে যেন?"

বউদি বলল, "মধুদাকে দাও। তোমাকে আর বলব না।"

আমি ফোনটা মুদির দোকানদার মধুদাকে দিলাম। মধুদা শুনে চাল দিয়ে দিল। আমি প্যাকেটটা নিয়ে বাড়ি এসে বউদির হাতে দিলাম।

বউদি বলল, "তোমার অবস্থা সঙ্গিন অমু। এরকম হাল করে ছেড়ে দিল তোমাকে মেয়েটা?"

আমি অন্যমনস্ক গলায় বললাম, "হুঁ।"

বউদি বলল, "বিয়ে করে নাও তাড়াতাড়ি। এভাবে যত দূরে থাকবে, তত ঝগড়া হবে। কাছে থাকলে কিচ্ছু হবে না। তখন একটা সিস্টেমে ঢুকে যাবে তো, অত সমস্যা হবে না।"

জ্ঞান শুনতে ভালো লাগছিল না। চুপচাপ সরে পড়ে ঘরে এসে দরজা দিলাম।

রাতে খেলামও না। ভালো লাগছিল না।

অনেক রাতে আত্রেয়ী মেসেজ করল হোয়াটসঅ্যাপে কয়েকটা। দেখলাম। উত্তর দিলাম না। ভালো লাগছিল না।

কয়েক মিনিট পরে আত্রেয়ী ফোন করল, "এই, কী হয়েছে তোমার? রিপ্লাই করছ না কেন?"

আমি বললাম, "ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।"

আত্রেয়ী বলল, "মিথ্যে কথা বলছ কেন? তুমি জানো না আমি মিথ্যে পছন্দ করি না? ঘুমিয়ে পড়েছিলে যখন তাহলে মেসেজগুলো সিন হল কী করে?"

আমি বললাম, "হয়ে গেছে কোনও ভাবে। টেকনিক্যাল ফল্ট হতে পারে ফোনের। তোমার কী খবর? ছেলেদের প্রতি বিতৃষ্ণা এখন কোন স্টেজে আছে? কমেছে না বেড়েছে?"

আত্রেয়ী একটু চুপ করে থেকে বলল, "তোমার মনে আছে অমৃত, আমি একসময় বলতাম আমি আদর পছন্দ করি না, কেউ আদর করার কথা বললেও আমার ভয় লাগে?"

আমি বললাম, "হুঁ।"

আত্রেয়ী বলল, "সেই আমিই তো বারবার তোমায় আদর করি, তোমার ঠোঁটে চুমু খাই, আমিই তো, তাই না?"

আমি বললাম, "হুঁ। তুমিই।"

আত্রেয়ী বলল, "তুমি তো আমাকে পালটে দিয়েছ অমৃত। আমি তোমার জন্য বসে থাকি, তোমাকে একটু ছুঁতে আমার কত ভালো লাগে। সেই তুমি আমাকে একটু সময় দিতে পারো না?"

কথাগুলো শুনে আমার সব কেমন গুলিয়ে গেল। বললাম, "কী হয়েছে তোমার?"

আত্রেয়ী বলল, "কিছু না। তুমি একটু বড়ো হও না, আমাকে একটু জড়িয়ে থাকো, তাহলেই হবে। আমি আর কিছু চাই না। একটু মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ো, কাছে রেখে দিয়ো... খুব বেশি দাবি তো নেই কোনও দিনই।"

আমি বললাম, "কী হয়েছে বলবে তো!"

আত্রেয়ী বলল, "আমার কিছু ভালো লাগছে না। একটু একটু তোমার কথাও মনে পড়ছে। আদর খেতে ইচ্ছা করছে।"

আমি অবিশ্বাসী গলায় বললাম, "সত্যি? না আমাকে শান্ত করার জন্য এসব বলছ?"

আত্রেয়ী বলল, "তুমি যেটা ভাববে।"

আমি বললাম, "রাতের কলকাতায় আমার বাইকের পেছনে বসে ঘুরবে?"

আত্রেয়ী কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বলল, "এসো।"

৫৮ অমৃত

ব্রেক আপে কি খুব কষ্ট হয়?

দেখা যাক হয় নাকি!

আমি এই রাতে ঠিক করলাম আত্রেয়ীর সঙ্গে ব্রেক আপ করব।

তৈরি হয়ে বাইক নিয়ে বেরচ্ছিলাম, আত্রেয়ী ফোন করল, ধরলাম, "হ্যালো।"

"তুমি কি বেরিয়ে গেছ?"

"এই বেরোচ্ছি, কেন বলো তো?"

"শোনো না, ইচ্ছা করছে না রাতে বেরোতে। বরং কাল বিকেলেই স্কুলে এসো। অবশ্য যদি অনিন্দিতাদির সঙ্গে কোথাও যেতে হয় তাহলে জানিয়ে দেব। পরে দেখা যাবে। আজ আর এসো না।"

আমি "আচ্ছা" বলে ফোনটা রেখে গুম হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ।

ভালোবাসায় দু হাতে তালি না বাজলে বড়ো বিপদ। যার সঙ্গে নিয়মিত দেখা হত, দেখা করার জন্য ছটফট করত, তার সঙ্গে যদি দেখা করতেই তার আর ইচ্ছে না করে তাহলে বুঝতে হবে সে সম্পর্কের মেয়াদ ফুরিয়েছে।

আমি বাইক রাখলাম না। বেরিয়ে গেলাম।

আত্রেয়ী বলত বটে ওর কাউকেই বেশিদিন ভালো লাগে না। আমার ক্ষেত্রেও তেমন হল তার মানে। ওর আমাকে আর ভালো লাগছে না। হতেই পারে। প্রতিটা সম্পর্কই তো সাপের খোলস ছাড়ার মতো হয়। হয়তো অন্য কাউকে ভালো লেগে গেছে ওর। হতে পারে। আমার মধ্যে তো অনেক সমস্যা আছে। আমি গোঁয়ার, একরোখা, পজেসিভ। এসব ওর মতো ইন্ডিপেন্ডেন্ট মেয়ে কেন মানতে যাবে?

কলকাতা শহরের বুক চিরে বাইকটা চলছিল। রাস্তায় গাড়ি কমে এসেছে। সায়েন্স সিটির কাছাকাছি চলে এসেছিলাম, একজন পুলিশ হাতছানি দিয়ে গাড়ি দাঁড় করাল। আমাকে বলল, "কাগজ দেখি।"

আমি গাড়ির ডিকি খুলতে গিয়ে কী মনে হতে পুলিশের দিকে তাকিয়ে দেখি আমার স্কুলের বন্ধু সব্য। আমি ডিকি বন্ধ করে বললাম, "কী রে ভাই, মাঝরাতে ঘুষ খাবার ধান্দা করছিস লজ্জা লাগে না?"

সব্য হেলমেটের ভিতর দিয়ে আমাকে দেখে বোঝেনি। বলতে যাচ্ছিল, "কে রে?"

আমি তড়িঘড়ি হেলমেট খুললাম। আমাকে দেখে হেসে ফেলে চেঁচিয়ে উঠল, "অমু নাকি! ওরে বাবা। বিরাট ব্যাপার তো!"

আমি বললাম, "ঘুষ খাচ্ছিস নাকি রে?"

সব্য বলল, “না, ঘুষের কিছু না। এই রাত্তিরে বাইকারসের জ্বালায় লোকজন অস্থির হয়ে পড়ে। রুটিন চেক আপ করছিলাম। তোর খবর কী? বিয়ে করলি?”

আমি বললাম, “নাহ। এখনও করিনি। তুই?”

সব্য বলল, “করেছি। একটা ছেলেও আছে বছর চারেকের। আয় ভাই, চা খেয়ে যা।”

থানার ভিতর নিয়ে গেল সব্য। চেয়ারে বসিয়ে যত্ন করে চা খাওয়াল। বলল, “পুলিশের চাকরি যে কী জিনিস ভাই, যারা করে তারাই জানে। কত রকম লোক, কত রকম ক্রাইম, বাড়ি গিয়ে নিজের বউয়ের সঙ্গে কথা বলতে গিয়েও খিঁচিয়ে উঠি। কালচারাল শকের মধ্যে দিয়ে যাই প্রতিদিন। ভালো লাগে না জানিস তো। সিরিয়াসলি ভালো লাগে না। তবু পেটের ব্যাপার। করতেই হবে। কী আর করার। তুই এত রাতে বেরিয়েছিস কেন?”

আমি বললাম, “গার্লফ্রেন্ডের সঙ্গে ঝামেলা হয়েছে। মেজাজ ঠিক করতে ঘুরছি।”

সব্য হো হো করে হেসে উঠে বলল, “বিরাট ঝামেলা বুঝি?”

আমি বললাম, “হ্যাঁ সেরকমই।”

সব্য বলল, "কী করে সে?"

আমি বললাম, "অঙ্কের টিচার।"

সব্য চোখ বড়ো বড়ো করল, "খেয়েছে। খুব রাগি?"

আমি বললাম, "না সেরকম না।"

সব্য বলল, "তা ঝামেলা কী নিয়ে হল?"

আমি বললাম, "হয়েছে। ওই আর কি। চা-টা বেশ ভালো। থানার জল খাব কোনও দিন ভাবিনি। তুই তো থানার চা খাইয়ে দিলি ভাই।"

সব্য বলল, "তা ঠিক। এই একটা জিনিসই ভালো। জাগতে হবে। এসব জায়গা ভীষণ সেন্সিটিভ জানিস তো। কলকাতা পুলিশের রেসপন্সিবিলিটি মারাত্মক, আর পুরোপুরি থ্যাংকলেস জব। কাজ ভালো করলে বাহবা নেই। পান থেকে চুন খসলে তো কাগজ খুললেই দেখতে পাস।"

আমি সব্যর দিকে তাকিয়ে বললাম, "ব্রেক আপ করব ভাবছি।"

সব্য আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে বলল, "মানে?"

আমি বললাম, "ব্রেক আপ করব। ব্রেক আপ করলে কি খুব কষ্ট হয়?"

সব্য বলল, "এসব কেন ভাবছিস?"

আমি বললাম, "আই থিংক শি লস্ট হার ইন্টারেস্ট ইন মি। ওর এখন অনেক শুভানুধ্যায়ী আছে। তারা কানে কী মন্ত্র দিচ্ছে কে জানে।"

সব্য বলল, "এটা ঠিক। মেয়েদের প্রচুর শুভানুধ্যায়ী থাকে। তারা আবার ভালোর থেকে খারাপটা বেশি চায়। তবে কী জানিস তো ভাই, ব্রেক আপ করলে ভেবে করিস। ব্রেক আপের পর ছেলেটা দৌড়ে বেড়ায়। মেয়েদের অনেক কাঁধ জুটে যায়, মাথায় হাত বুলিয়ে দেবার ছেলে ঠিক জুটে যাবে। তখন হাত কামড়াস না।"

আমি চায়ের গ্লাসটা টেবিলে রেখে বললাম, "আমি ব্রেক আপ করব, তারপর কাঁধ জুটুক না কী জুটুক তাতে আমার ছেঁড়া যায়। কাল থেকে আমি ফোন নাম্বার চেঞ্জ করে দেব। আসি রে।"

সব্যর হতভম্ব চোখের সামনে দিয়ে উঠে বেরিয়ে এলাম।

৫৯ জীমূতবাহন

নচিকেতার একটা গানের লাইন, "ভালোবাসা আসলে একটা চুক্তি, জেনো অনুভূতি-টনুভূতি মিথ্যে, কেউ দেবে নিরাপত্তা, কেউ বিশ্বাস, আসলে সবাই চায় জিততে।"

আমি কি জিততে চেয়েছিলাম? চাইনি তো? এমনকি বিয়ের কথাও ভাবিনি কোনও দিন। হঠাৎ করে বিয়েটা হয়ে গেল। স্বপ্নও দেখিনি কোনও দিন কাউকে নিয়ে। একটা দুঃস্বপ্ন এসে সব কিছু ছারখার করে দিয়ে চলে গেল। বউ বলে যাকে ডাকি, সে বউ না। যার পাশে শুয়ে ঘুমাই, সে কেউ না আমার। এক সঙ্গে থাকলে তো কিছু আশা তৈরি হয়, সেটা স্বাভাবিক। একটা কুকুর পুষলেও সে কুকুরের প্রতি একটা মায়া আসে। আর এ তো জলজ্যান্ত একটা সুন্দরী মেয়ে। হুইস্কি খেয়ে কী সুন্দর কম্বল টেনে ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি মাথা ভর্তি নেশা নিয়ে জেগে বসে আছি মাঝরাতে।

বৃষ্টিটা আবার নেমেছে। বন্ধুরা হলে বলত এটা বৃষ্টি না রে পাগলা, জীমূতের চোখের জল। সবাই তো খেপিয়েই এল চিরকাল। গার্লফ্রেন্ড নেই বলে, লাজুক ছিলাম বলে। এবারে সবাই বলবে বউ পালানো জীমূত। কী মজার একটা ব্যাপার হবে। সবাই তো খোরাক করতে ভালোবাসে।

মানুষের দুর্দশায় পাশে থাকার চেয়ে তার গায়ে আরও কাদা ছুড়লে মানুষ বেশি খুশি হয়। একটা লোক, যে সুদূর ভুবনেশ্বরে বসে আমার জীবনে কী হবে, আমার বউ কী

করবে ঠিক করে দেবে, আর একটা ভেড়া আমি, সারাজীবন সেভাবে চলব। আমার হৃদয় বলে কিছু থাকবে না, সেটা যেন পাথর দিয়ে তৈরি হতে হবে, ওরা তো এটাই ভেবেছিল। যেন কিছু টাকা ধরে দিয়ে ক্ষতিপূরণ দিলেই মানুষের সব ক্ষত নিরাময় হয়ে যায়। কত সহজ সব কিছু।

পার্শ্বচরিত্র হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য পৃথিবীতে এসেছি। বরাবরই এরকম কপাল। ভালো রেজাল্ট করেও মনের মতো চাকরি পেলাম না। বাড়িতে টাকা দিয়েই সব টাকা শেষ হয়ে যায়। শখ, আহ্লাদ কিছুই তো সেভাবে পূরণ করলাম না কোনও কালে। হুট করে বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের পর থেকে যা যা হয়ে চলেছে, তা কোনোটাই আমার হাতে নেই। সব যেন মাদারির খেলা চলছে। নিষ্ঠুর কেউ একজন বিচ্ছিরি হাসতে হাসতে সব নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে।

টিভি চালালাম। টিভিতে টেনিস চলছে। এক কেরিয়রের শেষ দিকে চলে যাওয়া খেলোয়াড় কী চমৎকার খেলছেন! মুগ্ধ হয়ে দেখছিলাম। এদের জীবনে কোনও দুঃখ কষ্ট নেই? সারাদিন খেলে গেলেই হল? কষ্ট তো আছে নিশ্চয়ই। ভেঙে যাবার কষ্ট, দিন ফুরিয়ে যাবার কষ্ট, একজন মানুষের তো সব কিছু মসৃণ হতে পারে না। শৃঙ্গে যে ওঠে, তারই চাপ সবথেকে বেশি। ওখানে তো একজনই থাকবে। তাকে প্রাণপণে সরানোর চেষ্টা করবে সবাই। সে ক্ষতবিক্ষত হবে, লড়াই করে যাবে, রক্তাক্ত হবে, জিতলেই হবে না, সে লড়াই সর্বক্ষণের।

অনিরুদ্ধকে যেভাবে ঠেকিয়েছি বউয়ের কাছে পৌঁছোতে, সেও তো অনেকটা সেরকমই। মুহূর্তের জয় হয়েছে আমার, জয় বলাও ঠিক না, বউ তো জানে না। কিছুই জানে না। ও জানলে কি আর আমার এই ব্যবহার মেনে নিতে পারত? অনিরুদ্ধকে ও ভীষণ ভালোবাসে। জোর করে একটা সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার কোনও মানে হয় না। কলকাতা ফিরে সমস্ত ঝামেলা মিটিয়ে ফেলতে হবে।

টেবিলে রাখা গ্লাসে খানিকটা মদ বেঁচে ছিল। সবটা খেয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। বৃষ্টিটা ধরেছে। শব্দ কমে এসেছে। কোটটা পরে মাফলারটা মাথায় নিয়ে দরজা খুলে বেরোলাম।

ঠান্ডা আছে, শহরটা পুরো নিঝুম নিস্তব্ধ হয়ে আছে। রুমের দরজা বন্ধ করে সেদিকে একবার তাকালাম। একটা লাইন মনে পড়ে গেল, "কে মোরে ফিরাবে অনাদরে কে মোরে ডাকিবে কাছে।"

আমাকে কে কাছে ডাকবে? আমার তো কেউ নেই। এই ঘরেও আমার কোনও কাছের মানুষ নেই।

ফিরে কী হবে আর?

ধুস!

রাস্তার দিকে হাঁটা লাগালাম।

ফিরে আর কী হবে?

৬০ আত্রেয়ী

অমৃতকে ইচ্ছা করেই বারণ করেছিলাম। ওর অফিসে ছুটি নেই। রাস্তায় বাইক নিয়ে বেরোলেই ঠান্ডা লাগত।

প্রথমে রাজি হয়েও তাই ফোন করে বলে দিয়েছিলাম আসতে হবে না।

সমস্যা হল তারপর হোয়াটসঅ্যাপে পাচ্ছি না, ফেসবুকেও অফ দেখাচ্ছে।

হাসলাম। এই সমস্যা ছেলেটার। এত রেগে যায় অল্পতে যে সে রাগ বাগে আনতে অবস্থা খারাপ হয়ে যায়।

আবার ফোনে না পেলে আমারও অস্থির লাগে। অভিমানও হয়। একটু তো কথা বলে ঘুমোনো যেত। অনিন্দিতাদিকে নিয়ে যা গেল, এখন একটু অমৃতর সঙ্গে শেয়ার করলে মাথাটা ঠান্ডা হত। ছেলেটা এরকমই। ভীষণ অবুঝ। বাচ্চাদের মতো। আমার এখন মন খারাপ লাগছিল। মনে হচ্ছিল চলে গেলেই হত। অন্তত জড়িয়ে ধরে কিছুক্ষণ থাকতে

পারতাম। ভালোবাসায় যে চুমু খাওয়া, জড়িয়ে ধরাও এত গুরুত্বপূর্ণ, আগে বুঝিনি। শরীর ব্যাপারটাকেই ভয় পেতাম খুব।

অমৃতর সঙ্গে সম্পর্কটা হল ধূমকেতুর মতো। কীভাবে কোত্থেকে সব হয়ে গেল।

এক মুহূর্তও মনে হয় কাছছাড়া না করি। কিন্তু কী করব? অনিন্দিতাদির ব্যাপারটাই এমন হল যে সে সময়টা মাথা কাজ করছিল না। অনিরুদ্ধদাকে দেখে সবার উপর অবিশ্বাস হতে শুরু করল।

মানুষ এত খারাপ হতে পারে? এত? আমি নিশ্চিত, অনিন্দিতাদির সঙ্গে আবার কোনও সমস্যা তৈরি হবে। হতেই হবে। একটা মানুষ, যে বিয়ের পরে দিনের পর দিন নিজের বউকে লুকিয়ে অন্য মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক করতে পারে, সে এত সহজে হাল ছেড়ে দেবে না। সে আবার ময়দানে নামবে অন্য কোনও গেম প্ল্যান নিয়ে। বিকেল থেকে তিনবার ফোন করেছে আমাকে। অনবরত মেসেজ। সিম চেঞ্জ করতে হবে বুঝতে পারছি। একবার লয়ালটি টেস্ট করতে গিয়ে সিমটার বারোটা বাজালাম। ব্যাংকেও এই নাম্বার দেওয়া আছে। আবার নতুন সিম নিতে হবে। অমৃতর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে যদি দেখা যায় এই পারভার্ট ফোন করেছে, তাহলে চিত্তির। অমৃত যা পজেসিভ।

আবার হাসি পেল। আচ্ছা, ছেলেটা কি জানে, সারাদিন ধরে আমি ওর কথাই ভাবি? কী করছে, কী খাচ্ছে, কীভাবে রাগছে, সব... সব ভাবি?

চোখ বন্ধ করে আমি অমৃতকে অনুভব করতে পারি। ঠোঁটটা এগিয়ে আনছে আমার ঠোঁটে। আমি ওর কোমর জড়িয়ে ধরি। আমার ঘাড়ে চুমু খাওয়ার সময় আমি যেভাবে ওর স্পর্শ অনুভব করি, সে স্পর্শের কথা ভাবার চেষ্টা করি প্রাণপণে। ওর চোখে আমার চোখের দিকে তাকালে যে আকুলতা দেখতে পাই, তা কী করে বোঝাই? ভালোবাসি তো বারবার বলতে হয় না। চোখের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। একজন মানুষের চোখেই সব থাকে। একটা মেয়ের থেকে মানুষের চোখ বোধহয় আর কেউ ভালো করে বুঝতে পারে না। অমৃত যখন আমার জন্য অপেক্ষা করে ওর বাইকটা নিয়ে, আমি ওর চোখদুটোই দেখি। কী অধীর আকুলতায় আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। এ ছেলে যখন আমার সঙ্গে সংসার করবে, এমনই থাকবে? থাকতেই হবে। না থাকলে কিল ঘুসি মেরে ঠিক করে দেব। ভীষণ আদর করতে ইচ্ছা করছিল আমার।

ঘুমাতে যাবার আগে আর-একবার ফোন চেষ্টা করলাম, যদি পাগলটা অন করে!

নাহ, করেনি। খেপেছে আবার। কী করছে কে জানে!

ছটফট করতে করতে ঘুমালাম।

কেন এরকম করে? জানে না কেন, কেন বোঝে না, আমিও ওকে ততটাই ভালোবাসি যতটা ও ভালোবাসে? এরকম পাগলামি করলে কী হয়?

মাঝরাতের দিকে ঘুম এসেছিল। সকালে বাবা দরজা ধাক্কিয়ে ঘুম ভাঙাল। আশা হল হঠাৎ করে, সেদিনের মতো এল নাকি পাগলটা?

ধড়মড় করে উঠে দরজা খুলে বললাম, "কী হল? কটা বাজে?"

বাবার মুখটা কেমন যেন, আমার বুকটা ধড়াস করে উঠল।

বললাম, "কী হল?"

বাবা বলল, "মা, ফ্লাইওভারে অমৃতর অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে কাল রাতে।"

আমি বললাম, "তারপর?"

বাবা চুপ করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

৬১ আত্রেয়ী

একটা দিন যে কখনও এরকম হতে পারে ভাবতে পারিনি।

মা যেদিন চলে গেছিল, সেদিনও হয়তো এরকমই ছিল। মনে করতে পারি না, চাইও না। কিন্তু একটা রাত আর একটা দিনের মধ্যে যে এতটা তফাত থাকতে পারে, আমি কোনও দিন ভাবতে পারিনি।

বাবা যখন আমাকে ট্যাক্সি করে নিয়ে যাচ্ছিল, শক্ত করে ধরে ছিল। আমি কথা বলতে পারছিলাম না। না পারছিলাম কাঁদতে। চোখ থেকে যে ক্রমাগত জল পড়ে যাচ্ছিল সেটা বুঝছিলাম, কিন্তু মোছার শক্তিটুকু ছিল না।

নার্সিং হোমে অসংখ্য লোক, কেউ ডাক্তার দেখাতে এসেছেন, কেউ বা আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে।

আমরা যখন পৌঁছোলাম, তখন ভিজিটিং আওয়ারস শুরু হয়েছে।

আমি ভাবতে ভাবতে এসেছি, ওকে দেখেই বকব, অনেক কিছু বলব, খুব রাগ করব, কেন আমি যাব না বলার পরেও একা একা বাইকে করে বেরিয়েছিল।

গেটের সামনে বাবা অধৈর্য হয়ে ফোন করল কাউকে। আমি কাউকে চিনতে পারছিলাম না। শুধু দেখলাম একজন পুলিশের পোশাক পরিহিত ভদ্রলোক আমাদের নিয়ে একটা জায়গায় দাঁড় করালেন। আপাদমস্তক সাদা কাপড় জড়ানো একটা শরীর। আমার

ভিতরটা পাক দিয়ে উঠছিল। বাবা আমার হাত ধরে বলল, "চল, এখানে দাঁড়াতে হবে না।"

আমি বাবার দিকে বোবা দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে আর্তনাদ করে উঠলাম "মানে? কী বলছে? কোথায় ও?"

বাবা আমাকে সরাতে সরাতে বলল, "ঠিক আছে। এখন চল।"

আমি বাবাকে ঠেলে সরিয়ে সাদা কাপড়ে ঢাকা শরীরটার দিকে দৌড়ে গিয়ে কাপড় সরালাম। মাথায় চাপ চাপ রক্ত, ব্যান্ডেজ দেখলাম হয়তো বা, হয়তো সামান্য চিকিৎসা হতে হতেই...

হ্যাঁ...

আমি বসে পড়লাম নার্সিং হোমের মেঝেতেই।

এই মুখটা যে বড্ড চেনা। এই শরীরটার বুকে মাথা রেখেই তো নিশ্চিন্ত হয়েছি কতবার। এই ঠোঁটে চুমু খাবার জন্যই তো স্কুলের প্রতিটা মুহূর্ত অপেক্ষা করে গেছি আমি। এই তো সেই লোকটা, সেই পাগলটা যে আমার সঙ্গে কোনও কারণ ছাড়াই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ঝগড়া করে গেছে। কত রাগ, কত!

আবার সেই ভোরবেলা বাড়িতে এসে অপরাধীর মতো দাঁড়িয়েছে। "এই আমার না ভুল হয়ে গেছে বুঝলে, আমি তো মাথাগরম লোকই, তুমি আমাকে সামলাতে পারবে তো আত্রেয়ী? তুমি আমার নদী তো, একটামাত্র নদী, আমার সবচেয়ে আদরের নদী। জানো তো, আমি চোখ বন্ধ করলে তুমি আসো, প্রতিটা রাতে যখন দুঃস্বপ্নে উঠে বসে থাকি, আমি চোখ বন্ধ করে তোমার কথা ভাবি। তুমি যখন আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দাও, আমার মাথাটা বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরো, আমি সব ভুলে যাই বিশ্বাস করো। তুমি তো জানো, আমি যতই ঝগড়া করি, যতই রাগারাগি করি, সব কিছুর পরে আমি আসবই ফিরে তোমার কাছে। তুমি না তাড়ালে আমি যাব না, আর যদি কেউ তোমাকে বিয়ে করতে আসে না, তার ঠ্যাং ভেঙে রেখে দেব। পুঁতে দেব শালাকে। কেউ ছোঁবে না তোমায় আমি ছাড়া। কেউ দেখবে না তোমায় আমি ছাড়া। কেউ ভালোবাসবে না, কেউ না। আত্রেয়ী, আমার নদী... পাগলটা খুব জ্বালায় না তোমায় সোনা? আচ্ছা আমাদের ছেলে হলে কী নাম দেবে? আমি একটা নাম ভেবে রেখেছি জানো? খুব কঠিন একটা নাম, শ্রুতকীর্তি। ভালো নামটা? তোমার ভালো লেগেছে? আচ্ছা নাকটা কার মতো হবে? তুমি যে বলো তোমার নাক বোঁচা, একবারেই না। তোমার নাকই আমার চাই। তোমার চোখ চাই, তোমার ভালোমানুষিটা চাই আমাদের সন্তানের মধ্যে। আচ্ছা, শোনো না, একটা ছেলে একটা মেয়ে, ঠিক হবে না? মেয়ে তো বাবার ন্যাওটা হবে, ছেলে নাহয় তোমার হবে। আমরা খুব ঘুরব কিন্তু। এই আমি যে তোমায় ভালো রাখব সব সময় তা না কিন্তু, মাঝে মাঝে তুমুল ঝগড়া করব। তুমুল। তারপর অবশ্য দিনের শেষে পরস্পরের রাগ ভাঙাব। আত্রেয়ী... ভালোবাসি, ভালোবাসি, ভালোবাসি, ভালোবাসি,

ভালোবাসি, ভালোবাসি, ভালোবাসি, ভালোবাসি, ভালোবাসি, ভালোবাসি। একশো বা ভালোবাসি, হাজারবার ভালোবাসি, লক্ষবার, কোটিবার ভালোবাসি। এই আজ স্কুলের পরে দেখা করবে তো?”

জ্ঞান ফিরল যখন বাবা বাড়িতে নিয়ে এসেছে।

সব শেষ হয়ে গেল আমার। সব।

৬২ জীমূতবাহন

মাঝরাতে একটা পাহাড়ি ছোটো শহরের রাস্তাঘাট কেমন হতে পারে সে সম্পর্কে কোনও ধারণা ছিল না। কলকাতায় প্রচুর মানুষের শহর। গোটা রাতেই ছিটকে ছুটকে কেউ না কেউ বেরিয়ে যাবেই। তার ওপর মাতাল আছে, রাস্তাঘাটে শুয়ে থাকা লোক তো আছেই।

রাবংলার মাঝরাত তেমন নয়। বৃষ্টি থামার পর কুয়াশা ঘনিয়েছে, বেজায় ঠান্ডা, রাস্তার কুকুরেরা পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয় নিয়ে কোথায় যেন গা ঢাকা দিয়েছে। কয়েকটা হোটেলের ঘরে আলো জ্বলছে বটে, তবে কোনও শব্দ আসছে না।

হোটেল থেকে বেরিয়ে অনেকটা রাস্তা হেঁটে মোড়ের মাথায় এসে দেখলাম বেশ চার-পাঁচটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। গাড়িগুলোর ভিতর উঁকি মারতে দেখা গেল একটা গাড়ির

ভেতর ড্রাইভার মোবাইলে সিনেমা দেখছে। আমাকে দেখে ভূত দেখার মতো চমকে উঠে কাচ নামিয়ে হিন্দিতে বলল, "কী চাই?"

আমি বললাম, "এন জে পি যাবে?"

আমাকে পাগল ঠাওরাল হয়তো। কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বলল, "সকালে যাবেন। এখন কে যায়?"

আমি বললাম, "যা লাগে তার দ্বিগুণ টাকা দেব। যাবে?"

এবার ড্রাইভার নড়েচড়ে বসে বলল, "এখন কেন যাবেন?"

আমি বললাম, "কাজ পড়ে গেছে বাড়িতে। বাবা অসুস্থ হয়ে পড়েছে। কলকাতা ফিরতে হবে সকালের মধ্যে।"

লোকটা কী বুঝল কে জানে, আমাকে বলল, "ওহ, পিতাজি অসুস্থ হয়ে গেছে, তাহলে বেশি টাকা নেব কেন? উঠে বসুন। যাচ্ছি।"

আমি তো পুরুষমানুষ। পুরুষদের নাকি কাঁদতে নেই।

লোকটার এই কথাটা শুনে হঠাৎ করে আমার দু চোখের কোণ ভিজে উঠল। চেনে না, জানে না একটা লোক, আমার বাবা অসুস্থ, তাও মিথ্যে করে বলা, একবার যাচাই করারও প্রয়োজন বোধ করল না, আমি বলেছি বলে যেতে রাজি হয়ে গেল?

লোকটা বলল, "রাস্তার হাল ভালো না। তবু আপনার পিতাজি অসুস্থ বলে যাব। উঠুন।"

আমি বোলেরো গাড়িটায় উঠলাম। লোকটা গাড়ি স্টার্ট দিল। কুয়াশা চিরে গাড়ি এগিয়ে চলল। এগিয়ে চলল রাবংলা ছেড়ে। এগিয়ে চলল এমন একটা মেয়েকে পিছনে ফেলে, যাকে আমি বউ ডাকছিলাম।

রাস্তায় ট্রাক যাচ্ছে, খুব সন্তর্পণে গাড়ি চালাচ্ছে ড্রাইভার। আমার সব কিছু এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল। একটা উদ্দেশ্যহীন জীবন মানুষ কেন বাঁচে? সব কিছু শেষ হয়ে যাবার পরেও মানুষ কি আদৌ বেঁচে থাকে, না তাকে বেঁচে থাকার অভিনয় করে যেতে হয় প্রতিনিয়ত?

অনিন্দিতা কী করছে এখন? একটা চাকরিহীন মেয়ে তো সব জেনেশুনেও থেকে যেতে পারে এই ধরনের জানোয়ারের সঙ্গে, অনিন্দিতা কেন থাকতে যাবে? ছেড়ে দিয়েছে অনিরুদ্ধকে? কষ্ট পাবে না?

একগাদা চিন্তা মাথায় ঘুরতে শুরু করল। ড্রাইভার বলল, "রাতে গাড়ি চালাতে গিয়ে সমস্যা হল চোখ বন্ধ হয়ে আসে। আপনি চেষ্টা করুন না ঘুমাতে। আমার চোখ বন্ধ হয়ে গেলে নিউজপেপার হেডলাইন হয়ে যেতে হবে দুজনকে।"

আমি বললাম, "তা ঠিক।"

মদের নেশায় আমারও ঘুম পাচ্ছিল। বেশ খানিকটা রাস্তা যাবার পর মাথায় পোকা নড়ে উঠল। নিজের ফোনে একটা ফেক কল করলাম। নিজেই ভুলভাল বকে ড্রাইভারকে বললাম, "এন জে পি যেতে হবে না। বাবার খবর এসেছে। ঠিক আছে এখন। রাবংলা ফিরে চলুন।"

ড্রাইভার সজোরে ব্রেক কষে গাড়ি থামিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনি পাগল?"

আমি ভালো মানুষের মতো মুখ করে বললাম, "ফোন এসেছিল দেখলেন তো।"

ড্রাইভার মাথায় হাত দিয়ে বলল, "আপনি আসলে পাগল। আমার বোঝা উচিত ছিল।"

আমি বললাম, "আসলে বউকে ফেলে এসেছিলাম হোটেলে, এখন মনে পড়ল।"

ড্রাইভার হাত নেড়ে বলল, "জীবনে বিরাট শিক্ষা হয়ে গেল। মাঝরাতে পাগল আর মাতালের পাল্লায় পড়লে কোথাও যেতে নেই। আপনি শিওর মদ খেয়েছেন। এবার কিন্তু আমি এন জে পি যাওয়ার ফুল টাকা নেব।"

আমি বললাম, "আচ্ছা সে দেব। আমি খুব দুঃখিত।"

গোটা রাস্তা গজগজ করতে করতে ড্রাইভার রাবংলা ফিরে এল।

ভোর হয়ে গেছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যাচ্ছে। সব হোটেলের ছাদে লোকজন তুমুল উৎসাহে সেটা দেখছে।

আমি হোটেলে ফিরে এসে রুমের বাইরে দাঁড়ালাম। বেশ কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে কলিং বেল টিপলাম।

বউ দরজা খুলল।

আমার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বলল, "সারারাত তুমি কোথায় গেছিলে? তুমি জানো আমার মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেছিল, আমি আর ঘুমাতে পারিনি ভয়ে?"

আমি ঘরে ঢুকে বললাম, “আমি কলকাতা চলে যাচ্ছিলাম। শেষ পর্যন্ত আর যাওয়া হল না।”

বউ বলল, “ওহ। পালিয়ে যাচ্ছিলে?”

আমি বললাম, “ওইরকমই। তোমাকে একটা কথা বলা হয়নি। অনিরুদ্ধ তোমাকে ফোন করছিল। আমার নাম্বার জোগাড় করেছে। আমি তোমাকে ফোন দিইনি। আটকে দিয়েছি। তুমি ওর সঙ্গে কথা বলে নাও। চিন্তা করছে হয়তো।”

বউ আমার দিকে তাকিয়ে বলল, “আমি কী করে ফিরতাম তুমি ভাবোনি?”

আমি বললাম, “না। গিয়ে অনিরুদ্ধকে জানিয়ে দিতাম। হানিমুন করতে চলে আসত।”

বউ বলল, “তোমার ওকে খুব হিংসা, না?”

আমি বললাম, “না। হিংসা হবার কিছু নেই তো। সোনাগাছির বেশ্যাদেরও বাবু থাকে। তা বলে কি অন্য লোকেরা সে বাবুদের ঘেন্না করে?”

বউ কথাটা শুনে বসে পড়ল খাটে, “তুমি আমায় বেশ্যা বললে?”

আমি বললাম, “না, তোমায় বলিনি। জাস্ট একজাম্পল দিলাম। শোনো, আমার এই ভুলভাল খেলা আর ভাল্লাগছে না। এই খেলাটা শেষ হোক। আজ ফিরে চলো। গিয়ে যা খুশি করো তুমি, আমাকে মুক্তি দাও। আমি আর ঘুরতে চাই না।”

বউ কেঁদে ফেলেছিল। কথা বলতে পারল না।

৬৩ অমৃত

রাতের কলকাতা শহরে বাইক চালানোর মজাই আলাদা। সব্যর সঙ্গে চা খেয়ে যখন বেরোলাম, রাস্তায় গাড়ির সংখ্যা কম। হুশহাশ করে কয়েকটা গাড়ি পেরিয়ে যাচ্ছে পাশ দিয়ে। বাইক নিয়ে বেশ খানিকক্ষণ এদিক সেদিক গেলাম। সল্টলেক, রাজারহাট হয়ে এয়ারপোর্টের রাস্তায় ঢুকলাম।

বাইকটা পার্ক করে এয়ারপোর্টের বাইরে খানিকক্ষণ ঘুরে ইচ্ছা হল কোথাও একটা ঘুরে আসি। ভোরবেলা গৌহাটির ফ্লাইট দেখাচ্ছে। চলে যাব? আমার বন্ধুরা গতবছর তাওয়াং গেছিল। ছবি দেখিয়েছিল। ঠিক করেছিলাম আত্রেয়ীকে নিয়ে যাব।

আর গিয়ে কী হবে? সেই তো ব্রেক আপ করে দেব। মানুষজন কত তাড়া নিয়ে এত রাতেও এয়ারপোর্টে ঢুকছে।

ধুস। কী হবে কোথাও গিয়ে যদি আত্রেয়ীকে নিয়েই না যেতে পারি? দরকার নেই।

বেরিয়ে গেলাম বাইক নিয়ে আবার। ভি আই পি রোড ফাঁকা। পুলিশের গাড়ি দুবার দাঁড় করাল। কাগজপত্র দেখল। একজন বলল, "কী কেস ভাই এত রাতে?"

আমি বললাম, "বাবা ভরতি আছে, দেখতে যাচ্ছি।"

আর কোনও প্রশ্ন করল না। ভি আই পি রোড হয়ে, ফাঁকা ই এম বাইপাস হয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। বাড়ি নিস্তব্ধ। তালাবন্ধ।

চাবি নিয়ে গেছিলাম। ঘরে ঢুকে শুলাম।

ঘুম আসছে না। আত্রেয়ী আর আমার ছবিগুলো বের করে দেখতে লাগলাম। আমাকে পরম নিশ্চিন্তে জড়িয়ে ধরে আছে। আত্রেয়ী আমাকে ভালোবাসে না!

আমার রাগ হল। আবার সেই গোঁ। কেন আমাকে ফোন করছে না ঠিক করে? কেন দেখা করছে না? এরকম কেন করবে আমার সঙ্গে? কেন অন্য লোকের সঙ্গে কথা বলবে? কেন আমাকে ফোন করবে না? কেন কেন কেন?

উঠে বসে রইলাম।

বিরক্তি লাগছে। জামাকাপড় পরে নিলাম আবার।

ভোর হয়েছে। বাইক বের করলাম। আত্রেয়ীদের বাড়ির দিকে রওনা দিলাম।

পৌঁছে দেখছি আত্রেয়ীর বাবা বাড়ির সামনে পায়চারি করছেন।

আমাকে দেখেই হেসে ফেলে বললেন, "তোমরা পারো সত্যি। দিনে কবার ঝগড়া হয় বলো তো তোমাদের?"

আমি মাথা চুলকালাম।

আত্রেয়ীর বাবা বললেন, "যাও, ওর ঘরে গিয়েই ডেকে দাও। এই বুড়ো মানুষটাকে আর এর মধ্যে জড়িয়ো না। নিজেদের কেস নিজেরা মেটাও। আমি আজকেই তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলব। তোমরা সংসার করো, তুমুল ঝামেলা করো, যাই করো, নিজেরা করো। আমি নেই এর মধ্যে। উফ। চা খাবে?"

আমি মাথা নেড়ে ওদের বাড়ির ভেতর দৌড় লাগালাম।

আত্রেয়ীর ঘর বন্ধ ছিল। আমি নক করলাম।

খুলছে না। আমি চ্যাঁচালাম, "আত্রেয়ী, এই আত্রেয়ী।"

দরজা খুলল।

আত্রেয়ী ফ্যালফ্যাল করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। বিস্ফারিত চোখে। আমি বললাম, "কী হয়েছে? আরশোলা ঢুকেছে ঘরে?"

আত্রেয়ী ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল। কাঁদতে কাঁদতে আমার বুকে জোরে জোরে ঘুসি মারতে শুরু করল।

আমি অবাক হয়ে বললাম, "এই কী হয়েছে? এরকম করছ কেন? কী হয়েছে বলবে তো?"

আত্রেয়ী চোখের জলে আমার জামা ভিজিয়ে দিচ্ছিল। আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, "তুমি খুব খারাপ। খুব। আমিও খুব খারাপ। এই তুমি একদম বাইক চালাবে না আজ থেকে।"

আমি হতভম্ব হয়ে বললাম, "মানেটা কী?"

আত্রেয়ী ধমক দিল, "যা বলছি শোনো। একদম বাইক চালাবে না।"

আমার কপালে ঠোঁটে গলায় চুমু খেতে লাগল আত্রেয়ী।

আমি ঘাবড়ে গিয়ে বললাম, "এই পাগলি, বাবা আছেন তো, এখনই চলে আসবেন।"

আত্রেয়ী বলল, "আসুক। তুমি বলো আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না। বলো সত্যি করে।"

আমি বললাম, "আচ্ছা বাবা, যাব না বললাম তো।"

আত্রেয়ী আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে থাকল।

আত্রেয়ী

অমৃত লাজুক লাজুক মুখে আমার খাটে বসে আছে। আমি কাঁদছিলাম তখনও।

অমৃত অস্বস্তিতে পড়ছিল। ভাবছিল বাবা যদি চলে আসে। আমি দরজা ভেজিয়ে দিলাম। অমৃতকে জড়িয়ে ধরলাম।

অমৃত বলল, "এই আত্রেয়ী, কী পাগলামি করছ বলো তো? আমাকে একটু খুলে বলবে কী হয়েছে?"

আমি বললাম, "আমি তোমার সঙ্গে দুদিন কথা বলিনি। কালকেও তোমাকে বারণ করে দিয়েছিলাম আমাদের বাড়ি আসতে। আমার সাবকনশাস মাইন্ড যে আমার ভেতরে বিচ্ছিরি একটা অপরাধবোধ তৈরি করছিল আমি বুঝতে পারিনি। আমি তোমাকে নিয়ে ভীষণ খারাপ একটা স্বপ্ন দেখেছি।"

অমৃত হেসে ফেলে বলল, "আমি মরে গেছি এরকম দেখেছ?"

আমি ওর মুখে হাত দিয়ে বললাম, "প্লিজ বোলো না। প্লিজ। আমার ভালো লাগছে না কিছু। একদম ভোরবেলা এই স্বপ্নটা দেখলাম।"

অমৃত বলল, "এইসব ভোরের স্বপ্ন টাইপ মিথ বিশ্বাস করতে নেই। পাগল কোথাকার। শোনো না, দরজাটা খুলে দাও, বাবা কী ভাববেন বলো তো?"

আমি উঠে দরজা খুললাম।

অমৃত বলল, "আমি সত্যিই কালকে রাগ করেছিলাম। ঠিক করেছিলাম তোমার সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক রাখব না। মনে হচ্ছিল তুমি যেন আমাকে অ্যাভয়েড করছ। সারাক্ষণ এটাই ভেবে যাচ্ছিলাম যে তুমি আমাকে আর চাও না। ভীষণ রাগ হচ্ছিল তোমার ওপর। তারপর যত রাত পেরোতে লাগল, আমি বুঝতে পারলাম, তোমাকে ছাড়া

আমার কোনও অস্তিত্বই নেই আত্রেয়ী। জানি না এ কদিনে আমাদের মধ্যে ঠিক কী হয়েছে, কিন্তু বিশ্বাস করো, অমৃতর পাশে আত্রেয়ী ছাড়া আর কোনও নাম বসতেই পারে না।"

আমি ওর দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বললাম, "তুমি আমাকে ছেড়ে দিচ্ছিলে? ছেড়ে দিয়ে কী করতে?"

অমৃত অধৈর্য গলায় বলল, "বললাম তো সোনা, আমি জাস্ট ভেবেছিলাম। কাজের ক্ষেত্রে দেখা গেল আমার সেই মনই বিদ্রোহ করে বসল। আমি পারব না তোমায় ছেড়ে। সিম্পলি পাগল হয়ে যাব।"

আমি বললাম, "আমাকে বিয়ে করতে পারবে আজ? এখনই?"

অমৃত অবাক হল, "এখানে? তোমার বাবা? আমার বাবা?"

আমি বললাম, "তুমি সামলাও সবাইকে। আমি বিয়ে করতে চাই। আজ। এখনই।"

অমৃত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে বলল, "ঠিক আছে, তাই হবে। চলো।"

আমি উঠলাম। অমৃত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে বসার ঘরে এল। বাবা টিভি দেখছিল। আমাদের বেরোতে দেখে বলল, "কী হল? ঝগড়া মিটেছে আজকের মতো?"

অমৃতর মুখ বেশ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মনে হচ্ছিল ঘর থেকে বেরোনোর সময়। বাবার সামনে কেমন হয়ে গেল। বলল, "কালকে ইন্ডিয়া জিতল?"

বাবা অমৃতর দিকে তাকিয়ে বলল, "কালকে তো ইন্ডিয়ার কোনও খেলা ছিল না! ছিল? কীসের কথা বলছ, ক্রিকেট না ফুটবল?"

অমৃত মাথা চুলকে বলল, "খো খো? শ্রীলঙ্কার সঙ্গে?"

বাবা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "তোর সঙ্গে কি এরও মাথা খারাপ হয়ে গেছে?"

আমি বুঝলাম অমৃত ট্রিপ করে গেছে। এখন আর ওর পক্ষে ঠিক করে কথা বলা সম্ভব না। আমি বাবাকে বললাম, "আমরা ঠিক করেছি আজ বিয়ে করব বাবা। আমি আজ থেকেই ওর বাড়িতে থাকব।"

বাবা চমকাল না। টিভির দিকে তাকিয়ে বলল, "ঠিক আছে। করে ফেল।"

আমি বললাম, "তোমার তো কিছু ভূমিকা নেওয়া দরকার।"

বাবা বলল, "আমি ভূমিকা নিতে গেলেই তো সবাইকে নিয়ে এগোতে চাইব। তাহলে তোদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ বা ভাজা কিছুই হবে না। তোরা বরং এক কাজ কর, দুজনে কালীঘাট বা কোথাও গিয়ে একটা বিয়ে করে অমৃতর বাড়ি গিয়ে হাজির হ। সকাল সকাল একা আমার হার্ট অ্যাটাকের চান্স হবে কেন, ওদের বাড়ির লোকেরও হোক।"

আমি রেগে গিয়ে বললাম, "বাবা আমি কিন্তু সিরিয়াস।"

বাবা বলল, "আমিও তো সিরিয়াস। একবারও মনে হচ্ছে আমি ইয়ার্কি মারছি?"

অমৃত সোফায় বসে পড়ে বলল, "লুচি খেতে ইচ্ছা করছে। তুমি লুচি বানাতে পারো?"

আমি রেগে গেলাম, "তোমার এখন লুচি মাথায় এল? তুমি যে বললে আজই সব ব্যবস্থা করবে?"

বাবা টিভিটা বন্ধ করে আমার দিকে তাকাল, "কী হয়েছে মা? এরকম পাগলের মতো করছিস কেন? আমাকে বলা যায়?"

আমি আবার কেঁদে ফেললাম। বাবার পাশে বসলাম।

বাবা আমার মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, “পাগলিটা বড়ো হল না এখনও।”

অমৃত বলল, “তাহলে কি পালানোর প্ল্যানটা ক্যান্সেল? লুচি করবে?”

আমি কাঁদতে কাঁদতেই রেগে গিয়ে বললাম, “তুমি যাও তো। সারাক্ষণ খালি খাই খাই।”

অমৃত কেমন গোবেচারা মুখ করে বসে রইল।

আমার ইচ্ছা হচ্ছিল ওকে জড়িয়ে ধরি।

এরকম সর্বনাশ কবে হল আমার? এত ভালোবেসে ফেললাম কবে?

৬৪ জীমূতবাহন

হোটেলে চেক আউট প্রসেসিং করতে বললাম। হোটেল থেকেই একটা গাড়ি ঠিক করা গেল। ড্রাইভারকে বললাম, এন জে পি যেতে হবে।

ব্রেকফাস্ট দিয়ে গেছিল। পাউরুটি অমলেট। বউ ছুঁল না।

আমি অনুরোধ করলাম না একবারও।

খেয়ে নিলাম।

ব্যাগ গাড়িতে তুলে রওনা দিলাম যখন তখন নটা বাজে। রোদ ঝলমল করছে। এখান থেকে এই সময় কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে পাওয়া যায় না। আজ যাচ্ছিল।

বউ সেদিকে চুপ করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে মাথা নিচু করল। ড্রাইভার গান চালিয়েছে। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের "হে আপনা দিল তো আওয়ারা।" পাহাড় চুঁইয়ে জল পড়ছে। রাস্তা ভেজা এখনও। বাচ্চারা স্কুলে যাচ্ছে সারে সারে। আর-একটা কর্মব্যস্ত দিন শুরু হচ্ছে পাহাড়ি মানুষদের জন্য।

পরিবেশটা ভালো হতে পারত। দুর্দান্ত হতে পারত। সব উপাদান ছিল।

ছিল না আমার কপাল। চুপ করে বসে রইলাম।

চোখ বন্ধ করে ঘুমানোর চেষ্টাও করলাম, ঘুম এল না।

ঘণ্টাখানেক যাবার পর বউ কথা বলল, "অনিরুদ্ধ ফোন করেছে, তুমি আমাকে ফোনটা দেবে না, এটা তো স্বাভাবিক ঘটনা। এটা আনএক্সপেক্টেড কিছু ছিল না। কিন্তু তুমি আমাকে যে কথাটা বললে সেটা ভেবে বললে? একটা মানুষ একাকিত্ব থেকে অনেক

কিছু করতে পারে যেটা সবার বোধগম্য নাও হতে পারে। আমি তোমার জীবনটা নষ্ট করেছি, সময় নষ্ট করেছি এটাও ঠিক, কিন্তু তা বলে...”

বউ চুপ করে গেল।

আমি উত্তর দিলাম না। জানলার বাইরে তাকালাম।

বউ বলল, “ছোটোবেলাটা মানুষের চিরকাল থাকে না তো। সবথেকে বড়ো সমস্যাটা হয় যখন সে বুঝতে পারে সে বড়ো হয়ে গেছে। বড়ো হয়ে যাওয়াটাও যদি বুঝতে হয় কোনও কলঙ্ক থেকে, সেটা যে কী ভয়ংকর হতে পারে সেটা যার সঙ্গে হয় সে বুঝতে পারে। বাকিরা তো তাকে দাগিয়ে দিতেই ব্যস্ত থাকে। পাবলোদার সঙ্গে টিনএজ প্রেমটা যে নিষিদ্ধ সেটুকু বুঝতাম, কিন্তু যেদিন বাড়িতে কেউ ছিল না, আর পাবলোদা এসে অনেক আদর করল সেদিনই আমি ওকে ভালোবেসেছিলাম। সে আদরে শরীরের থেকেও অনেক বেশি ছিল একটা মেয়ের প্রথম প্রেমের আবেগ। পিরিয়ড মিস হল, সবাই জানতে চেয়ে পাগল করে দিল কার কাজ, একটা কথাও বলিনি। সেদিন থেকে আমি খারাপ মেয়ে। অ্যাবরশন ক্লিনিকের ওই অন্ধকারটা এখনও আমার দুঃস্বপ্নে আসে। আমি কেঁদে উঠি। শিউরে উঠি, পালাতে যাই, পথ পাই না। অনিরুদ্ধর সঙ্গে যেদিন প্রথম কথা হয়েছিল, অতটা বলিনি ওকে। তারপর একদিন রাতে ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখে উঠে বসলাম। কেউ অনলাইন ছিল না অনিরুদ্ধ ছাড়া। ওকে আমি নিজে পিং করে সবটা বলেছিলাম। পরের দিন সকাল হলে লজ্জা লেগেছিল। কেন একটা অপরিচিত লোককে

সব বলে দিলাম। অনিরুদ্ধ মেসেজ করত রাতের দিকে। প্রেম কি না বুঝিনি, কথা বলতাম। অভ্যাস। ও আমাকে প্রোপোজ করল একদিন। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। বিয়ে? আমি করব? তারপর আবার সমস্যা শুরু হয় যদি? না করে দিলাম। অনিরুদ্ধ অনেকবার বলেছিল, কিছুতেই রাজি হলাম না। ওর বিয়ে ঠিক হল। অনিরুদ্ধ অন হয়েও কথা বলত না, আমি ভাবতাম ওর হবু বউয়ের সঙ্গে কথা বলছে। আমার একাকিত্ব আবার আমাকে পিষে ফেলতে শুরু করল। ভয় হল, সারাজীবন একা থাকব? তারপর একদিন অনিরুদ্ধ বিয়ের কার্ড দিতে এল। যাওয়ার সময় বলল, তোমাকে একবার জড়িয়ে ধরতে পারি? আমি বললাম, ধরো। অনিরুদ্ধ আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল। আমিও কেঁদে ফেললাম। অনিরুদ্ধ চলে গেল। সেদিন থেকে নতুন করে যোগাযোগ শুরু হল। আমাকে বিয়ে করতেও ও-ই বলেছিল। অমলকান্তিকেও ওর ঠিক করা। অমলকান্তির পালানোটা আর তোমার আসাটা হিসেবের বাইরে। আমি খারাপ মেয়ে, কিন্তু একাকিত্ব আর সেই অ্যাবরশন রুমের আতঙ্ক আমাকে সারাজীবন তাড়া করে বেড়াবে আমি জানি। কলকাতা গিয়ে ডিভোর্সের জন্য কী করতে হবে বলে দিয়ো। করে দেব।”

আমি এ কথারও কোনও উত্তর দিলাম না।

৬৫ অমৃত

আত্রেয়ী কেমন পাগলের মতো করছে। আমি বুঝতে পারছি ও রাতে এমন কোনও স্বপ্ন দেখেছে, যেটা ওর মনে বড়ো কোনও প্রভাব ফেলেছে। আসলে যারা তাদের চারপাশে একটা কাঠিন্যের আবরণ দিয়ে রাখে, ভেতরে ভেতরে তারা যে কতটা ভেঙে থাকে সেটা

সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা অসম্ভব। একটা মেয়ে একটা ছেলের মধ্যে অনেক তফাত থাকে।

আর আত্রেয়ী তো একেবারেই আলাদা। জানি, যারা ভালোবাসে, তারা তাদের ভালোবাসার মানুষকে অন্যদের থেকে আলাদা ভাবতেই ভালোবাসে। কিন্তু নিরপেক্ষ জায়গা থেকে দেখলেও আত্রেয়ী বাকিদের মতো নয়।

আমি ওর ঠিক উলটো। একদিন কথা না বললে আমি পাগল হয়ে যাই, লাফ ঝাঁপ দিয়ে রিয়্যাক্ট করি। আত্রেয়ী রিয়্যাক্ট করে না। বোঝেই না হয়তো আমাকে মিস করছে। অবচেতনে জমতে থাকে আমাকে ছেড়ে থাকাটা। তারপর যখন সেটা ফেটে পড়ে, হাতের বাইরে চলে যায়।

এখন যেমন গেছে। অফিস ছুটি নেওয়াল, নিজে স্কুল গেল না। বাইকে করে বেরিয়েছি, পিঠে মুখ গুঁজে কেঁদে চলেছে।

আমি বেশ খানিকক্ষণ বাইক চালিয়ে বাইকটা দাঁড় করালাম। পিছন ফিরে বললাম, "এই যে সোনা, বুচি বুড়ি আমার, রাস্তার লোকজন কী ভাবছে বলো তো?"

আত্রেয়ী চোখ মুছে বলল, "ভাবতে দাও। আমার কিছু যায় আসে না।"

আমি বললাম, “মহা জ্বালা হল। আমার বাড়ি যাবে?”

আত্রেয়ী বলল, “তোমার বাড়িতে সবাই আছে তো। এখন যাব না। পরে নিয়ে যেয়ো, যাব। আজ শুধু তোমার সঙ্গে থাকব। আমি আদর খাব।”

আমি হেসে ফেললাম, “এরকম আদাড়েবাদাড়ে, রাস্তাঘাটে? হোটেলে যাবে?”

আত্রেয়ী মাথা নাড়ল, “না, আমার হোটেল ভয় লাগে। হোটেল পচা জায়গা। যাব না।”

আমি একটু ভেবে বললাম, “আচ্ছা, দাঁড়াও!”

সৌরভকে ফোন করলাম। আমার কলিগ। বালিগঞ্জে ফ্ল্যাটে একা থাকে। সৌরভ ফোন তুলল, “বল রে!”

আমি বললাম, “হ্যাঁ রে, তোর ফ্লাটের চাবিটা আজকের জন্য পাওয়া যাবে?”

সৌরভ কোনও প্রশ্ন করল না, বলল, “কোথায় নিবি বল?”

বললাম, “বেরিয়ে গেছিস তুই?”

সৌরভ বলল, "বেরোচ্ছি। রুবিতে থাকতে পারবি?"

আমি বললাম, "ঠিক আছে!"

ফোন রেখে আত্রেয়ীকে বললাম, "এবার শান্তি?"

আত্রেয়ী পিঠে মুখ গুঁজল, "হুঁ।"

আমি বললাম, "এরকম করছ কেন বাবু?"

আত্রেয়ী বলল, "জানি না। আজ আমার শুধু তোমাকে চাই। আর কিছু জানি না। জানতেও চাই না। আমার মাথা কাজ করছে না।"

আমি বললাম, "ঠিক আছে, বলতে হবে না!"

আত্রেয়ীকে নিয়ে রুবির বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়ালাম। সৌরভ সেই বিরল প্রজাতির ছেলেদের মধ্যে একজন, যার কারও ব্যক্তিগত ব্যাপারে কখনও কোনও ইন্টারেস্ট থাকে না। আমাকে ওর ফ্ল্যাটের চাবি দিয়েও কোনও প্রশ্ন করল না।

আত্রেয়ীকে নিয়ে ওর ফ্ল্যাটে যখন পৌঁছোলাম, ঘড়ির কাঁটা এগারোটা ছুঁই ছুঁই।

ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ করতে আত্রেয়ী আমাকে জড়িয়ে ধরে বুকে মাথা রেখে বলল, "তুমি একা একা বাইক চালাবে না।"

আমি আত্রেয়ীর মাথায় হাত বুলিয়ে বললাম, "বেশ, আর?"

আত্রেয়ী কেঁদে ফেলল আবার। বলল, "আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না। আমি তোমার কাছে থাকব।"

আমি বললাম, "বিয়ে অবধি?"

আত্রেয়ী বলল, "হুঁ, আর তুমি ছোটো ছোটো ব্যাপারে আমাকে সন্দেহ করে পাগল করবে ততদিন, তাই না? আমি পারব না অতদিন অপেক্ষা করতে!"

আত্রেয়ীকে নিয়ে সোফায় বসিয়ে বললাম, "আমি তো তুমি রিপ্লাই করছিলে না বলে অমন করছিলাম সোনা। এই আমি তোমাকে কথা দিলাম, আর অবিশ্বাস করব না সারাজীবন।"

আত্রেয়ী আমাকে জড়িয়ে ধরল। ওর নিঃশ্বাসের শব্দ, চোখের জল আমাকে অদ্ভুত অসহায় করে দিচ্ছিল। আমার চোখও ভিজে গেল কখন বুঝতে পারলাম না। আত্রেয়ী

আমাকে চুমু খেতে শুরু করল পাগলের মতো। আমি ওকে জড়িয়ে ধরে বসে রইলাম। আমার কাম জাগছিল অস্বীকার করব না, কিন্তু তার থেকেও বেশি কষ্ট হচ্ছিল। আত্রেয়ী বলল, "আমাকে আদর করো। আমাকে আদর করো।"

আমি ওর ঠোঁটে চুমু খেলাম অনেকক্ষণ ধরে। আত্রেয়ী আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল।

চুমু খাওয়া শেষে আমি ওর চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বললাম, "চলো বিয়ে করি। আজ থেকেই একসাথে থাকি। অনুষ্ঠান পরে হোক। রাজি?"

আত্রেয়ী আমার হাত ওর ঠোঁটে নিয়ে চুমু খেয়ে বলল, "রাজি।"

৬৬ অনিরুদ্ধ

অনিন্দিতা বেশ ভেঙে পড়েছিল। সারারাত আদর করলাম। ওর প্রেগনেন্সি সেলিব্রেট করলাম। চুমুতে চুমুতে ভরিয়ে দিলাম অনিন্দিতার সারা শরীর। ওর পেটে হাত রেখে আমাদের সন্তানের দিব্যি দিয়ে বললাম, এরকম আর কোনও দিন হবে না।

এসব যখন করতে হয়, ভীষণ সিরিয়াস মুখে করতে হয়। মেয়েরা ন্যাকা জাত। তারা ন্যাকামি পছন্দ করে। চোখে জল এনে আবেগের কথা বললে, ভিক্টিম প্লে করলে ওরা গলে যায়।

অনিন্দিতাকে বললাম, ছোটোবেলাটা আমার ভালো যায়নি। আমার এক আত্মীয় আমাকে রেগুলার সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট করত। তাই মানসিকভাবে আমি একাকিত্বে ভুগি। এই কারণেই বিভিন্ন মেয়ের সাথে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ি। কিন্তু আর নয়। আমার নিজের সন্তান আসছে। এখন থেকে আমি আর কারও কথা শুনব না। কারও দিকে তাকাব না।

আমি, অনিন্দিতা আর আমাদের সন্তান ছাড়া আমি আর কাউকে চাই না।

আমার এখনকার একটা রোগের কথাও বললাম। দুবার অজ্ঞান হয়ে যাবার নাটকও করলাম। তাতে অনিন্দিতা ঘাবড়ে গেছিল। আমাকে জড়িয়ে ধরল। আমি ওকে সে সুযোগে বেশি করে সিডিউস করলাম। যৌনতার সুযোগে আরও ব্রেন ওয়াশ করে দিলাম। ঘুম থেকে উঠে দেখলাম অনিন্দিতা আমাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমোচ্ছে। আমি মনে মনে হাসলাম। মেয়েদের বোকা বানানো কত সহজ! একটু ভালো ভালো কথা বললেই এরা কাত হয়ে যায়।

পরক্ষণেই আমার চোয়াল শক্ত হল। ঋতুজার বর, কী নাম যেন শুয়োরের বাচ্চাটার, ওর এবার একটা ব্যবস্থা করতে হবে। এমনভাবে মারতে হবে যাতে একটা বা দুটো পা চিরকালের মতো খোঁড়া হয়ে যায়। বাসে মেট্রোতে উঠলে প্রতিবন্ধী সিটে বসার সুযোগ পায়।

অনিরুদ্ধ রাউতের সঙ্গে এত বাজে ভাবে কথা বলার সাহস যখন পেয়েছে, তখন তার ফলও ওকে ভুগতে হবে।

কাকে বলব? আপাতত দুজনকে চিনি। খিদিরপুরের মুস্তাক আর রাজাবাজারের ইমানুল। ইমানুলের সমস্যা হল, মারতে গিয়ে ওর তালজ্ঞান থাকে না। হাত পা ভাঙতে গিয়ে খুন করে বসতে পারে। সেটা করলে হবে না। এ ছেলেকে বাঁচিয়ে রেখে সারাজীবন পুড়িয়ে মারতে হবে। এই বানচোদকে হুইলচেয়ারে বসিয়ে রেখে আমি ঋতুজাকে আদর করব।

কতদিন ঋতুজাকে চুমু খাওয়া হয় না। ঋতুজা আবেগপ্রবণ। আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদে। সে সময়টাই আদর করতে বেশি মজা লাগে।

ঘুমের ঘোরে অনিন্দিতা আমাকে জড়িয়ে ধরল। আমি চোখ বন্ধ করলাম। কল্পনা করলাম অনিন্দিতা না, ঋতুজা আমাকে জড়িয়ে ধরে আছে। শক্ত হচ্ছিলাম, অনিন্দিতাকে ঘুমের ঘোরে চুমু খেলাম। অনিন্দিতা জাগল। আমাকে জড়িয়ে ধরল। অনেকক্ষণ ধরে ওকে আদর করলাম।

আদর শেষে অনিন্দিতা বলল, "তোমার শরীর এখন ঠিক আছে?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ।"

অনিন্দিতা আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, "ডাক্তার চৌধুরীর কাছে নিয়ে যেয়ো। বাচ্চা নষ্ট করব বলে রেগে গেছিলেন। এখন খুশি হবেন।"

আমি ওর কপালে চুমু খেয়ে বললাম, "নিয়ে যাব সোনা। তুমি তৈরি হও। স্কুল যাবে না?"

অনিন্দিতা আমার থুতনিতে চুমু খেয়ে বলল, "যাব না। ইচ্ছা করছে না। আজ সারাদিন তোমাকে জড়িয়ে ধরে থাকি।"

প্রমাদ গুনলাম। খিদিরপুর যেতে হবে তো! বললাম, "আচ্ছা, আমি শুধু একবার বেরোব আজ।"

অনিন্দিতা জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল, "না। আজ তুমি কোথাও যাবে না। আমি পায়েস রাঁধব। তুমি খাবে।"

আমি ওকে জড়িয়ে ধরে আরও আদর করলাম।

শুয়ে থাকলাম অনেকক্ষণ। শ্বাস ছাড়লাম।

যাক! অনিন্দিতাকে ঠিক করে নিয়েছি মানে আর চিন্তা নেই। একমাত্র ওর পক্ষেই আইনিভাবে আমাকে সমস্যায় ফেলা সম্ভব ছিল।

এবার ঋতুজাকে ব্যাক টু প্যাভিলিয়ন করিয়ে নিতে পারলেই শান্তি।

করুক, কলকাতায় ফিরে নিশ্চয়ই ফোন করবে ও।

অধীর আগ্রহে সেদিকেই তাকিয়ে থাকতে হবে।

কতদিন ঋতুজাকে চুমু খাই না, আহ!

৬৭ জীমূতবাহন

টাকা বেঁচে গেছিল। বাগডোগরায় চলে এসেছি। প্লেনে ফিরব। তাহলে আর ট্রেনের ধকলটা নিতে হয় না। সময়ও বাঁচে। তাড়াহুড়োয় সেবক থেকে শিলিগুড়ি যাবার রাস্তার দৃশ্যটা প্রাণভরে উপভোগ করতে পারলাম না।

বউ... না থাক, ঋতুজাকে যত তাড়াতাড়ি ওর বাড়ি দিয়ে আসতে পারব তত ভালো। অনিচ্ছুক মানুষকে জীবনে টেনে নিয়ে যাবার কোনও মানে হয় না।

পাহাড়ের মনোরম আবহাওয়া থেকে সমতলে নামার পর গরম লাগছিল। ঘাম হচ্ছে। এয়ারপোর্টে গিয়ে টিকেট কেটে এয়ারপোর্টের ভিতরে ঢুকলাম। চারটেয় ফ্লাইট। তার কিছুক্ষণ পরেই ও নিজের বাড়ি গিয়ে অনিরুদ্ধর সাথে দেখা করবে।

যা করে করুক। পরের মেয়ে পরমানন্দ, যত গোল্লায় যায় ততই আনন্দ।

ঋতুজা চুপ করে আছে। বোর্ডিং পাস নিয়ে সিকিউরিটি পেরিয়ে এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে বসলাম। ছোটো এয়ারপোর্ট। লোক গিজগিজ করছে। চেয়ারে বসে হেলান দিলাম।

ঋতুজা বলল, "আমি একটা ফোন করে আসছি।"

আমি বললাম, "অনিরুদ্ধকে করবে তো? আমার ফোন নাও। এটা থেকেই করো।"

ঋতুজা মাথা নেড়ে বলল, "অনিরুদ্ধকে না। বাবাকে ফোন করব। এ কদিন একবারও ফোন করিনি বাবাকে।"

আমি ফোন এগিয়ে দিলাম। ঋতুজা ওর বাবার সঙ্গে বেশ খানিকক্ষণ কথা বলে আমার দিকে ফোনটা এগিয়ে দিল।

আমি শ্লেষাত্মক গলায় বললাম, “যাকে ফোন করতে ইচ্ছা করছে তাকে করো, লজ্জা পাচ্ছ কেন? আমি তো কিছু বলব না। তোমার ওপর আমার তরফ থেকে কোনওরকম রেস্ট্রিকশন নেই। চিন্তা কোরো না।”

ঋতুজা বলল, “আমি জানি না ও কোথায় আছে, ওর বউ আছে নাকি। না জেনে তো ফোন করি না।”

আমি বললাম, “তা বটে। লুচ্চামি করলে তো বউকে না জানিয়েই করতে হয়। তবে এখন চিন্তা কোরো না, ওর বউ সব জেনে গেছে। ময়দানে অবাধে খেলতে সমস্যা হবে। আচ্ছা, তুমি কতবার ওর সঙ্গে সেক্স করেছ?”

ঋতুজা চমকে চারদিকে তাকাল। সবাই নিজের নিজের কাজ করছে। আমার গলার স্বরও কম ছিল। তবু ও চমকাল। বলল, “আস্তে কথা বলো। সবাই শুনবে তো!”

আমি বললাম, “শুনলে শুনবে। এক কাজ করি, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে সবাইকে তোমাদের কথা বলি। দেখা যাক কজন তোমার পক্ষে আছে আর কজন বিপক্ষে।”

ঋতুজার বিষ অনেক আগেই ঝরে গেছিল। এখন দৃশ্যত ওকে ক্লান্ত লাগছিল। আমার দিকে তাকিয়ে নিচু গলায় বলল, “আমি একটু বাড়ি যেতে চাই। আমি কি কোনওরকম ঝামেলা ছাড়া সেটা যেতে পারি?”

আমি বললাম, "আমার তো ইচ্ছা করছে পায়ের জুতোটা খুলে তোমাকে আগাপাশতলা জুতোতে, কিন্তু সমস্যা হল ভদ্রতা জিনিসটা আমার একটু বেশি, তাই বেঁচে গেলে। আচ্ছা অনিরুদ্ধ রাউত যদি ওর বউয়ের পাশে তোমাকে নিয়ে এক খাটেই শোয় তাহলে শোবে? একসঙ্গে সেক্স করবে?"

এই কথাটা একটু জোরে বলে ফেলেছিলাম। পাশের সিট থেকে এক ভদ্রমহিলা চমকে তাকালেন।

ঋতুজা কোনও উত্তর দিল না।

আমার ভীষণ রাগ হল। অত লোকের সামনেই আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, "কতবার সেক্স করেছ জানোয়ারটার সাথে? ওর বউ আছে জেনেও, ওর বউকে না জানিয়ে কতবার সেক্স করেছ? কতবার ঠকিয়েছ ওর পরিবারকে? অনিরুদ্ধর রক্ষিতা হয়ে বাকি জীবনটা কাটাবে, নাকি ওকে নিয়ে এমন কোনও জায়গায় পালাবে যেখানে অনিন্দিতা যেতে পারবে না?"

চত্বরসুদ্ধ লোক তাকাল আমাদের দিকে। ঋতুজা যেন মাটিতে মিশে যাচ্ছিল। পাশের বয়স্কা ভদ্রমহিলা আমার দিকে কৌতূহলী চোখে তাকালেন। আমি ওঁকে বললাম, "এই মেয়েটিকে দেখছেন, আমার বিয়ে করা বউ। বিয়ে করার পর জানতে পারলাম, ইনি এক

বিবাহিত লোকের বউকে না জানিয়ে তার সাথে সম্পর্ক রেখে চলেছেন। এরকম মেয়ের সাথে কী করা উচিত বলে আপনার মনে হয়?”

ঋতুজা এবার কেঁদে ফেলল। তারপর উঠে দৌড়ে বাথরুমের ভিতর ঢুকে গেল। আমার মাথার মধ্যে যেন আগ্নেয়গিরি জ্বলছিল।

সবার কৌতূহলী চোখেও সে আগুন নিভল না।

৬৮ আত্রেয়ী

আমার মার স্বপ্ন ছিল বিয়ের সময় আমার বরকে বরণ করবে, আমাকে নিজের হাতে সাজিয়ে দেবে। মা যেদিন চলে যায়, একটা গ্রীষ্মের দুঃসহ দুপুরে যখন মাকে ওরা নার্সিং হোম থেকে নিয়ে এসেছিল, আমি পাথর হয়ে বসেছিলাম।

কোনও কথা বলতে পারিনি। চোখ দিয়ে একফোঁটাও জল পড়েনি।

মা তো আমার আকাশ জুড়ে ছিল। জুড়ে বলা ভুল, আমার আকাশটাই মা ছিল। কী খাব, কী পড়ব, কোথায় যাব, সব, সবটাই মা। মা না থাকা আমাদের ওপর আকাশ ভেঙে পড়ার মতো ব্যাপার হল। আমি আর বাবা দিশেহারা হয়ে গেছিলাম। জল গরম করতে পারত না যে মেয়ে, সে রান্না করা শিখে গেল। তেল, নুন, লংকা প্রথম প্রথম কিছুই ঠিক করে দিতে পারতাম না। বাবা সোনা মুখ করে তাই খেয়ে নিত।

কোত্থেকে জানলাম আমি মাঙ্গলিক। গাদাখানেক সাইট সার্চ করে জেনে ফেললাম মাঙ্গলিক হবার দোষ কী কী হতে পারে।

অমৃত যখন প্রথম আমাকে প্রোপোজ করল, আমি ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তুমি মাঙ্গলিক? অমৃত রেগে গিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, তুমি অঙ্কের টিচার? লজ্জা লাগে না এই প্রশ্নটা করতে?

আমি হেসে দিয়েছিলাম।

আমাকে কেউ বুঝিয়েছিল মাঙ্গলিকদের অনেক বাধা থাকে জীবনে, হাজার সমস্যা থাকে। আমার মনে গেঁথে গেছিল। ভাবতে শুরু করলাম আমার মাও হয়তো আমার জন্য চলে গেল। ভেতর ভেতর শেষ হয়ে যাচ্ছিলাম। ক্ষয়টা বুঝতে পারছিলাম।

মারাত্মক ডিপ্রেশন, সে ডিপ্রেশনের কোনও ব্যাখ্যা দেওয়া অসম্ভব। শুয়ে আছি ছাদের দিকে তাকিয়ে। এক অব্যক্ত হাহাকার আমাকে ছারখার করে দিতে শুরু করেছিল প্রতিক্ষণে।

অমৃত আমার জীবনে দমকা হাওয়ার মতো। সারাদিন অসহ্য গরমের পর কালবৈশাখীর মতো এল। আমার অবচেতনে যে কখন ছেলেটা এত শিকড়বাকড় গজিয়ে বাসা বানিয়ে

ফেলেছে আমি বুঝতেও পারিনি। বুঝতে চাইও না। যেটা বুঝি, আমার এই পৃথিবীতে দুজন আছে। আমার বাবা আর অমৃত। আমার আর কিছু চাই না। ওর কোমর আঁকড়ে ধরেছি রাস্তার পুরোটা সময়। পিঠে মাথা গুঁজে থাকতে থাকতে কখন যেন দু চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমে গেছে বুঝতেও পারিনি।

মন্দিরে পৌঁছে অমৃতকে বললাম, "পুরোহিতকে বলবে আমি মাঙ্গলিক। প্রথমে মনে হয় দোষ কাটাতে গাছের সাথে বিয়ে দেয়।"

অমৃত আমাকে চমকে আমার হাতে একটা জোর চিমটি কেটে বলল, "আমার আত্রেয়ীর কোনও দোষ থাকতেই পারে না। আর গাছ কেন, তোমার সব সময় আমার সঙ্গেই বিয়ে হবে। চলো তো।"

আর কিছু ভাবিনি। পাগলটা আমাকে বিয়ে করল মন্দিরে। হাসিও পাচ্ছিল বাবা কী ভাববে ভেবে। তবে ভোররাতের দুঃস্বপ্নটা দেখার পরে আমার মাথায় আর কিছু কাজও করছিল না। মনে হচ্ছিল বিয়েটা হলেই যেন সব ঠিক হয়ে যাবে।

কেমন একটা ঘোরের মধ্যে সব হয়ে গেল। কপালে যখন সিঁদুর পরাল অমৃত, আমার মনে হল মা কাছেই কোথাও দাঁড়িয়ে আমাকে দেখছে। আমি কেঁদে ফেললাম। অমৃত আমাকে জড়িয়ে ধরে মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে ফিসফিস করে বলল, "শোনো, এখানে

সবাই পালিয়ে এসে বিয়ে করে, তোমার কান্না দেখে যদি লোকে ভাবে তোমাকে উঠিয়ে নিয়ে এসেছি, বেদম ক্যাল খেয়ে যাব মাইরি!"

কাঁদতে কাঁদতে হেসে ফেললাম।

অমৃত বলল, "চলো এবার আমাদের বাড়ি।"

এবার আমার ভয় লাগল। ঘাবড়ে গিয়ে বললাম, "কাকু বাড়ি আছেন?"

অমৃত আমায় ধমক দিয়ে বলল, "কাকু কী? বাবা বলো। হ্যাঁ আছে। আমার বাবা কুল বাবা। চাপ নেই। চলো তো। আর শোনো, আমার ইচ্ছা করছে গোটা শহরকে চেঁচিয়ে বলি, আত্রেয়ী আজ থেকে আমার। শুধু আমার। পুরোপুরি আমার।"

আমি ওর হাতটা শক্ত করে ধরলাম।

ঠিক বলেছে।

ও আমার, শুধু আমার। পুরোপুরি আমার।

৬৯ জীমূতবাহন

বাগডোগরা থেকে কলকাতা প্লেনে বেশিক্ষণ লাগে না। তবু এটুকু সময়ই আমার মনে হচ্ছিল জীবনের দীর্ঘতম সময়।

বাড়িতে একবার খুব বিড়ালের উপদ্রব হয়েছিল। বাবা বলেছিল কয়েকটাকে বস্তায় করে অন্য পাড়ায় ছেড়ে আসতে।

আমার মনে হচ্ছিল ঋতুজাকে যেন আমি সেরকম বেড়াল পার করতেই যাচ্ছি। আর সেটা করতে পারলে আমি বেঁচে যাই। সারাজীবন ভালো না বাসার যন্ত্রণা সহ্য করার থেকে একবারে সব মিটে গেলে ভালো।

প্লেনে ওঠার আগে যখন এয়ারপোর্টের ওয়াশরুম থেকে এল, চোখে একফোঁটা জল নেই। দূরে গিয়ে বসল। প্লেনে ওঠার সময় অচেনা মানুষের মতো আমার পেছনে দাঁড়াল।

আমার মাথা সামান্য ঠান্ডা হয়েছিল। আমি আর কোনওরকম সিন ক্রিয়েট করলাম না।

চুপচাপ সিটে বসে রইলাম।

পাহাড়ি রাস্তায় যেভাবে ঘুমাচ্ছিল পড়ে পড়ে, এই রাস্তায় একবারও ঘুমাল না। চোখ মুখ শক্ত, একটাও কথা না। চুপ করে বসে রইল।

প্লেন যখন সন্ধ্যার কলকাতার আকাশ চিরে দমদম বিমানবন্দরে নামল, আমি হাঁফ ছাড়লাম।

নেমে ব্যাগেজ কাউন্টার থেকে ব্যাগ নেওয়ার সময় ও আমার পাশে থাকল। ব্যাগ নিয়ে আমি চুপচাপ বেরোচ্ছিলাম, ও দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, "আমি চলে যেতে পারব।"

আমি কিছু বললাম না। চোখ মুখ কঠিন করে দাঁড়ালাম।

ঋতুজা বলল, "আমার সঙ্গে এই খারাপ ব্যবহারটা করার দরকার ছিল। তুমি ঠিক করেছ। এটা আমার প্রাপ্য ছিল। কিছু জিনিস মানুষ সব বুঝেও না বুঝে অবুঝের মতো বসে থাকে। আমিও তেমনই ছিলাম। অনিরুদ্ধর বউ আছে জেনেও আমি ওর সঙ্গে যোগাযোগ করে গেছি। হ্যাঁ, হতে পারে অনিরুদ্ধ আমাকে ভালোবাসেনি। ব্যবহার করেছে। হতে পারে ও নিজের বউকেও ভালোবাসে না, আমাকেও ভালোবাসে না। আমার তাতেও কিছু হয়নি। দোষ কারও না। দোষ আমারই। আমার যোগাযোগ রাখা উচিত হয়নি। হয়তো অনিরুদ্ধ খুব দোষী। হয়তো কিছুই দোষী না। কিন্তু আমি ওকে কোনও দোষ দেব না। আমি না চাইলে তো কোনও যোগাযোগ হত না। আমি ছুঁতে দিতে না চাইলে ও ছুঁতেও পারত না। কিন্তু কী করব বলো, একা থাকার সমস্যা আমার মারাত্মক। ডিপ্রেশন মারাত্মক হয়। এর থেকে চাইলেই বেরোনো যায় না। আর আমি তো বেরোতেও চাইনি কোনও দিন। শিখব হয়তো কিছু এ সমস্ত ভুল সিদ্ধান্ত থেকেই।

তোমার ওপরেই এসবের জন্য সবথেকে বেশি প্রভাব পড়ল। আমি এজন্য নিজেকে কোনও দিন ক্ষমা করতে পারব না। তুমিও আমাকে ক্ষমা কোরো না। প্রতারণার কেস করতে পারো। আমি ডিফেন্ড করব না। আমি যাই। সাবধানে ফিরো।"

ঋতুজা কথাগুলো একটানা বলে গেল। যেন গোটা রাস্তা এই কথাগুলোই ও প্র্যাকটিস করে এসেছে।

কথা শেষ করার পরও গেল না। দাঁড়িয়ে রইল।

আমি আমার ব্যাগটা নিয়ে জোর পায়ে বাইরের দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। পিছনের দিকে আর তাকালাম না।

তাকাতে ইচ্ছা করছিল না। মাথার ভিতর অনেক কিছু এদিক ওদিক করে যাচ্ছিল। বেরিয়ে দেখলাম কেউ গাড়ি এনেছে, কেউ ট্যাক্সি নিচ্ছে, কেউ বা ক্যাব, আমি ওই রাস্তা ধরেই হাঁটতে লাগলাম।

মুক্তির আনন্দ হচ্ছিল না। বিচ্ছেদের কষ্ট হচ্ছিল নাকি বুঝতে পারছিলাম না, তবে মনে হচ্ছিল ভেতরটা জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে। এত কষ্ট আমি অনেকদিন পাইনি। এয়ারপোর্টের বাইরের রাস্তায় আমার ব্যাগটা কাঁধে নিয়েই অনেকটা হেঁটে রাস্তাতে বসে

পড়লাম। কিছু বোঝার আগেই একটা কান্না ভেতর থেকে উঠে এল যেন। এমন কান্না বহুদিন আসে নি।

রাস্তাতে বসে পড়ে প্রাণপণে জিভ কামড়ে কান্না আটকানোর চেষ্টা করে যেতে লাগলাম। আশপাশ দিয়ে গাড়িগুলো গালাগাল দিতে দিতে যাচ্ছিল। ঠিকই তো, শহরের ব্যস্ত রাস্তা কি মানুষের কাঁদার জন্য?

আমি অনেক কষ্টে উঠে আবার হাঁটতে হাঁটতে ভি আই পি রোডে এলাম। একটা বাস জ্যামে দাঁড়িয়েছিল। দেখলামও না বাসটা কোথায় যাবে, উঠে পড়লাম। সিট ফাঁকা ছিল। বসে মাথা নিচু করলাম।

এ কী সমস্যা শুরু হল এবার? এত সমস্যা, এত কষ্ট হচ্ছে কেন? আমার এসব কেন হচ্ছে?

৭০ অমৃত

আত্রেয়ী আমার। শুধু আমার।

আজ থেকে নাম দুটো পাশাপাশি বসবে।

ভাবতেই ভালো লাগছে। আরও ভালো লাগছে ও যখন আমার হাতটা ধরছে। আমার দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলছে।

এতদিন যখন বাড়ি গেছি, ভেবেছি সময়টাকে কেন আটকে রাখতে পারছি না। কেন আত্রেয়ী সারাক্ষণ আমার সঙ্গে থাকবে না!

আজ থেকে সেই ভাবনাটাই আসবে না ভাবতে নিজেকে পৃথিবীর সবথেকে সুখী মানুষ মনে হচ্ছিল।

অনেকক্ষণ উদ্দেশ্যহীনের মতো আত্রেয়ীকে নিয়ে শহরটায় ঘুরলাম। এই সেই শহর, যাকে নিয়ে কত কবিতা, কত গল্প লেখা হয়েছে। আজ থেকে আমাদের অধ্যায়টাও যুক্ত হল এ শহরের মহাকাব্যে।

অনেকটা রাস্তা পেরিয়ে বাইক থামাতে হঠাৎ দেখি আত্রেয়ী জোরে হেসে উঠল।

আমি অবাক হয়ে বললাম, "কী হল? হাসছ কেন?"

আত্রেয়ী হাসতে হাসতেই বলল, "তোমার ভারী সমস্যা হবে কিন্তু আজ থেকে।"

আমি বুঝলাম না। অবাক হয়ে বললাম, "কেন? কী সমস্যা?"

আত্রেয়ী বলল, "তুমি তো রোজ আমার সঙ্গে ব্রেক আপ করতে আর রোজ আমার বাড়ি চলে আসতে। এবারে কী করবে?"

আমিও হেসে ফেললাম। বললাম, "এসব বলে লজ্জা দেওয়া বন্ধ হোক। খিদে পাচ্ছে। স্যান্ডউইচ খাবে?"

আত্রেয়ী বলল, "চলো।"

আর-একটু এগিয়ে একটা ক্যাফে উদ্ধার হল। পিৎজা, চিকেন স্যান্ডউইচ আর লেমোনেড অর্ডার করা হল।

আত্রেয়ী বলল, "আমার ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না কিছু। সব স্বপ্ন মনে হচ্ছে। আমায় একটা চিমটি কাটো তো।"

আমি বললাম, "কেন স্বপ্ন মনে হচ্ছে?"

আত্রেয়ী বলল, "জানি না। মনে হচ্ছে তো মনে হচ্ছে। আমি কী করব? এই শোনো, এবার কী করব? আমি আমার বাড়ি ফিরে যাব, তুমি তোমার বাড়ি?"

আমি বললাম, "কভি নেহি। বিয়ে কি ইয়ার্কি মারতে করেছি? তুমি আমার বাড়ি যাবে।"

আত্রেয়ী বলল, "আমার কেমন ভয় করছে। ঠিক করছি তো আমরা? তোমার বাড়িতে... কোনও অনুষ্ঠান ছাড়া... যদি খুব অশান্তি হয়?"

আমি বললাম, "এই তোমার কি টেনশন নেওয়া ছাড়া কাজ নেই? এরপর কিন্তু শাস্তিস্বরূপ ভেজ বিরিয়ানি খাওয়াব তখন বুঝবে।"

আত্রেয়ী বলল, "তুমি তো পাগল। সমস্যা হলে লাফ ঝাঁপ দেবে না তো? বাবার মুখে মুখে তর্ক কোরো না কিন্তু, আমার বড়ো খারাপ লাগে সেটা।"

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, "ধুস, দাঁড়াও তো।"

ফোন বের করে আমি বাড়িতে ফোন করলাম। বউদি ধরল, "কী হল? মাথা ঠিক হল তোমার? খেলে কিছু?"

বললাম, "বউদি, বাবাকে দাও তো।"

বউদি কৌতূহলী গলায় বলল, "কেন? কী করলে আবার?"

আমি বললাম, “আহ, দাও না। প্লিজ!”

বউদি বলল, “আচ্ছা ধরো। বাবা ঘুমাচ্ছেন কিন্তু।”

আমি বললাম, “তাও দাও!”

আত্রেয়ী দেখলাম ভয়ে ভয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

বউদি বাবাকে জাগিয়ে ফোন দিল। বাবা ঘুম ঘুম গলায় বলল, “কী হল?”

আমি শান্ত গলায় বললাম, “বাবা আমি বিয়ে করেছি।”

বাবা ততোধিক শান্ত গলায় বলল, “তো আমি কী করব? নাচব?”

আমি বললাম, “আরে আমি সিরিয়াস!”

বাবা বলল, “ভালো করেছিস। ফেরার সময় আরসালানের বিরিয়ানি নিয়ে আসিস। মিষ্টিও আনবি। নইলে বউ নিয়ে বাড়িতে ঢুকতে দেব না। তুই যে লেভেলের পাগল তাতে এসব করবি আমি জানতাম। যাই হোক, ঘুমালাম। জ্বালাবি না। আত্রেয়ীকে নিয়ে

রাস্তায় না ঘুরে বাড়ি আয়। আমি ওর বাবার সাথে ফোন করে কথা বলে নিচ্ছি ঘুম থেকে উঠে। এখন আবার ফোন করলে ত্যাজ্যপুত্র করে দেব মাথায় রাখিস।”

ফোনটা কেটে গেল।

আত্রেয়ী বলল, “কী হয়েছে?”

আমি বললাম, “আরসালান যেতে হবে আবার।”

আত্রেয়ী বুঝল না, “মানে?”

আমি কিছু বলার আগে দেখি বাড়ি থেকে ফোন। নিশ্চয়ই বউদি। ফোনটা আত্রেয়ীকে দিয়ে বললাম, “কথা বলো। আমার হ্যাজাতে ভালো লাগছে না। যা ইচ্ছে বলো।”

আত্রেয়ী ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে আমার দিকে তাকিয়ে ফোনটা কানে দিল।

৭১

কপালকুণ্ডলা
নবকুমার নবকুমার
তোমার বাড়ি যাব,

নবকুমার তুমি কি কখনও
আমার কথা ভাবো?

সদুজ্যাঠা বলে, যে মানুষের কোনও দিন আমাদের হওয়া সম্ভব না, আমরা সে মানুষের টানেই সবথেকে বেশি যাই। এটাই আমাদের নিয়তি।

আমি যেমন, যে হাবলু মিত্রের বাড়ি কোনও দিন যাইওনি, নবকুমারকে একবার দেখব বলে সে বাড়ি গিয়ে মিত্র কাকিমার সঙ্গে ভাট বকতে শুরু করি। সে ছেলে ঘরে ঢুকে সেই যে দরজা দেবে, বেরোনোর নাম অবধি করে না।

আমিও বিফল হয়ে ফিরে আসি। শেষতক সাঁপুইবাড়িতে মিনিমাগনার ঝি-গিরি করে সারাজীবন কাটাতে হবে? তাই হবে হয়তো। যে ছেলের আমার উপর বিন্দুমাত্র চাপ নেই, তার পিছনে ঘুরে আর কী করব? হেরে যাওয়াটাই নিয়তি বুঝতে পারছিলাম দিনের শেষে।

সদুজ্যাঠাও এটাই বলে, মেয়েদের মনটাই বুঝি এরকম। যে ছেলে যত বেশি কষ্ট দেবে, মেয়েটা তার কাছেই তত বেশি করে যাবে।

সব মানুষের কত গল্প থাকে, তাদের জীবনযাপন থাকে, কষ্ট থাকে, আনন্দ থাকে। আমার কিচ্ছু নেই। আমার দিনযাপন আছে, আর আছে রোজ একবার করে অনির্বাণের দৃষ্টি আকর্ষণের নিষ্ফল চেষ্টা।

আর এই চেষ্টার নিষ্ফল হওয়াটা যে আমাকে কতটা মরিয়া করে তুলেছিল সেটা বোধহয় আমি নিজেও বুঝতে পারিনি।

কাকিমারা বাড়ি ছিলেন না, বাড়ি ফাঁকা করে কলকাতায় কোথাও একটা গেছিলেন, অনির্বাণ ফিরতেই আমি গোটা বিকেলটা ও বাড়ির সামনের রাস্তায় সাইকেল নিয়ে ঘুরতে শুরু করলাম। বুকের মধ্যে হৃদযন্ত্রটা যে এমন পাগলামি শুরু করে দেবে, আগে বুঝিনি কোনও ভাবেই।

সন্ধে হতে ছেলেটার অমোঘ আকর্ষণে আমি সাইকেল রাস্তায় রেখে মিত্র বাড়িতে ঢুকে অনির্বাণের দরজার বাইরে কান পেতে দাঁড়িয়ে শোনার চেষ্টা করতে লাগলাম কী করছে।

হাঁটাচলার শব্দ না পেয়ে ভাবলাম ঘুমাচ্ছে, জানলা এমনভাবে বন্ধ করা কিছুতেই বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছিল না, দরজায় কান দেওয়া ছাড়া কিছু করার ছিল না।

বুকের ঢিপঢিপ শব্দ নিজেই বুঝতে পারছিলাম, এক মন বলছিল পালা, আর-এক মন কিছুতেই যেতে চাইছিল না, এমন সময় আমাকে হতভম্ব করে দরজাটা খুলে গেল।

আমি দরজায় প্রায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম, অনির্বাণ দরজাটা খুলতে ওর গায়ে গিয়ে পড়লাম।

ঘটনাটা স্বপ্নের মতো হতে পারত। হল না।

না, অনির্বাণ আমাকে প্রবল অপমান করে তাড়িয়ে দিতে পারত, বা যেরকম সিচুয়েশনগুলো ভাবতাম, সে স্বপ্নের মতোই ভীষণ রোম্যান্টিকভাবে বলতে পারত, "এখানে?"

তেমন কিচ্ছু হল না।

আমি ওর গায়ে গিয়ে পড়তে ও আমাকে শক্ত করে ধরল। আমার মুখের দিকে তাকাল। আমি চোখ বন্ধ করলাম লজ্জায়। ভাবছিলাম এই বুঝি ছেলেটা ভয় পেয়ে হাউমাউ কান্না জুড়ে দেবে।

আচ্ছা, প্রবল ভালোবাসার মানুষ যদি ধর্ষণ করে, তবে একটা মেয়ে কী করে? যে মানুষটাকে একটা মেয়ে প্রবলভাবে ভালোবেসে এসেছে, স্বপ্ন দেখে এসেছে একসঙ্গে থাকবে বলে, সে মানুষটা যদি প্রবল আক্রোশে বলে, "এই মাগিটার খুব রস, রোজ

আমায় ফলো করা, না? আয় তোর সব রস নামিয়ে দি” বলে খাটে ঠেসে ধরে, একপ্রকার নির্বাক হতভম্ব করে ধর্ষণ করে, সে মেয়ের কী করার থাকে?

আমারও কিছু করার ছিল না। আমি তো নিজের মধ্যেই ছিলাম না। আমার গালে চড় মারতে মারতে, আমার স্তন মুখ দিয়ে প্রায় ছিঁড়ে নিতে নিতে অনির্বাণ আমার সমস্ত ভালোবাসা ওইটুকু সময়েই সফলভাবে ভস্ম করে দিতে পারল।

ওর প্রতিটা আঘাতে আমার দু চোখ দিয়ে নিঃশব্দে জল নেমে এল। আমার মনে হচ্ছিল আমি বোধহয় আবার সেই বিচ্ছিরি দুঃস্বপ্নটা দেখছি যেটা দেখে আমি রাতে উঠে বসে থাকতাম। যেটার ভয়ে আমি সন্ধে হলে একসময় বাড়ির বাইরে বেরোতাম না পর্যন্ত।

সব কিছু হয়ে যাবার পর অনির্বাণ আমার পাজামাটা আমার দিকে ছুড়ে প্যান্ট পরতে পরতে বলল, “যা বাড়ি যা। আসিস ইচ্ছা হলে রাত্রে। দরজা খুলে রাখব।”

মিত্র বাড়ি থেকে আমাদের দোকান ছ-সাতশো মিটার হবে। সে রাস্তাটুকু আমার দীর্ঘতম রাস্তা হয়ে রইল সারাজীবনের জন্য।

৭২ অমৃত

এই যে এত ইনসিকিউরিটি, এত সন্দেহ, এত হারিয়ে ফেলার ভয়... এত সব কিছুর পরে যখন সে আমার হয়ে যায়, তখন এক অদ্ভুত ভালোবাসার জন্ম হয়। ভালোবাসায়

তো হারিয়ে ফেলার ভয় বরাবরই থাকে। যে মেয়েকে আমি ভালোবাসি, সব সময় মনে হয় তাকে নিয়ে থাকি। হোয়াটসঅ্যাপে অনলাইন, অথচ সে মেসেজ না করলে পৃথিবীটাই অন্ধকার হয়ে আসে। মনে হয় সব শেষ হয়ে গেল।

এখন অবশ্য অন্য দৃশ্য। বাড়ির দরজায় বিকেলবেলা হাতে মাটন বিরিয়ানি আর চিকেন চাপের প্যাকেট নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি দুজন। আত্রেয়ী ভয়ে আছে, তবে প্রাণপণে হেসে সিচুয়েশন হালকা করতে চাইছে।

দরজা বাবা খুলল। আমাদের দুজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমার দিকে একবারও না দেখে আত্রেয়ীকে বলল, "ঘরে যাও মা। তোমার কপালে অশেষ দুঃখ দেখতে পাচ্ছি। এক উৎকৃষ্ট মানের বানরের গলায় মুক্তোর হার হয়ে তুমি থাকবে।"

আমার এ কথা শুনে রেগে যাওয়া উচিত ছিল। আমি রাগলাম না। হেসে ফেললাম। আত্রেয়ীও হেসে ফেলল।

ঘরে ঢুকতেই বউদি হইহই করে এসে আত্রেয়ীকে নিয়ে ওর ঘরে চলে গেল। আমি ক্যাবলার মতো দাঁড়িয়ে রইলাম।

বাবা বলল, "বল এবার তোর দাবি কী?"

আমি বললাম, "তুমি ওর বাবার সঙ্গে কথা বলেছ?"

বাবা বলল, "হ্যাঁ, ওর বাবা কাকা জেঠুরা আসছেন সব। এখানেই রেজিস্ট্রার আসবেন সে ব্যবস্থা করেছি।"

আমি বললাম, "ঠিক আছে।"

বাবা বলল, "দাঁড়িয়ে আছিস কেন? কিছু বলবি?"

আমি বললাম, "দাদাকে বলেছ?"

বাবা বলল, "না। বড়ো বউমাকেও বলতে বারণ করে দিয়েছি। একা আমি শক খাব কেন? সবাই শকে থাক। বাড়ি এসে তোর কাণ্ড দেখবে। একটু পরে পাড়ায় বেরোব। পাড়াতেও জানাতে হবে তোর কীর্তি।"

আমি বললাম, "পাড়ার লোককে বলবে কেন?"

বাবা বলল, "কারণ তুই তাপস পাল না যে ঘরে ছেলে ঢুকিয়ে দেবার মতো ঘরে বউ ঢুকিয়ে দিলেই সবাই মেনে নেবে। এখানে সামাজিকতা রক্ষা করতে হয়।"

আমি গোঁজ হয়ে বললাম, "লোকে কী বলবে ভেবে তো আমি কিছু করিনি। লোকের কথা ম্যাটার করে না আমার কাছে।"

বাবা বলল, "কোনও পাপও করিসনি যে কাউকে বলতে হবে না। লোকের কথা ম্যাটার করে না তো। আমার কাছে এসব কোনও কালেই ম্যাটার করেনি। তবে পাড়ার সবাই এসে আত্রেয়ীকে দেখে যাক। অঙ্কের শিক্ষিকা, ভালো গায়িকা, এত ভালো একটা মেয়েকে সবাই আশীর্বাদ করুক। তুই এসবে ঢুকবি না। এক কাজ কর, যা ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়। আমি সব দেখছি।"

আমি হতভম্ব হয়ে বললাম, "ঘুমিয়ে পড়ব? এখন?"

বাবা বলল, "হ্যাঁ এখন। অন্য সময় হলে তো ঘর বন্ধ করে আত্রেয়ীর সঙ্গে ঝগড়া করতি। এখন আর সে উপায় নেই।"

বাবা হাসতে হাসতে টিভির ঘরে গিয়ে টিভি চালাল।

আমি খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দাদার ঘরে উঁকি মেরে দেখি আত্রেয়ীকে নিয়ে বউদি কত গল্প করছে। আমাকে দেখে বউদি বলল, "অমু তুমি কেটে পড়ো এখন। তোমার বউকে রাত্তিরে হ্যান্ডওভার পাবে। এখন আমার সাথে গল্প করুক।"

আমি আত্রেয়ীর দিকে তাকালাম।

আত্রেয়ী আমাকে পাত্তাই দিল না।

বড়ো দুঃখ হল।

হয় হয় এমনই হয়। এভাবেই কাছের মানুষগুলো দূরে চলে যায়।

যত্তসব!

আমি বললাম, "আমি এখন কোথায় যাব?"

বউদি বলল, "বাজার ঘুরে এসো!"

আত্রেয়ী বলল, "বাইক নিয়ে যেন না যায় ও।"

আমি বললাম, "মানে? বাইক নিয়ে যাব না তো কী নিয়ে যাব?"

আত্রেয়ী বলল, "আমি জানি না কী নিয়ে যাবে, কিন্তু বাইক নিয়ে যাবে না।"

বউদি গালে হাত দিয়ে বলল, "কেন কেন? আমি শুনতে পারি কেন যাবে না?"

আত্রেয়ী লজ্জা পেল।

বলল, "পরে বলব।"

এবার আমার ভালো লাগল। হ্যাঁ, এই তো বেশ প্রেম আছে। ভুল ভাবছিলাম আমি।

গম্ভীর গলায় বউদির দিকে তাকিয়ে বললাম, "আমি ঘরে শুলাম। বাবা ঘুমাতে বলেছে। বাবার কথা তো আর অমান্য করা যায় না।"

বউদি হাসতে হাসতে বলল, "বাবা, কত পিতৃভক্ত হনুমান তুমি!"

আমি পালালাম নিজের ঘরে। এখানে থাকলেই সমস্যা। ঘুমাই এখন। আর ফোনে আত্রেয়ী আর আমার ছবিগুলো দেখি। এই ছবিগুলো অদ্ভুত এক শান্তি এনে দেয়। সব ভুলিয়ে দেবার ক্ষমতা রাখে।

৭৩ কপালকুণ্ডলা

সাইকেলটা মিত্রকাকুদের বাড়ির সামনেই পড়ে ছিল। ব্যস্ত পাড়া, ব্যস্ত বাজার, শুধু এলোমেলো চুলে আমি দোকানের ক্যাশে গিয়ে যখন রোজের মতো বসলাম, আমার মধ্যে যে কত বড়ো পরিবর্তন হয়ে গেছে সেটা কেউ দেখল না একজন ছাড়া। সদুজ্যাঠা।

আমার কাছে এসে আমার হাত ধরে বলল, "এদিকে আয়।"

সদুজ্যাঠা গেল।

আমি সদুজ্যাঠার পেছন পেছন সদুজ্যাঠার ঘরে গিয়ে বসলাম। সদুজ্যাঠা ঘরে ঢুকেই আমাকে বলল, "কী হয়েছে তোর? মা মেরেছে?"

আমি মাথা নাড়লাম।

সদুজ্যাঠা চোখ ছোটো ছোটো করে তীক্ষ্ণ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "তাহলে? কী হল?"

আমি মাথা নিচু করলাম, "কিছু না।"

কথা শেষ করতে পারলাম না, ডুকরে কেঁদে উঠলাম। কাঁদতে কাঁদতেই কখন যে অজ্ঞান হয়ে গেছিলাম, বুঝতে পারিনি।

সদুজ্যাঠা চোখে মুখে জল ছিটিয়ে জ্ঞান ফেরাল। আমার শ্বাসপ্রশ্বাস জোরে পড়ছিল।

সদুজ্যাঠা আমার হাত ধরে জোরে নাড়িয়ে বলল, “বল মা, কী হয়েছে তোর।”

আমি বললাম, “ছেলেটা আমায় নষ্ট করে দিল সদুজ্যাঠা।”

সদুজ্যাঠা অবাক হয়ে বলল, “মানে?”

আমি কোনও মতে বোঝালাম।

সদুজ্যাঠা আমার কথা শেষ হবার আগেই তীব্র বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আমার বমি হয়ে গেল ভয়ে, যন্ত্রণায়। তলপেটে অসহ্য ব্যথা হচ্ছিল। জল নিয়ে নিজের মাথাতেই দিচ্ছিলাম।

কিছুক্ষণ পরেই হইহই শব্দ এল বাইরে থেকে। সদুজ্যাঠা এ ঘরে এসে আমাকে বলল, “ওঠ। আমার সঙ্গে আয়।”

আমি বললাম, “কোথায় যাব?”

সদুজ্যাঠা বলল, "আয়।"

আমাকে ধরল সদুজ্যাঠা। আমার হাত পা কাঁপছিল। আমি আর নিজের মধ্যে ছিলাম না।

দোকানের বাইরের রাস্তায় নিয়ে এল সদুজ্যাঠা। দেখলাম অনির্বাণকে মেরে মেরে চোখ মুখ থেকে রক্ত বের করে দিয়েছে পাড়ার লোক।

আমি সদুজ্যাঠার দিকে অবাক চোখে তাকালাম। সদুজ্যাঠা একটা সিঁদুরের কৌটো অনির্বাণের হাতে দিয়ে বলল, "যা, ওর কপালে পরিয়ে দে।"

অনির্বাণকে যে ভীষণ মারা হয়েছে বোঝা যাচ্ছিল। ও হাতে সিঁদুরের কৌটোটা নিতে পারল না। কৌটোটা পড়ে গেল। বাজারের লোক জমে গেছিল। প্রায় সবাই মারমুখী। সদুজ্যাঠা হাত দিয়ে সবাইকে আটকাল।

পুরো ব্যাপারটা বুঝতে আমার একটু সময় লাগল। যখন মাথায় ঢুকল, বুঝলাম অনির্বাণের সঙ্গে সদুজ্যাঠা আমার বিয়ের ব্যবস্থা করছে।

আমার মাথা ঘুরছিল। সদুজ্যাঠাকে বললাম, "এ তুমি কী করছ? একে আমি বিয়ে কেন করব? জেনে শুনে একজন ধর্ষককে বিয়ে করব কেন?"

সদুজ্যাঠা থমকে দাঁড়াল।

পাড়ার ভিড়টাও।

বাবা কোথাও একটা গেছিল গাড়ি করে। কেউ ফোন করেছিল হয়তো। এসে কোনও দিকে না তাকিয়ে আমাকে চড় মারতে যাচ্ছিল। সদুজ্যাঠা আটকাল। বাবা বলল, "এ ছেলেটাকে ছেড়ে দে। আমার মেয়ের তো বিয়ে দিতে হবে নাকি? ছেড়ে দে, এ বরং পাড়া ছেড়ে পালাক। তোরাও সব ভুলে যা।"

আমার সীতার পাতালপ্রবেশের কথা মনে পড়ে গেল।

মেয়ের বিয়ে দেওয়া এত দায়? এত? আমি এতটাই বোঝা বাবার ওপরে?

সদুজ্যাঠা কিন্তু বাবার কথা শুনল না, অনির্বাণকে কলার ধরে নিয়ে দোকানের ভিতর ঢুকিয়ে বলল, "চেহারা, স্বভাব চরিত্র এমন করে কিছু মানুষ ঘুরে বেড়ায়, এদের দেখে মনে হয় না আসলে একজন অপরাধী পুষে বেড়াচ্ছি আমরা। একে ছাড়লে আর-একটা মেয়ের জীবন নষ্ট করবে কে দায় নেবে? তুই?"

বাবা রেগে গিয়ে দাপাতে দাপাতে বলল, "আমার মেয়েকে নিয়ে তুই সিদ্ধান্ত নিবি?"

আমি বসে পড়েছিলাম একটা বেঞ্চে। বাবাকে বললাম, “না বাবা, আমাকে নিয়ে আমিই সিদ্ধান্ত নেব। আর কেউ নেবে না। পুলিশে খবর দাও। ও ছেলেকে নিয়ে যাক।”

অনির্বাণ চমকে গিয়ে আমার দিকে তাকাল। বাবা দোকান থেকে বেরিয়ে চলে গেল। ঠিক এই মুহূর্তে আমার বাবার উপর ভীষণ অভিমান হল। মেয়েরা এতটাই পর হয় মানুষের?

৭৪ জীমূতবাহন

আমার জীবনে যে কোনও দিন একটা রাত এরকম আসতে পারে, আমি কোনও দিন ভাবিনি। আমার মতো কারও কোনও ক্ষতি না করা মানুষের জীবনে এরকম একটা দিন কেন আসবে আমি জানি না। হয়তো মানুষের জীবনটাই এরকম। কেউ জানেই না কাল কী আসতে পারে। এভাবে কষ্ট পেয়ে থাকাই যে আমার নিয়তি হতে চলেছে আমি এই সেদিনও জানতাম না।

কষ্ট শুধু নিজের জন্য হচ্ছিল না, ঋতুজার জন্যও হচ্ছিল। বারবার মনে হচ্ছিল আমার তো ডিভোর্স হয়েই যাবে, অকারণ কেন মেয়েটাকে আমি অতগুলো অচেনা মানুষের সামনে ওসব বলে ফেললাম? এই মেয়েটাই তো কুঁকড়ে শুয়ে থাকে, দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুমের ঘোরে কথা বলে, ঘুম না হলে জেগে বসে থাকে।

অনিরুদ্ধকে যদি ভালোবেসেও থাকে, সেই স্পেসে আমি কেন ঢুকতে গেলাম? আমাকে কোনও দিন ও ভালোবাসবে না, এটাই আমার রাগ ছিল?

বাসটা হাওড়াগামী ছিল। কলকাতা ঘুরে ঘুরে কখন স্টেশনের কাছে নামিয়ে দিয়ে গেল খেয়াল করিনি।

ব্যাগ নিয়ে হাওড়া ব্রিজের উপর দিয়ে বেশ খানিকক্ষণ হাঁটার পরে হঠাৎ ইচ্ছা হল মরে যেতে।

মনে হল বেঁচে থেকে কী হবে? একটা অকারণ বাজে জীবনকে বয়ে নিয়ে যাওয়াই তো হবে।

মার মুখটা মনে পড়ল। বেশ খানিকক্ষণ গঙ্গার দিকে তাকিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করলাম।

অনিরুদ্ধকে আমার খুব দেখতে ইচ্ছা করছিল। একটা মানুষ ঠিক কোন পরিস্থিতিতে এরকম হয়, সেটাও জানতে ইচ্ছা করছিল।

লোকটা কি জানে লোকটা অসুস্থ? জানে না বোধহয়। অনিরুদ্ধর উপরেও তেমন আর রাগ হচ্ছিল না। লোকের উপর রাগ করে কী হবে? কপাল খারাপ থাকলে এটাই তো হবার।

চোখ ভিজে যাচ্ছিল। চোখ মুছতে মুছতে হেঁটে গেলাম অনেকটা। শেষমেশ বাড়ি ফেরাই ঠিক করলাম। মধ্যবিত্ত একটা বাড়ি।

ক্যাব বুক করলাম।

বাড়ি যখন পৌঁছোলাম, রাত বারোটা বেজেছে। দরজা বন্ধ ছিল। বেল বাজিয়ে সবাইকে জাগালাম। বাবা আমাকে দেখে অবাক হয়ে বলল, "এখন?"

আমি বললাম, "ঘুমিয়ে পড়ো, সকালে বলছি।"

মা উঠে এসেছিল। আমায় দেখে বলল, "তোর চোখ ফোলা কেন রে বাবু? কী হয়েছে?"

আমি মাকে জড়িয়ে ধরলাম অনেকক্ষণ। মা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, "ঘরে যা। বউমার সঙ্গে ঝগড়া করেছিস বুঝি? মেয়েটা কখন এসে উপরের ঘরে গিয়ে শুয়েছে। খেলও না। তুই খেয়েছিস?"

আমি অবাক হয়ে মার দিকে তাকিয়ে বললাম, “মানে? এখানে এসেছে?”

মা আমার থেকেও বেশি অবাক হয়ে বলল, “তুই জানিস না?”

আমি সিঁড়িতে লাফ দিয়ে উপরে যেতে যেতে বললাম, “তোমরা ঘুমিয়ে পড়ো। সকালে কথা বলছি।”

মা বাবা দুজনেই হতভম্ব হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি আমার ঘরের সামনে গিয়ে যথাসম্ভব গম্ভীর হয়ে দরজা নক করলাম। ঋতুজা ঘুমচোখে দরজা খুলে বলল, “কোথায় ছিলে এতক্ষণ?”

আমি অবাক হলাম। এই মেয়ের কি শর্ট টার্ম মেমোরি লস হয়? আমি গম্ভীর গলাতেই বললাম, “তুমি এখানে?”

ঋতুজা বলল, “বাবা বাড়ি তালা দিয়ে আসানসোলে পিসির বাড়ি গেছে, আমি কী করব? আমার কোথাও যাবার জায়গা নেই, এখানের কথাই মনে পড়ল। আজ থেকে কাল চলে যাব। অসুবিধা আছে, না বাইরে শোব কোথাও?”

আমি বললাম, “না, শোও। আর সরি।”

ঋতুজা বলল, “সরির কিছু নেই। আমি আমার লাইফটাকে এরকম করেছি, এসব তো আমার প্রাপ্য ছিল। ইটস ওকে।”

আমি ওর দিকে তাকালাম। স্বাভাবিক ভঙ্গিতে খাটে গিয়ে শুল যেন কতদিন এ বাড়িতে আছে।

আমার কেমন নিশ্চিন্ত লাগছিল। ভালো লাগছিল এটা জানা সত্ত্বেও যে ও কাল গেলে আর ফিরবে না।

আমি চেঞ্জ করে ওর পাশে শুয়ে পড়লাম।

ঋতুজা নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েছে।

কিছুক্ষণ পরে আমার গায়ে ঠ্যাং তুলে দিল। আমি চুপ করে শুয়ে থাকলাম।

আমিও বোধহয় ওর মতো পাগলই হয়ে গেছি।

৭৫ আত্রেয়ী

একটা দুঃস্বপ্ন দিয়ে শুরু দিন, একটা স্বপ্নের মতো বাস্তব দিয়ে শেষ হলে কার না ভালো লাগে? বাবা যখন এ বাড়িতে এল, আমায় দেখে শুধু ফিক ফিক করে হেসে যাচ্ছে। একগাদা লোকের মাঝখানে আমি না পারছি রাগতে, না পারছি বাবাকে কিছু বলতে। একটা সময় আমাকে একা পেয়ে বাবা বলল, "তোরা এটা কী করলি রে? তবে যা করেছিস বেশ করেছিস। অমৃতর বাবার সঙ্গে আমিও একমত। তোর এরকমই কিছু একটা দরকার ছিল। একজন বন্ধুর দরকার ছিল। ডিপ্রেশন আসবে না দেখিস এর পর থেকে। তোরা দুটো পাগলে ঝগড়া করেই সব ভুলে থাকবি আমি জানি।"

আমার এবার কান্না পেয়ে গেল। বাবাকে জড়িয়ে ধরে বললাম, "ওষুধগুলো খাবে ঠিক করে। রাতে কোনওরকম সমস্যা হলে একবারও না ভেবে ফোন করবে। আর আমি নেই বলে মনের সুখে তেল মশলা খাবে না কিন্তু বলে দিলাম।"

বাবা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, "আচ্ছা। আমার কথা ভাববি না। দেখা হবে তো। অমৃতরা খুব ভালো মানুষ। তোকে ভালো রাখবে আমি জানি। ঝগড়া-টগড়া সব হবে, সেসব তো একটা সম্পর্কের জন্য ভালোই। তবে সেটা মাত্রাতিরিক্ত না হয়, তুই-ই দেখিস। অমৃত ছেলেমানুষ।"

আমি চোখ পাকিয়ে বললাম, "ছেলেমানুষ? আমার থেকে অন্তত সাত বছরের বড়ো তোমার ছেলেমানুষ।"

বাবা বলল, "তাতে কী? মানুষ কি শুধু বয়সেই বাড়ে? মনেও তো বাড়তে হয়। ও ছেলে বয়সেই বেড়েছে বুঝলি। এখনও ওর মধ্যে একটা কৈশোর আছে। সেটা যেন সারাজীবন থাকে তুই দেখিস।"

আমি ঠোঁট ফুলিয়ে বললাম, "হয়েছে, হয়েছে। থামো এবার। খালি ওর প্রশংসা করে যাচ্ছো। আমি বানের জলে ভেসে এসেছি বুঝি?"

বাবা বলল, "তা নয়। তবে তোর মধ্যে তো তোর মায়ের ছায়া আছে। ওর মতোই তুই সবাইকে আগলে রাখতে জানিস। তাই তোকেই বললাম।"

অমৃত কাছেই ঘুরঘুর করছিল। এই করে যাচ্ছে। বাড়িভর্তি লোক, অথচ শুধু আমার চারপাশে ঘুরছে। লজ্জা লাগছিল, রাগ হচ্ছিল, আবার ভালোও লাগছিল। এতগুলো অনুভূতি যে একসঙ্গে আমার কোনও দিন হতে পারে ভাবতে পারিনি।

পাড়ার বেশ কয়েকজন এলেন। চিনি না তাঁদের। আশীর্বাদ করে গেলেন।

রাত আটটায় অমৃতর দাদা এসে হতভম্ব। বুঝতে কিছুক্ষণ সময় নিলেন। আর বুঝে উঠতেই হইহই করে ফুলশয্যার খাট সাজাতে লেগে পড়লেন পাড়ার বন্ধুদের নিয়ে। আমার যে কী লজ্জা লাগছিল।

অমৃতর বউদি কানে কানে বললেন, "প্রোটেকশন নিতে বোলো ভাই। এখনই ট্যাঁ নেবে না তো?"

শুনে কান-টান লাল হয়ে একশা। খেতে বসে আর-এক কেলো। নিজের প্লেটের মুরগির ঠ্যাং অমৃত আমার প্লেটে সবার সামনে তুলে দিল। আমার মনে হচ্ছিল ওকে খুন করে দি। আমার বাবা আর শ্বশুরমশাই দুজনেই সে দেখে হো হো করে হাসি।

রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ অমৃতর দাদা আর বউদি আমাদের ঠেলে ঘরে ঢুকিয়ে দিলেন।

একটা ঘর। ফুলে ফুলে সাজানো।

আমি আর পাগলটা।

মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলল, "কত তাড়াতাড়ি সব হয়ে গেল বলো?"

আমি বুঝলাম পাগলটা আবার খেই হারিয়ে ফেলছে। চাইছে আমাকে জড়িয়ে ধরতে অথচ লজ্জায় লাল হয়ে যাচ্ছে।

এগিয়ে গিয়ে আমি ওকে জড়িয়ে ধরে ওর ঠোঁটে চুমু খেলাম। ও আমাকে জড়িয়ে ধরল।

মিনিটখানেক চুমু খাবার পর বলল, "মাইরি এরকম ফুলশয্যা হয় জানতাম না তো? তুমি দুধের গ্লাস নিয়ে এলে না তো?"

আমি হেসে ফেলে বললাম, "আবার শুরু করলে? অনেক হয়েছে। এবার আদর করো তো!"

অমৃত পরম মমতায় আমার কপালে চুমু খেয়ে বলল, "আমার নদী। আমার সোনা। আমার আত্রেয়ী। ভালোবাসব সারাজীবন সোনা। ভালোবাসব বউ।"

ভালোবাসার মানুষকে বিয়ে করার থেকে সুখীতম মুহূর্ত আর কিছু হয় কি?

৭৬ জীমূতবাহন

আমি ক্লান্ত ছিলাম। ডিস্টার্বডও।

তবু ঘুম ভেঙে গেল সকাল সাতটা নাগাদ।

ঋতুজা সারারাতে ওঠেনি।

আমি আমার গা থেকে ওর পা সরিয়ে সন্তর্পণে নিচের ঘরে নেমে এলাম।

বাবা প্রাণায়াম করছিল। আমাকে দেখে সেসব বন্ধ করে গম্ভীর গলায় বলল, “আমি কি জানতে পারি এ বাড়িতে কী হচ্ছে?”

আমি শান্ত ভঙ্গিতে বাবার সামনে মেঝেতেই বসে পড়ে বললাম, “বাবা, আমাকে যখন ওদের বাড়িতে সবাই বিয়েটা করার জন্য জোর দিচ্ছিল, তুমি আমাকে বারণ করোনি কেন? তোমার একবারও মনে হয়নি এটা আমার কতটা ক্ষতি করতে পারে?”

বাবা থতোমতো খেয়ে বলল, “আমি কি অত বুঝে কিছু করেছি? আমি ভেবেছিলাম আমার ছেলে একটা ভালো কাজ করছে। কেন? কী হয়েছে?”

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, “কিছু না।”

বাবা বলল, “ভাবিস না। যা হয় ভালোর জন্যই হয়।”

আমি জোরে হেসে উঠলাম। বাবা অবাক হয়ে বলল, “পাগল হয়ে গেছিস? তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে? হাসছিস কেন?”

আমি বললাম, “তুমি জানো বাবা, পৃথিবীর সবথেকে বড়ো ঢপ এই কথাটা? যা হয় সব ভালোর জন্য হয়? তাহলে বলতে চাও হিরোশিমা নাগাসাকিও ভালোর জন্য হয়েছিল?”

বাবা বলল, "হুঁ, যদি বলি সেটা হয়েছিল বলেও মানুষ নিউক্লিয়ার বোমার ভয়াবহতা বুঝতে পেরেছিল?"

আমি বললাম, "সেটাই যদি বলো তাহলে তো পৃথিবীতে একটা বিয়ের পর আর বিয়েই হত না। সবাই বিয়ের ভয়াবহতা বুঝে যেত।"

বাবা আমার দিকে চোখ ছোটো ছোটো করে তাকিয়ে বলল, "ঝগড়া করেছিস? দেখ এসব সব সম্পর্কে হয়। ভাবিস না। এক কাজ কর, বাজার করে আন। ভালো লাগবে।"

আমি বললাম, "কী খাবে?"

বাবা বলল, "যা ইচ্ছা। তুই আর বউমা যা ভালোবাসিস তাই নিয়ে আয়।"

আমি উঠলাম "ঠিক আছে। ঘুরেই আসি।"

বাবা বলল, "যা।"

বাজার ভোরের দিকে বসে যায়। আমি ব্যাগ নিয়ে এদিক ওদিক ঘুরলাম।

হঠাৎ করে মনে পড়ল ঋতুজার কী পছন্দ হতে পারে? জিজ্ঞেস করা হয়নি তো। পাবদা খাবে? ভালো পাবদা উঠেছে। মা পাবদার ঝাল বানায় বেশ ভালো।

নিয়ে নিলাম।

মাংসও নিলাম। যদি চলে যায় তবে এগুলো কে খাবে? ভাবতে কেমন একটা অস্বস্তি এল। চলে যাবে? আর আমিই বা ওকে দেখে কাল অত খুশি হচ্ছিলাম কেন? আমার মধ্যে এমন একটা মানুষ বসে ছিল এতদিন, অথচ আমি নিজেকে দেখতে পাইনি?

নিজেকে তো আবেগহীন মানুষ হিসেবেই দেখে এসেছি বরাবর। সে মানুষটা এরকম হয়ে গেল কী করে?

প্রতিটা জিনিস নিচ্ছি আর ওর কথা মনে হচ্ছে। একজন অন্য মানুষের ভালোবাসার লোক, আমাকে ভালোবাসে না জেনেও আমি কেন তাকে ভালোবাসতে যাচ্ছি? জড়িয়ে পড়ার থেকে ভয়ংকর কিছু হতে পারে না।

ব্যাগ নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা দিচ্ছিলাম, এমন সময় দেখি ফোন বাজছে। ধরলাম, "অনিন্দিতা বলছি।"

আমি বললাম, "বল।"

অনিন্দিতা গলা নামিয়ে বলল, "একবার আমার স্কুলে আসতে পারবি আজ?"

আমি বললাম, "কটায় বল?"

অনিন্দিতা বলল, "আগে আয়। সাড়ে নটার দিকে আমি স্কুল গেটের সামনে চলে যাব। তোকে ঠিকানাটা পাঠাচ্ছি, দেখ।"

আমি বললাম, "ওকে। কোনও সমস্যা হয়েছে?"

অনিন্দিতা বলল, "তুই আয়, তখন বলছি।"

ও ফোন রাখল। আমার উৎকণ্ঠা বাড়ল। আবার কী হল?

বাড়ি পৌঁছেও দেখি ঋতুজা ঘুমাচ্ছে।

ডাকলাম না। মাকে ব্যাগ দিয়ে বাইক স্টার্ট করলাম। অনিন্দিতার স্কুলের যে ঠিকানা পাঠিয়েছে সেটা আমি চিনি। একবার কোনও একটা কাজে ওই অঞ্চলে যেতে হয়েছিল, মনে থেকে গেছে।

বাইকে যেতেও সময় লাগল। পৌঁছে দেখি অনিন্দিতা দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখে বলল, "এখানেই বলব?"

আমি বললাম, "বল না। কী বলবি বল।"

অনিন্দিতা মাথা নিচু করে বলল, "তুই ওকে ক্ষমা করে দে জিমূত। আমাদের সন্তান আসছে। এটা শোনার পর থেকে অনিরুদ্ধ একেবারে চেঞ্জ হয়ে গেছে। জানিস তো আমি সন্তানটা নষ্ট করতে চলে গেছিলাম। কিন্তু এখন আর করব না। আমি বুঝতে পারছি ও অনেকটাই চেঞ্জ হয়েছে। তুই প্লিজ আর কিছু..."

আমি কয়েক সেকেন্ড অনিন্দিতার মুখের দিকে তাকালাম। কতটা বিশ্বাস থেকে এত কিছুর পরেও মানুষ এই কথাগুলো বলতে পারে। আমার ওর জন্য কষ্ট হচ্ছিল।

বললাম, "দিলাম ক্ষমা করে। ভালো থাক তোরা। আর কিছু বললাম না। আসি রে।"

বাইকটা স্টার্ট দিয়ে এগোলাম। লুকিং গ্লাসে দেখলাম অনিন্দিতা তখনও মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

৭৭ অনিরুদ্ধ

অনিন্দিতা স্কুলে গেল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

হোম ফ্রন্ট সামলে নিয়েছি। এটা সবথেকে বেশি দরকার ছিল।

অনিন্দিতাকে লুকিয়ে ঋতুজার সঙ্গে যোগাযোগ করাটা খারাপ দেখালেও আসল কথা হল অনিন্দিতার মতো হোঁৎকা কুশ্রী মেয়ের সাথে কীভাবে আমার বিয়ে হল সেটাই বুঝতে পারি না।

বিয়ে জিনিসটাই আসলে বাজে জিনিস। বন্ধুরা ধরল, মেয়েটা প্রোপোজ করল, ঋতুজা বারণ করল আর আমি মেনে নিলাম। ঐতিহাসিক ভুল। বিয়ে করা মানে একজনকে আইনি স্বীকৃতি দেওয়া। এমন স্বীকৃতি দেওয়া যে আমার ক্ষতি করে দিতে পারে। জেলে পাঠাতে পারে। আমার যা ইচ্ছা করাটা আটকাতে পারে।

বিয়ে আমার করা উচিত হয়নি আগেই বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু ততদিনে যা ক্ষতি হবার হয়ে গেছিল। এখন আমাকে অনেক সামলে খেলতে হবে।

ঋতুজাকে আমি ছাড়তে পারব না। ও একটা নেশার মতো। আর অনিন্দিতা হল দায়বদ্ধতা। হ্যাঁ, একসঙ্গে শোয়ার সময় আমার এসব মনে হয়নি। তবে আমার কন্ট্রাসেপ্টিভ ঠিকঠাক ইউজ করা উচিত ছিল। ডাক্তার চৌধুরী লোকটা ভালো না। ঠিক জোর করে বাচ্চাটাকে নেওয়াবে।

এ বাচ্চা হয়ে গেলে মহা সমস্যা হয়ে যাবে। আমাকে প্রথমে যেটা করতে হবে তা হল, এই বাচ্চাটাকে অ্যাবর্ট করাতে হবে। হাতে ডাক্তার আছে, চৌধুরীর কাছে না পাঠিয়ে আমার লোকটার কাছে পাঠাতে হবে যাতে ঠিক ভুজুং ভাজুং দিয়ে বাচ্চাটাকে নষ্ট করে দেওয়া যায়। বাচ্চা জিনিসটাই একগাদা সেন্টিমেন্ট। অনিন্দিতাকে নিয়ে আমি পরে কী করব ঠিক করে উঠতে পারিনি, তবে আমি এ বাচ্চা নেব না, এটাই প্রাথমিক প্ল্যান।

ঋতুজা যেদিন কলকাতা আসবে নিশ্চয়ই আমাকে ফোন করবে। আমার সঙ্গে দেখা হলে কী হবে ভাবতেই উত্তেজিত হয়ে পড়ছি। ওর বরের থোঁতা মুখ ভোঁতা হবে। তবে শুধু ঋতুজা কী বলল, তা নয়, ওই শুয়োরটার মুখ না ভাঙা অবধি আমার শান্তি নেই। লোক লাগানো হবে, ঋতুজার থেকেই ডিটেলস নিয়ে নেব। তারপর ঠ্যাং ভাঙব নিজের হাতে।

অনিরুদ্ধ রাউতের সঙ্গে বাজে ব্যবহার করলে কী হতে পারে তার প্রমাণ পাবে জানোয়ারটা।

মা এল ঘরে ব্রেকফাস্ট নিয়ে। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "তোদের মিটেছে?"

আমি খাবারের ট্রে হাতে নিয়ে বললাম, "হ্যাঁ।"

মা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "কী নিয়ে ঝামেলা করলি? বউমা তো কোনও দিন এসবে থাকে না? কী হয়েছিল?"

আমি হাসি দিয়ে কথা ঘোরানোর চেষ্টা করে বললাম, "ও তুমি বুঝবে না।"

মা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "তোকে নিয়ে আমার ভয় লাগে অনি। বরাবরই তোর দয়া মায়া কম। আর কেউ না জানুক, আমি জানি, রায়দের বাড়ির বাচ্চা বেড়ালটাকে খাবারে বিষ মিশিয়ে তুই মেরেছিলি। তুই এখন এসব পাগলামি করিস না তো বাবা?"

আমি অবাক হয়ে মার দিকে তাকিয়ে বললাম, "হঠাৎ এই কথা বললে কেন বলো তো?"

মা বলল, "মেয়েটা প্রেগন্যান্ট। তোর সন্তান। কোনও পাগলামি করিস না দয়া করে।"

আমি বললাম, "তুমি কী করে জানলে ও প্রেগন্যান্ট? তোমাকে বলেছে?"

মা বলল, "আমাকে বলার জায়গা হলে তো বলবে। আমি শুনেছি। কানে আসে ঠিক। তুই আমাকে বল আগে, তুই ঠিক আছিস তো?"

আমি মার দিকে তাকালাম। মা কেমন একটা অপ্রকৃতিস্থের মতো তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আমি হাসতে চেষ্টা করলাম, "কবে ছোটোবেলায় কী করেছি তুমি সেসব মনে করিয়ে কী ভাবছ বলো তো? এসব মাথায় আসছে কেন তোমার? আমি ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বলছি তো। সব ঠিক হয়ে যাবে, তুমি ভেবো না।"

মা বলল, “তোর বিয়ের আগে বাড়ির ফোনে একটা মেয়ে ফোন করে খুব কাঁদছিল। আমি শুনেছিলাম, সেদিন কিচ্ছু বলিনি। আজ বলছি, মেয়েটার”সঙ্গে এখনও যোগাযোগ আছে তোর?”

আমি সবে খেতে যাচ্ছিলাম। মার কথা শুনে আমার খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল।

যাদের কখনও হিসেবে ধরি না, তারা মাঝে মাঝে কোত্থেকে হঠাৎ করে সব এলোমেলো করতে চলে আসে? মা ঋতুজার সেই ফোন কলটা শুনেছিল?

গুড গড!

৭৮ জীমূতবাহন

দুপুরবেলা ঋতুজা খুব তৃপ্তি করে খেল। মার কাছে বায়না করে আর-একটা মাছ বেশি নিল।

খাওয়া হয়ে গেলে হাত ধুয়ে বাবার সামনেই আমাকে বলল, “বাবা মনে হয় ফিরে এসেছে। আমি এবার যাই, বুঝলে?”

বাবা খাচ্ছিল। ঋতুজার কথা শুনে একবার থমকে আমার দিকে তাকিয়ে আবার খেতে শুরু করল।

আমি বললাম, “আচ্ছা। সাবধানে যেয়ো।”

ঋতুজা বলল, “তুমি একটু দিয়ে আসবে আমাকে?”

আমি বললাম, “বাইকে তেল ফুরিয়ে গেছে।”

বাবা বলল, “আমার স্কুটারটা নিয়ে যা।”

আমি বিরক্ত মুখে বাবার দিকে তাকিয়ে বললাম, “আমি স্কুটার চালাতে পারি না। ও ক্যাব ধরে চলে যাক।”

বুকে একটা চিনচিনে ব্যথা হচ্ছিল, একই সঙ্গে ভীষণ রাগও হচ্ছিল। কী দরকার ছিল আশা জাগাবার?

ঋতুজা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, “ঠিক আছে। আমি রেডি হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছি।”

ঋতুজা উপরের ঘরের দিকে রওনা দিতে বাবা আমাকে বলল, "কী হচ্ছে জানতে পারি?"

আমি বললাম, "বাড়ি যাবে। মিউচুয়াল ডিভোর্স করতে হবে বাবা। আমাদের তো রেজিস্ট্রি হয়নি। কী করতে হবে জানো কিছু?"

মা খেতে দিয়ে স্নানে গেছিল বলে বাবাকে সরাসরি প্রশ্নটা করলাম।

মা থাকলে চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় তুলত।

বাবা বলল, "বিয়েটা টেকাতে পারলি না?"

আমি মাথা নাড়লাম।

বাবা বলল, "দিয়ে আয় ওকে। একা ছাড়া ঠিক না।"

আমি বললাম, "নাহ। যাক। যাবে যখন ঠিক করেছে, একাই যাক।"

বাবা বলল, "দেখ কী করবি।"

আমি উপরের ঘরে গেলাম।

দরজা বন্ধ ছিল। নক করলাম। ঋতুজা দরজা খুলতে দেখি অন্তর্বাস পরে দাঁড়িয়ে আছে। আমি তাড়াতাড়ি চোখ বন্ধ করে বললাম, "আমি পরে আসছি।"

ঋতুজা ঠান্ডা গলায় বলল, "শরীরে লজ্জা পাবার কিছু নেই। এটা খুব স্বাভাবিক একটা জিনিস। চোখ খোলো। যা বলতে এসেছিলে বলো।"

আমি বললাম, "না, তুমি কিছু পরে নাও, তারপর কথা বলব।"

আমার প্রবল শারীরিক অস্বস্তি হচ্ছিল বুঝতে পারছিলাম।

ঋতুজা বলল, "পরেছি। চোখ খোলো।"

চোখ খুলতে দেখলাম কিছু পরেনি। আমি আর কিছু বললাম না। খাটে বসলাম।

বললাম, "এখন নিশ্চয়ই সরাসরি অনিরুদ্ধর কাছে যাবে?"

ঋতুজা কুর্তা পরতে পরতে বলল, "গেলে খুশি হবে?"

আমি বললাম, "খুশি হব নাকি বলিনি তো! জানতে চেয়েছি শুধু।"

ঋতুজা বলল, "আমার উপর খুব রাগ হচ্ছে, না? পাড়ার লোকেদের ডেকে আমাকে ঝাড়তে পারো সবার সামনে। এক্সপোজ করে দিতে পারো একজন বিবাহিত মানুষের সাথে বিয়ের পরেও যোগাযোগ করছিলাম এই অপরাধে। তোমার সে অধিকার আছে। করতে চাইলে করো।"

আমি বললাম, "ডিভোর্সটা যেন হয়ে যায় তাড়াতাড়ি।"

ঋতুজা আয়নার সামনে ঠোঁট দুটো এগিয়ে লিপস্টিক মাখতে মাখতে বলল, "আর?"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "আর কী?"

ঋতুজা বলল, "তোমার সময় নষ্টের ক্ষতিপূরণ? চাই না? এক কাজ করো..."

ঋতুজা গলার হার খুলে ড্রেসিং টেবিলের ওপর রেখে বলল, "এটা বের করে ভালো টাকা পাবে। দু-এক দিন অপেক্ষা কর, আমি আরও ব্যবস্থা করছি।"

আমার মাথায় আগুনটা হাওয়া পাচ্ছিল বুঝতে পারছিলাম। ওকে বললাম, "হারটা পরো। তোমার টাকায় আমি থুতু ফেলি। তৈরি হয়ে বেরিয়ে যাও। আমার ধৈর্যের পরীক্ষা নিয়ো না দয়া করে।"

ঋতুজা হারটা তুলে পরে নিয়ে বলল, "তোমার দ্বিতীয় বউ লাকি হবে। তুমি বদরাগি হলেও মানুষ ভালো।"

আমি বললাম, "সে সার্টিফিকেট আমার তোমার কাছ থেকে নিতে হবে না। তৈরি হয়ে বেরোও।"

ঋতুজা বলল, "তাড়াবার জন্য এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন বলো তো? কোনও মেয়ে আছে নাকি?"

আমি বললাম, "না। তুমি একাই গোটা নারীসমাজের প্রতি বিতৃষ্ণা জাগাতে কাফি। আর কাউকে চাই না আমার। একা থাকব।"

ঋতুজা কয়েক সেকেন্ড আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "ফাইন। বেরোলাম।"

ব্যাগ নিয়ে মিনিট দু-একের মধ্যে ঋতুজা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম।

মাথা কাজ করছিল না।

কয়েক মিনিট পরে দরজা কে নক করল।

দেখলাম ঋতুজা এসে দাঁড়িয়েছে। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "রাতে ঘুম না এলে আমাদের বাড়ি আসতে পারবে? আচ্ছা, একবার তো বলা যেত। আজকের রাতটা যদি বাড়ি না গিয়ে এখানে থাকি তবে তুমি কি খুব রাগ করবে?"

৭৯ অনিরুদ্ধ

মুস্তাক আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "স্যার টাকা কিন্তু ফুল পেমেন্ট করে দিতে হবে প্রথমে। আমি পরে টাকা নিই না। আর কোনওরকম বিলা হলে আমার দায় নেই। আমি শুধু বাইকে মালটার দুটো পা পিষে দেব। রাস্তায় ফেলে দিয়ে চলে যাব। তাই তো?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ।"

মুস্তাক বলল, "টাকা দিন। ছবি দিন।"

আমি ঋতুজার বিয়ের ছবি থেকে ছেলেটার ছবিটা বের করে রেখেছিলাম। মুস্তাকের হাতে দিয়ে বললাম, "টার্গেট কলকাতায় আছে কি না আমার কাছে এখনও খবর আসেনি। এলে তোমাকে লোকেশন দিয়ে দেব।"

মুস্তাক মাথা নেড়ে বলল, "পেমেন্ট ক্যাশে করবেন না পেটিএমে?"

আমি দশটা দুহাজার টাকার নোট নিয়ে এসেছিলাম। মুস্তাকের হাতে দিলাম। মুস্তাক টাকা নিয়ে বলল, "ঠিক আছে। ফোন করে দেবেন। আর অ্যাডভ্যান্স কিন্তু ফেরত হবে না। পরে যদি বলেন ডিসিশন চেঞ্জ করেছেন, টাকা ব্যাক পাবেন না।"

আমার চোয়াল শক্ত হল, "ডিসিশন কোনও অবস্থাতেই চেঞ্জ হবে না। ডিসিশন ফাইনাল।"

মুস্তাক সেলাম দিল।

আমি বেরোলাম।

রুবি আমার একজন বাঁধা মেয়েছেলে। কিছু টাকা দি কলকাতা এলে। ফোন করে জানা গেল দুপুরটা ফাঁকা আছে।

রুবির ফ্ল্যাট বালিগঞ্জে। পৌঁছোলাম যখন, তখন দুপুর হয়েছে। কলিং বেল বাজাতে দরজা খুলল। আমাকে দেখে জড়িয়ে ধরে বলল, "ভালো আছ?"

আমি ঘরে ঢুকে বললাম, "আছি। তোমার লাঞ্চ হয়ে গেছে?"

রুবি বলল, "এই খেতে যাচ্ছিলাম। বসো। তুমিও খাও।"

খেতে বসলাম।

রুবি ভাত বেড়ে আমার সামনে বসে বলল, "আমার কিছু টাকা লাগবে।"

আমি বললাম, "কত?"

রুবি বলল, "লাখ দেড়েক।"

আমি অবাক হয়ে রুবির দিকে তাকিয়ে বললাম, "এত?"

রুবি ভাত দিয়ে ডাল মাখতে মাখতে বলল, "একটা নেকলেস কেনার আছে।"

আমি বললাম, "এখন সম্ভব না। পরে দেব।"

রুবি বলল, “বেশ তো। অনিন্দিতা রাউতের স্কুলটা আমি চিনি।”

আমি একটুও না চমকে বললাম, “ইউ আর ফ্রি টু ডু এনিথিং। কিন্তু কোনও লাভ হবে না এটুকু বলতে পারি।”

আমি উঠে পড়লাম টেবিল থেকে। রুবি খাওয়া থামিয়ে বলল, “পুলিশে যাব। তোমার কপালে দুঃখ আছে।”

আমি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললাম, “করতে পারো। তবে এরপরে লাশ শেয়াল কুকুরে খেতেও আসবে না তোমার, আমি সে ব্যবস্থা করে রাখব তোমার জন্য। একটা চিপ কলগার্লের এত বাড়াবাড়ি ভালো না রুবি। আমাকে ছাড়া আর কারও সাথে শোও না তুমি?”

রুবি বসে বসে হাসতে লাগল।

আমি অবাক হয়ে বললাম, “কী হল? হাসছ কেন?”

রুবি বলল, “বসো বসো। খাও। আমি দেখছিলাম তুমি কী করো। ইয়ার্কি মারছিলাম। এ দ্যাখো, আমার বুবস দ্যাখো। ঠিক আছে না?”

রুবি ব্লাউজ ফাঁক করল। আমার অস্বস্তি হচ্ছিল। রুবি কোনও দিন এরকম করে না তো! আমি ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, "কী হয়েছে তোমার?"

রুবি বলল, "কিচ্ছু না। এমনি। তোমাকে একটু ঘাবড়ে দিতে ইচ্ছা করল। তুমি তো জানো তোমাকেই আমি সবথেকে বেশি ভালোবাসি। আমার ইচ্ছা হয় না বুঝি তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করতে? খেয়ে নাও।"

আমি খেতে বসলাম। রুবি আমার প্লেটে অনেকটা মাংস দিয়ে বলল, "আগের সপ্তাহে তাজপুর নিয়ে গেছিল এক স্কুলটিচার। স্কুলে পড়ায়, অথচ এসবের কী ইচ্ছা। সারারাত জাগিয়ে রেখেছিল।"

আমি অন্যমনস্কভাবে বললাম, "আচ্ছা। তোমার নেকলেস হবে। কিন্তু এখন না। একটু অপেক্ষা করো। আমি ঠিক দেব তোমায়।"

রুবি হেসে বলল, "আচ্ছা আমি কি লেগ পুল করতে পারব না তোমার? আমি তো জানি তুমি এরকমই। বিশ্বাস করে আমাকে সব বলেছ। আমি কেন তার ফায়দা নিতে যাব? ভেবো না।"

আমি আশ্বস্ত হলাম।

রুবি বিভিন্ন কথা বলে চলল। আমি চুপচাপ খেয়ে চললাম। আমার মনটা রুবির কাছে ছিল না। ঋতুজাকে কতদিন আদর করি না। এখন তো ও বিবাহিত। জানোয়ারটার সামনে আমরা মিলিত হব। অদ্ভুত এক আনন্দে ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটল আমার। আজ ঋতুজাকে ভেবে রুবির সঙ্গে মিলিত হব।

খাওয়া শেষ হলে রুবি বলল, “বেডরুমে গিয়ে শোও। আমি চেঞ্জ করে আসছি। তোমার পছন্দের ড্রেস পরে। কন্ডোম এনেছ?”

আমি বললাম, “সেসব আবার কবে থেকে লাগে আমার?”

রুবি বলল, “ঠিক আছে। অপেক্ষা করো। আসছি।”

আমি উত্তেজিত হচ্ছিলাম। আমার ভেতরের জন্তুটা জাগছিল। এক-একটা মানুষের যৌন ক্ষুধা এক-এক রকম হয়। আমার বেশি। মারাত্মক বেশি।

রুবির বেডরুমটা ছোটো, কিন্তু অদ্ভুত একটা সুগন্ধ আছে ঘরটায়। আমি খাটে বসলাম। ফোন বের করে দেখলাম অনিন্দিতা মেসেজ করেছে, লাঞ্চ করেছি নাকি। ওকে জানিয়ে দিলাম করেছি।

আলো কম ঘরটার। ভাত খেলে আমার ঘুম পায়। জল খেতে ইচ্ছা হল। খাটের পাশে একটা ছোটো টেবিলে জলের জগ রাখা। জগটা নিয়ে জল গ্লাসে ঢালতে গিয়ে দেখি জগের তলায় একটা খাম।

কৌতূহল হল।

খামটা থেকে কাগজ বের করলাম। একটা মেডিক্যাল রিপোর্ট।

রুবি এইচ আই ভি পজিটিভ!

৮০ জীমূতবাহন

ঋতুজা মার কাছে গিয়ে রান্না শিখছে। ব্যাপারটা প্রথমে বিশ্বাস হচ্ছিল না আমার। রান্নাঘরে যেতে ব্যাপারটা দেখে অবাক হয়ে গেলাম।

টিভির ঘরে এসে চুপ করে বসলাম। বাবা টিভি দেখতে দেখতেই আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "এটা তোর লাইফ না মহারাষ্ট্র বিধানসভা? কী হচ্ছে একটু বুঝিয়ে বলবি?"

আমি মাথা চুলকিয়ে বললাম, "আমি বুঝলে তোমাকে বুঝিয়ে বলব। আমি নিজেও তো বুঝে উঠতে পারলাম না ঠিক করে।"

বাবা হেসে ফেলল। বলল, "বিয়ে একটা অদ্ভুত জিনিস জানিস তো। তুই চাইলে এর সব কিছু অস্বীকার করতে পারিস। কেউ কেউ পারেও। আবার কারও কাছে এ এমন এক বন্ধন, চাইলেও সারাজীবনেও এর থেকে বেরোতে পারে না। কিছু কিছু সম্পর্ক আছে দূর থেকে দেখতে খুব ভালো লাগে, ভেতরে গেলে দেখা যাবে পুরোটাই ফাঁপা। লোক দেখানো জিনিসে ভর্তি। আবার কোনও কোনও সম্পর্ক আছে, সারাদিন ঝগড়া হচ্ছে, এই বুঝি সুতোটা ছিঁড়ে যাবে যে-কোনো মুহূর্তে, শেষমেশ আর ছেঁড়ে না। দেখা যায় সেই সম্পর্কের সুতোর জোরই আসলে সবথেকে বেশি ছিল!"

আমি বাবার দিকে তাকিয়ে বললাম, "তুমি কি বলতে চাইছ আমার সম্পর্কটা এরকম?"

বাবা বলল, "আমি কিছুই বলতে চাইছি না। তবে তোর বাবা তো। যদি এরকম হয়, তাহলে সবথেকে খুশি আমিই হব। আর কোন বাবা চায় তার ছেলে বউ বিরহে হাওড়া ব্রিজের রাস্তায় কেঁদেকেটে একশা হবে? ওরকম করে তাকিয়ে লাভ নেই, সেদিন তোকে পঙ্কজ দেখেছিল বাসে যেতে যেতে। আমাকে ফোন করে বলেছিল তোকে ডাকবে নাকি। আমি বারণ করেছিলাম।"

আমি লজ্জা পেলাম। উঠে বললাম, "ঘুরে আসি।"

বাবা বলল, "বউমার বাড়ির লোককে ডাকিস একদিন। ভালো করে পরিচয় করা যাক। মনে হচ্ছে এ যাত্রায় তোর বিয়েটা টিকেই যাবে।"

আমি আর দাঁড়ালাম না। বাড়ির বাইরে চলে এলাম। বাবা বড়ো সোজাসুজি কথা বলে। পঙ্কজকাকা আমাকে হাওড়া ব্রিজে কাঁদতে দেখেছে বলে বিচ্ছিরি লাগছিল। নিজের ওপরে রাগও হচ্ছিল। কী দরকার ছিল ওভাবে রিয়্যাক্ট করার? একইসঙ্গে ইচ্ছা হচ্ছিল ঋতুজা... থুড়ি বউকে জড়িয়ে ধরতে।

অনিরুদ্ধর কথা মনে পড়তে দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। ঋতুজার সামনে ও এলে কী করবে? তখন কি আর আমাকে ভালোবাসবে?

পাড়ার পার্কে গিয়ে বসলাম।

ফোন বাজছিল। নামটা দেখে চমকালাম।

অনিরুদ্ধ।

ধরলাম না প্রথমে।

ফোনটা কেটে দিলাম।

কিন্তু ওপাশ নাছোড়বান্দা।

এবারে ধরলাম। "হ্যালো।"

"আমি আপনার কাছে একটা রিকোয়েস্ট করতে ফোন করেছি।"

গলাটা ভেঙে পড়া। এ আবার কী? নতুন কোনও ড্রামা?

শক্ত গলায় বললাম, "কী?"

ওপাশে গলাটা একটু থেমে গিয়ে বলল, "ঋতুজাকে বলে দেবেন, আই অ্যাম সরি।"

আমি বুঝলাম না। বললাম, "মানে?"

"আমি অনেকের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছি। যা ইচ্ছে তাই করেছি। এমনকি আপনাকে মারতেও আমি লোক ঠিক করেছি। কিন্তু বুঝতে পারিনি, বেলাইনে চলতে গিয়ে কখন নিজেই রাস্তা থেকে ছিটকে গেছি। আমি সারাজীবনে নিজেকে ছাড়া কাউকে ভালোবাসিনি। আপনি ঋতুজাকে ভালো রাখুন। আর পারলে অনিন্দিতাকেও দেখবেন। কারণ... থাক। চলি।"

ফোনটা কেটে গেল।

অবাক হয়ে ফোনের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম।

বাড়ি ফিরলাম রাত নটা নাগাদ। ঋতুজাই খাবার বাড়ল। বাবা শুধু ফিক ফিক করে হাসতে লাগল খাবার সময়টা। আমার রাগ হচ্ছিল, কিন্তু কিছু বলতে পারলাম না।

রাতে খেয়েদেয়ে ঘরে আসতে ঋতুজা খাটে বসেই বড়ো বড়ো হাই তুলতে তুলতে বলল, "উফ, এই খাটটা আমার ফেবারিট। কী সুন্দর যে ঘুম হয়!"

আমি বললাম, "তোমাকে একটা কথা বলার ছিল। অনিরুদ্ধ ফোন করেছিল।"

ঋতুজা বলল, "আমার ওকে নিয়ে কোনও আগ্রহ নেই। ঘুম নিয়ে আছে। আমি ঘুমাতে পারি?"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "সে কী? শুনতে চাইবে না ও কী বলেছে?"

ঋতুজা হেসে বলল, "আমি খুব স্বার্থপর পাবলিক। নিজের ঘুমের থেকে প্রিয় আমার কাছে আর কিছু না। তোমার ওর কথা মনে পড়লে তুমি ভাবতে পারো, আমি বরং ঘুমাই। গুড নাইট।"

আমাকে বিস্মিত করে দিয়ে সত্যিই ঋতুজা খাটে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ল। আমি সেদিকে তাকিয়ে মাথা চুলকালাম। এ কী ঘুম রে বাবা! এরকম ঘুমাতে পারলে আমি সত্যিই গর্ববোধ করতাম।

ব্যালকনিতে গিয়ে সিগারেট ধরালাম। তার একটু পরেই ফোনটা এল।

অনিন্দিতা।

অনেকক্ষণ ধরে কান্নাকাটির পর জানাল অনিরুদ্ধ মেট্রোতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। সুইসাইডের মিনিটখানেক আগে হোয়াটসঅ্যাপে শুধু অনিন্দিতাকে জানিয়ে গেছে, অনিন্দিতা যেন এইচ আই ভি টেস্ট করে নেয়।

এইচ আই ভি? অনিন্দিতাকে করতে হবে? তাহলে কি ঋতুজাকেও?

৮১ কপালকুণ্ডলা

"ছেলেটার জেল হয়েছে।" আমি বললাম অনিন্দিতাদিকে।

অনিন্দিতাদি ম্যাগাজিন পড়ছিল। আমাদের দুজনের একই দিনে তারিখ পড়ে। আমার এক সমস্যা। অনিন্দিতাদির অন্য।

প্রথম প্রথম আমরা কেউ কারও সাথে কথা বলতাম না। কবে যে বলতে শুরু করলাম, আমার মনে নেই। মেয়েরা নাকি ভালো বন্ধু হতে পারে না।

দুঃখী মেয়েরা ভালো বন্ধু হতে পারে হয়তো। দুজনেই অনেকক্ষণ কথা বলি রোজ।

আমার কথা শুনে অনিন্দিতাদি খুব খুশি হল। সত্যিকারের খুশি। আমার বাবার মতো খুশি না। সদুজ্যাঠার মতো খুশি।

বলল, "তুমি পড়াশুনা কমপ্লিট করবে না এবার?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ। কলকাতার কলেজে ব্যবস্থা করছে সদুজ্যাঠা। বাবার ইচ্ছা ছিল দূরে কোথাও আমার বিয়ে দিয়ে দেবে। সদুজ্যাঠা খুব চ্যাঁচামেচি করেছে। এত দিন সদুজ্যাঠা কিচ্ছু বলত না। বাবা যা বলত সব মেনে নিত। এবারে মানেনি।"

অনিন্দিতাদি বলল, "তুমি আমার বাড়ি থেকো। যদি বিনা পয়সায় থাকতে অসুবিধা হয়, তবে নাহয় পেয়িং গেস্ট হয়ে থেকো। ভালো লাগবে আমার। আমারও একজন বন্ধু দরকার।"

আমি বললাম, "তোমার সব ভুলে এগিয়ে যাওয়া দরকার। কী জানো তো, আমি গ্রামের মেয়ে, তবু আমার মনে হয় তুমি এবার তোমার অতীতটা ভুলে যাও।"

অনিন্দিতাদি মাথা নিচু করল। চোখ থেকে দু-এক ফোঁটা জল পড়ল। সেটা মুছল না ও।

বলল, “আমার বাবার কথায় রাজি হয়েছিলাম। গত সপ্তাহে এক ছেলে দেখতে এসেছিল।”

আমি বললাম, “তারপর?”

অনিন্দিতাদি বলল, “আমি ছেলেটাকে সব বলে দিলাম। অনিরুদ্ধকে আমি কতটা ভালোবাসতাম, কীভাবে ও আমাকে দিনের পর দিন ঠকিয়ে গেছে। ওরা আর যোগাযোগ করেনি। এরকম কোনও ছেলে নেই যে সব শুনে আমাকে বিয়ে করতে চাইবে। একলা থাকাটা অনেক বেটার অপশন। মুভ অন মানে তো একলা থাকাও হয়। একটা ছেলে সারাজীবন একলা থাকার অপশন নিতে পারলে আমি কেন পারব না? আমার মনে হয় না সারাজীবন আমি আর কারও সঙ্গে কোনও ভাবে থাকতে পারব। যত কাউন্সেলিং করি, যত ওষুধ খাই অ্যান্টিডিপ্রেসিভ, আমি ওকে ভুলতে পারব না। একটা রোবট হয়ে সারাজীবন কোনও ছেলের সঙ্গে থেকে একইসাথে তার এবং আমার, দুজনের জীবন আমি নষ্ট করতে পারব না।”

আমি বললাম, “আমি ভেবেছিলাম একলা থাকার সিদ্ধান্তটা আমার একারই। যাকে সারাদিন একটু দেখার জন্য পাগল হয়ে যেতাম, সে যখন...”

অনিন্দিতাদি আমার হাত ধরে বলল, “এসব ভেবো না।”

আমি বললাম, “অ্যাবরশন রুমের অন্ধকারটা খুব ভয়ংকর জানো তো। মনে হয় কেউ দম বন্ধ করে গলা টিপে আমাকে মেরে ফেলে দিচ্ছে। একসময় আমি খুব ভূতের ভয় পেতাম। এখন আর পাই না।”

অনিন্দিতাদি বলল, “ভয়গুলো এভাবেই কাটে হয়তো আমাদের। সামনে যে মানুষগুলো আমাদের দ্যাখে, যারা আমাদের সঙ্গে সবসময় কথা বলে, তারা কি জানে আমাদের ভিতর দিয়ে কতখানি ঝড় চলে যাচ্ছে? আরো বাজে লাগে আমার মানুষের সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টি। আমি তো কারও সহানুভূতি চাইনি কোনও দিন। মানুষ কি বোঝে না, এই দৃষ্টিগুলো, বা ‘আহা তোর কী হবে’ টাইপ কথাগুলো আসলে আমাদের আরও বেশি করে মেরে ফ্যালে রোজ রোজ?”

আমি বললাম, “তোমার সত্যি এখনও কোনও প্রেমিক হয়নি অনিন্দিতাদি?”

অনিন্দিতাদি আমার দিকে ক্লান্ত মুখে তাকিয়ে বলল, “একজন আছে। ফেসবুকে আলাপ হয়েছিল অনেক আগে। অনিন্দ্য নাম। বাড়ি অবধি চলে এসেছিল। আমি খুব বাজে ব্যবহার করে তাড়িয়ে দিতে গেলাম। গেল না। আমি কী করব, খারাপ লাগল। বসিয়ে

খাওয়ালাম। খেয়েদেয়ে সে চলে গেল। মাঝে মাঝে মেসেজ করে, আমরা কি একসঙ্গে থাকতে পারি না? আমি উত্তর দি, না।”

আমি হেসে ফেললাম, “আহা রে, সত্যি ভালোবাসে তোমাকে।”

অনিন্দিতাদি বলল, “আমি তো আর কাউকে ভালোবাসতে পারব না। খামোখা তার জীবনটা নষ্ট কেন করতে যাব? তার লেখা পড়েছিলাম, ভালো লেগেছিল, বলেছিলাম। সে এটাকে ভালোবাসা বুঝে নিয়েছিল হয়তো। আমার পক্ষে আর কারও সঙ্গে জড়ানো অসম্ভব।”

অনিন্দিতাদির ডাক এল। ও উঠে বলল, “তুমি আমার কাছেই থেকো কপালকুণ্ডলা। একজন ভালো বন্ধু পেলেও হয়তো বাকি জীবনটা নিয়ে চিন্তা করতে হয় না।”

আমি ম্লান হেসে বললাম, “থাকব। তুমি যাও, দেরি হয়ে যাচ্ছে।”

অনিন্দিতাদি চলে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, “আর শোনো, বাচ্চাটা আমি নেব ঠিক করেছি। নষ্ট করব না। আমার বর যা করে থাকুক, আমি তো সৎ ছিলাম। আমার সন্তানকে সেটুকু সততা দিয়ে মানুষ করব। ভুল করছি আমি?”

আমি হাসতে হাসতে কেঁদে ফেললাম “একদম না... একদম না”...

৮২ জীমূতবাহন

গাড়ি চলেছে পাকদণ্ডি বেয়ে। আমরা আবার পাহাড়ে এসেছি। বউ অবশ্য আমার কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে চোখ বুজে ফেলেছিলাম কখন বুঝতে পারিনি।

মানুষ একবার হানিমুন করে।

আমি দুবার করি।

দ্বিতীয়বার হানিমুন করি প্রথমবারের ফ্লপ সিনেমাটাকে ভুলে যাওয়ার জন্য।

ঘিঞ্জি দার্জিলিং-এ পৌঁছোলাম আমরা। প্রচণ্ড ঘিঞ্জি অথচ প্রাণশক্তিতে ভরপুর।

কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যাচ্ছে। একটুও মেঘ নেই। বউ আমায় জড়িয়ে ধরে বলল, “রোমান্টিক লাগছে খুব।”

আমি গলা নামিয়ে বললাম, “ড্রাইভার কী ভাববে?”

বউ বলল, “ভাববে নিজের বউকে আদর করছ।”

আমি ওর কপালে চুমু খেয়ে বললাম, “বাকিটা হোটেলের জন্য থাক?”

বউ বলল, “আমার এইচ আই ভি ধরা পড়লে কী করতে তুমি? ফেলে দিতে রাস্তায়?”

আমি মাথা নাড়লাম, “না। চিকিৎসা করাতাম। আমার মনে হয় অনিরুদ্ধরও আদৌ কিছু ছিল না। একটা মানুষ ভুল কাজ করতে করতে ভাবতে থাকে সে সবই ঠিক করছে। একটা সময় এমন আসে যখন হঠাৎ করে সমস্ত পাপ এসে ঢেউয়ের মতো তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। অনিরুদ্ধর তাই হয়েছিল। ও তুমুল আতঙ্কে কাজটা করে ফেলেছে। খারাপ লাগে অনিন্দিতার জন্য।”

বউ ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, “পরের বউয়ের জন্য খারাপ লাগে আর নিজের বউকে তো কোনও দিন বলতেও আসনি যা করছি ঠিক করছি না? সব সময় শুধু মেজাজ নিয়ে গেছ।”

আমি বললাম, “বলেছি। আমার বলার ভাষাটা উগ্র ছিল হয়তো। বোঝাটাও হয়তো ঠিক বুঝিনি। মানুষ যখন ভালোবাসায় থাকে তখন ঠিক ভুলের হিসাব বুঝতে পারে না। তুমিও বুঝতে পারোনি। তুমি নিরুপায় ছিলে।”

বউ আমার নাক টিপে বলল, “কত বোঝো তুমি। কত্ত জানো!”

আমি হাসলাম, “তবুও রাতে ঘুম হয়। অবশ্য তোমার মতো না। যা নাক ডাকো, বাপ রে!”

বউ রেগে বলল, “নিজেও নাক ডাকো। একা আমার দোষ দেবে না একদম। পচা লোক একটা। তবে হ্যাঁ, এটা ঠিক, তোমার কাছে থাকলে আমায় ঘুমের ওষুধ খেতে হয় না। তোমার মধ্যে জাদু আছে।”

আমি বললাম, “বেশ তো, তাহলে যে যে মেয়ের রাতে ঘুম হয় না তারা আমার কাছে এসে থাকলেই পারে।”

বউ বলল, “সব পুরুষের ভিতরই অনিরুদ্ধ আছে বুঝলে? তুমিও ওর মতোই।”

আমি বললাম, “তাই বুঝি? খুব মিস করো, না?”

বউ বলল, “করি। খুউউউউব মিস করি। গাধা কোথাকার। এই, শোনো, বর হয়েছ, বরের কাজ করো। আমায় কফি খাওয়াও।”

আমি বললাম, “খাওয়াব তো। আর কী খাবে?”

বউ দুষ্টু হেসে বলল, "অনেএএএক আদর। আর সেই পাগলামি ট্যুরটা আবার শুরু করব। গাড়ি করে বেরোব। যে-কোনো অজানা গ্রামে সন্ধেটা থাকব। ঝিঁঝির ডাক শুনে রাত কাটাব। হেব্বি মজা হবে বলো?"

আমি বউকে জড়িয়ে ধরে বললাম, "হেব্বি মজা হবে।"

দুজনে হেঁটে ম্যালে এলাম। একজোড়া বয়স্ক দম্পতি আইসক্রিম খাচ্ছেন।

বউ মুগ্ধ চোখে সে দিকে তাকিয়ে বলল, "আমরা এরকম বয়সে এতটা ভালোবাসায় থাকব তো?"

আমি ওর গালে টোকা মেরে বললাম, "থাকব।"

বউ বলল, "অনিন্দিতার জন্য মাঝে মাঝে কষ্টও হচ্ছে জানো। আমি ওর সঙ্গে ঠিক করিনি বলো?"

আমি বললাম, "আমরা যখন কোনও ঘোরে থাকি, তখন কেউ কারও সঙ্গে ঠিক করি না। যখন নিজেদের ভুল বুঝতে পারি, তখন বড্ড দেরি হয়ে যায়। তোমার দেরি হয়নি। তুমি ওকে দেখো। খেয়াল রেখো।"

বউ বলল, “ও আমাকে সহ্য করতে পারে না। দেখলে রেগে যায়। তুমিই খোঁজ নিয়ো বরং। আমি তোমাকে সন্দেহ করি না। ভেবো না। ইউ আর এ গুড ম্যান।”

আমি বউয়ের হাতটা শক্ত করে ধরলাম।

আমার বউ।

জাপটে ধরে রেখে সারাজীবন কাছে রাখার মানুষ...

৮৩ আত্রেয়ী

অমৃতর বাইকে করে শহর ঘুরতে বেরিয়েছি। জাপটে ধরে আছি আমার বরটাকে।

পাগল একটা মানুষ।

অফিস থেকে ফেরার সময় একগাদা চকোলেট নিয়ে আসবে।

বউদির সামনে পড়লে সব চকোলেট বউদির হাতে দিয়ে বলবে, “তোমাদের জন্য এনেছিলাম।”

বউদি তখন ছদ্ম রাগ দেখিয়ে বলে, "হ্যাঁ গো ঠাকুরপো, আগে তো আমার জন্য একটা বাতাসাও আনতে না, এখন কবে থেকে এত খেয়াল করা শুরু করলে আমার?"

আমার লজ্জায় পালাই পালাই অবস্থা হয়।

আরও পালাই পালাই লাগে যখন আমি স্কুল থেকে বেরোই আদৃতাদের সঙ্গে আর তিনি বাইক নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। আদৃতা অবশ্য আমায় কানে কানে বলেছে "ওরে আতু, যা আনন্দ করার করে নে, কদিন পরে এই বর আর আসবে না। এই হয়। প্রথম প্রথম হেব্বি আঠা।"

আমি মুখে বলি, "ঠিক বলেছিস।"

মনে মনে হাসি।

যদি তা হয়ও, তাতেও কিছু যায় আসে কি? এই পাগলটাকে সারাজীবন জড়িয়ে ধরে বসে থাকব, তাহলেই আমি খুশি। এরকম পাগল কি খুব সহজে পাবে কেউ? কোনও কোনও দিন ঘুম থেকে উঠে বলে, "চলো কোনও নাম না জানা স্টেশনে নেমে ঘুরে আসি।"

বাড়ির কাউকে না বলে চলে গেলাম। যে এলাকায় নামি, লোকজন কেমন সন্দেহজনক দৃষ্টিতে তাকায়। বাড়ি ফিরলে শ্বশুরমশাই আমার দিকে তাকিয়ে ফিক ফিক করে তাকিয়ে বলেন, "তুইও অমুর পাল্লায় পড়ে পাগলি হয়ে গেলি মা?"

তুমি থেকে তুই হয়ে গেছি কখন যেন এ বাড়িতে। কখনও মনে হয় না অন্য কারও বাড়িতে আছি। আমার বাবাও মাঝে মাঝে চলে আসে। অমৃতর বাবার সঙ্গে মিলে আমার লেগপুল করে। আমি খুব রাগ করি।

বউদি তখন আমার পক্ষ নিয়ে লড়াই করে।

দাদা মাঝেমধ্যেই অফিস থেকে ফেরার পথে কখনও বিরিয়ানি, কখনও পরোটা মাংস নিয়ে আসে। বাবা প্রথমে রাগ দেখায়। বাইরের খাবার খাবে না বলে। খাওয়ার সময় গম্ভীর হয়ে বলে, "ঠিক আছে, একটু টেস্ট করে তো দেখাই যায়, দেখি মা আমাকে একটু দে তো।"

আমিও মাথা নিচু করে ফিক ফিক করে হাসতে থাকি।

আমার মনে হয় আমি যেন কোনও রূপকথার মধ্যে আছি, যেন কোনও স্বপ্ন দেখছি।

অনিন্দিতাদি স্কুলে আসে। অনিরুদ্ধদা মারা যাবার পর অনিন্দিতাদি মানসিকভাবে মারাত্মক ভেঙে পড়েছিল। কাউন্সেলিং চলছে। মাঝে মাঝে একটা মেয়েকে নিয়ে আসে। মেয়েটার নাম কপালকুণ্ডলা। পাগলি একটা। কী সব পাগলামি করে চলে! কে বলবে কত বড়ো একটা কাণ্ড ঘটে গিয়েছে ওর সঙ্গে। আমরা সবাই মিলে ঠিক করেছি ওকে আবার পড়াশুনা করাব। অনিন্দিতাদির সঙ্গে থাকে মেয়েটা। মায়াবী একটা মেয়ে। আমাকে দেখলেই বলবে, "এই দিদি, তুমি এরকম করে চুল কেটেছ কেন? তোমার না কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই। আচ্ছা তুমি আমাকে অঙ্ক করাবে? আমার না অঙ্কে হেবি ভয়। করাবে? বলো না?"

আমি ক্লাসের ফাঁকে ওকে অঙ্ক দেখাই। ওর চোখে শেখার আগ্রহ দেখে আমার নিজেরও ভালো লাগে। মেয়েদের তো এভাবেই ঘুরে দাঁড়ানো উচিত। আমরা একা কে বলেছে? আমরা নিজেরাই নিজেদের জন্য যথেষ্ট।

কপালের বাবা মাঝে মাঝেই স্কুলে এসে কাঙালের মতো দাঁড়িয়ে থাকেন। আমাদের অনুরোধ করেন, "বলুন না মেয়েটাকে। আমরা অনুতপ্ত বিশ্বাস করুন। ওর মা সারাদিন কাঁদে ওর জন্য। ওকে বলুন না বাড়ি ফিরে যেতে।"

আমরাও বোঝাই। কপালকুণ্ডলা কিছুতেই শুনতে রাজি নয়। ওর একটাই জেদ। আগে নিজের পায়ে দাঁড়াবে। তারপর বাড়ি ফিরবে। আমার ওকে দেখে শক্তি আসে।

অনিন্দিতাদি চোখ মুখ শক্ত করে বসে থাকতে থাকতে মাঝে মাঝে কেঁদে ফ্যালে। বলে এরকমই নাকি হয়। অনিরুদ্ধদার মতো মানুষদের যখন অনুতাপ আসে, তখন এভাবেই ওরা নিজেদের শেষ করে দেয়। একদিকে ভালোই হয়েছে হয়তো। কিছু কিছু মানুষ আর সংশোধিত হবার জায়গায় থাকে না। যখন বুঝতে পারে, আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না।

আমরা সবাই মিলে অনিন্দিতাদিকে আগলে রাখি। এ ছাড়া তো আমরা আর কিছু করতে পারি না।

অমৃত চেঁচিয়ে বলল, "এই তুমি ফুচকা খাবে?"

আমি বললাম, "বাইক চালাতে চালাতে কথা বোলো না দয়া করে। চুপ করে চালাও।"

অমৃত বাইক থামায়। আমাকে জড়িয়ে ধরে।

আমি ছিটকে উঠি, "এই, রাস্তার মধ্যে এসব কী?"

অমৃত বলে, "বেশ করেছি। আমার নিজের বিয়ে করা বউকে আদর করেছি। কার বাবার কী?"

আমি জোরে জোরে মাথা নাড়ি, “একদম না। ঈশ! আমার লজ্জা লাগে না?”

অমৃত আমার নাকে আলতো করে আদর করে বলে, “ঠিক আছে, চলো সূর্যাস্ত দেখি।”

দুজনে মিলে গঙ্গার তীরে গিয়ে নৌকায় উঠি।

গোধূলির মায়াবী হলদে আলো গঙ্গাকে সোনায় রূপান্তরিত করে। আমরা সেই মায়াবী আলোয় পরস্পরের হাত ধরে বসে থাকি। অমৃত আমার কানে কানে বলে, “ভালোবাসি, ভালোবাসি, ভালোবাসি।”

আমি বলি, “আজীবন বেসো।”

অমৃত ফিসফিসিয়ে বলে, “বাসব সোনা। আমার আতুবুড়ি, আমার বুচি সুন্দরী। বাসব।”